
অভিরূপ সরকার
সৈকত
রহস্য

সৈকত রহস্য

অভিরূপ সরকার

দীপ প্রকাশন
২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬

দীপ
SAIKAT RAHASYA
by Abhirup Sarkar
রচনাকাল
১২ জানুয়ারি, ২০২১ — ৯ অক্টোবর ২০২১
প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০২২
দ্বিতীয় সংস্করণ মার্চ, ২০২২
প্রচ্ছদ সৌম্যদীপ প্রধান
প্রকাশক শংকর মণ্ডল
২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬
মুদ্রক কল্পনা অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০ ০১৫

ছোটন-কে

মুখবন্ধ

ভাবতাম, যা দেখেছি, তাই নিয়ে লিখব। অনেকটা স্মৃতিচারণ, অন্যদের কাছে না হলেও, নিজের কাছে। আজকাল পুরোনো ছবিগুলো মনে করে আরাম পাই। পুরোনো বাড়ি, পুরোনো ট্র্যাম-বাস, শহর, রাস্তা। এসব ছবি বড় বড় মানুষরা তাঁদের আত্মজীবনীর মধ্যে ধরে রাখেন, আমার সে সুযোগ নেই। আমি আত্মজীবনী লিখলে লোকে পড়বে কেন?

শেষে একটা মতলব করলাম। মনে হল, একটা থ্রিলার বা হু-ডান-ইট-এর মোড়কে যদি আমার দেখা শহর-মফসসল-চরিত্রগুলোকে পরিবেশন করা যায়, তাহলে হয়তো দু-চারজন পড়লেও পড়ে ফেলতে পারে। এর জন্যে অবশ্য গোয়েন্দা গল্পের টানটা থাকতে হবে। আসল উদ্দেশ্য, যে পরিবেশে গল্পটা তৈরি হচ্ছে, সেই পরিবেশটাকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তবে গল্পটাকে অবহেলা করলে মোটেই চলবে না।

এই হল আমার ডিটেকটিভ গল্প লেখার ইতিহাস। এই নিয়ে পাঁচটা গোয়েন্দা উপন্যাস লিখলাম। আগের উপন্যাসগুলোর মতো বর্তমান উপন্যাসটাও প্রকাশ করে দীপ প্রকাশনের কর্ণধার শংকর মণ্ডল আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন।

প্রাথমিক একটা খসড়া পড়ে সুপরামর্শ দিয়েছেন অগ্নিরূপ সরকার, পরন্তপ বসু, পার্থ রায়, মহুয়া সেনগুপ্ত, শ্রীজিৎ মল্লিক, সর্বজিৎ সেনগুপ্ত, সুপ্রিয় সেনগুপ্ত এবং সৌম্যেন্দ্র সিকদার। এঁদের প্রতি আমার ঋণ স্বীকার করছি।

অভিরূপ সরকার

প্রথম পরিচ্ছেদ

(১)

'আমার স্বামী গত ৩ জানুয়ারি মারা গেছেন।' মেয়েটি বলল।

তারপর একটু থেমে বলল, 'খুন হয়েছেন।' বলতে গিয়ে মেয়েটির গলাটা একটু কেঁপে গেল।

আরও একটু থেমে সে বলল, 'আমি খুব বিপদের মধ্যে আছি।'

আদিত্য মেয়েটির দিকে সরাসরি তাকাল। এই নিয়ে বোধহয় তিন-চার বার। মেয়েটির বয়েস তিরিশের কম তো হবেই, সম্ভবত পঁচিশেরও কম। বেশ ফরসা রঙ। এত ফরসা রঙ বাঙালিদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। ছোটখাটো, ছিপছিপে শরীরের ওপর দৃষ্টি-নন্দন মুখ। একটু বেশি তীক্ষ্ণ একটা নাক, বিষণ্ণ, রহস্যময় একজোড়া চোখকে সঙ্গ দিচ্ছে। চোখের নীচে গভীর কালি। ওষ্ঠের ঠিক ওপরে যে ছোট তিলটা রয়েছে সেটার কারণে মুখমণ্ডলে কিছু অপ্রত্যাশিত চটুলতা। মেয়েটি কথা না বললে আদিত্য তাকে অবাঙালি ভাবত।

কেয়া চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকেছে। 'একটু মিষ্টি খাও।' টেবিলে মিষ্টির প্লেট নামিয়ে রাখতে রাখতে কেয়া বলল। আদিত্য ট্রে থেকে তার চায়ের কাপটা তুলে নিল।

'আমি কিছু খেতে পারব না দিদি। প্লিজ। সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়েছি। শুধু একটু চা খাব।' মেয়েটির গলায় কাকুতি।

'একটা সন্দেশ খাও অন্তত। তোমাকে কিচ্ছু না খাওয়ালে আমার বন্ধু আমার ওপর খুব রেগে যাবে।' কেয়া আন্তরিকভাবেই বলল।

আদিত্য ভাবছিল, কেয়া ঘরে ছিল না বলে শুনতে পায়নি, এই মেয়েটির স্বামী কিছুদিন আগে মারা গেছে। খুন হয়েছে। শুনতে পেলে নিশ্চয় জোর করত না। কিন্তু মেয়েটির স্বামীর কথাটা কেয়াকে কী করে জানানো যায়? আদিত্য উদাস হয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিল।

একটু পরে কেয়ার প্রবল পেড়াপেড়িতে মেয়েটি যখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্লেট থেকে একটা সন্দেশ তুলে নিয়ে হাতে ধরে বসে আছে আর কেয়া, একটা ফোন এসেছে বলে, পাশের ঘরে গিয়ে কথা বলছে, আদিত্য নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আপনার নামটা কিন্তু এখনও জানা হল না।'

'আমার নাম অনিতা, অনিতা শর্মা চৌধুরি।'

'তার মানে বিয়ের আগে আপনার পদবি ছিল শর্মা। আপনারা কি বাঙালি?'

প্রশ্নটা শুনে মেয়েটি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আদিত্যর দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন। আমরা বাঙালি নই, হিমাচল প্রদেশের বাসিন্দা। তবে অনেক দিন বাংলায় আছি। আমার ঠাকুরদাদা রেলে চাকরি নিয়ে বাংলায় এসেছিলেন। পরে চাকরি ছেড়ে ব্যবসা শুরু করেন। রেল কোম্পানিকেই নানারকম সাপ্লাই করতেন। থাকতেন কাঁচড়াপাড়ায়। বাবা-কাকারা ওখানেই বড় হয়েছেন। বাবা পরে কলকাতায় চলে আসেন। কাকার সঙ্গে অন্য ব্যবসা শুরু করেন। পরে অবশ্য কাকা অস্ট্রেলিয়া চলে যায়। আমি কলকাতাতেই পড়াশোনা করেছি।'

'তাই আপনার বাংলা শুনে বোঝা যায় না আপনি বাঙালি নন।'

'আমার শ্বশুরবাড়ি কিন্তু বাঙালি। তবে...' অনিতা শর্মা চৌধুরি একটু থেমে বলল, 'ওরা ব্রাহ্মণ নয়। আর আমার বাপের বাড়ি খাঁটি ব্রাহ্মণ।'

'এটা নিয়ে কি কোনও সমস্যা ছিল?' আদিত্য খানিকটা সংকোচের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল। তারপর কৈফিয়ত দেবার গলায় বলল, 'আপনাকে সাহায্য করতে গেলে আমাকে সবটাই তো বুঝতে হবে।'

'খুবই সমস্যা ছিল। আমার বিয়েটা বাপের বাড়ি থেকে কোনও দিনই মেনে নেয়নি। আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে সৈকতকে বিয়ে করেছিলাম। আমার শ্বশুর-শাশুড়ি অবশ্য বিয়ে নিয়ে কোনও আপত্তি করেননি।'

কেয়া ফোন শেষ করে আবার ঘরে ঢুকেছে। মেয়েটির হাতে তখনও সন্দেশ ধরা আছে দেখে বলল, 'তুমি এখনও খাওনি? তাড়াতাড়ি এই সন্দেশটা খেয়ে নাও। তারপর অন্তত একটা পান্তুয়া খেতেই হবে। পান্তুয়াটা আমাদের পাড়ার দোকানের। একেবারে টাটকা, এখনও গরম আছে।'

'আমি সত্যিই খেতে পারছি না। সত্যিই পারছি না।' অনিতা এবার আদিত্যর দিকে তাকিয়ে অসহায় গলায় বলল। যেন আদিত্য তার অসুবিধেটা বুঝতে পারবে।

'কেয়া, ওঁকে খাবার নিয়ে জোর কোরো না। উনি ভীষণ বিপদের মধ্যে আছেন। ওঁর স্বামী কিছুদিন আগে খুন হয়েছেন। আমার কাছে সেই জন্যেই এসেছেন। ওঁর কথাটা ভাল করে শোনা যাক।' আদিত্য সুযোগ পেয়ে বলল।

কেয়া খুব অপ্রস্তুত হয়ে গেছে। এতক্ষণে অবস্থার গুরুত্বটা বুঝতে পেরেছে। কেয়ার অপ্রস্তুত মুখটা দেখে অনিতা তাড়াতাড়ি বলল, ' না, না। আমি একটা সন্দেশ খেয়ে নিচ্ছি। আপনি এত করে বলছেন।' যেন সন্দেশ খাওয়াটা তার দায়িত্ব। পরে সন্দেশটা কোনোক্রমে গলাধঃকরণ করে সে কয়েক চুমুকে জলের গেলাসটা খালি করে দিল। আদিত্যর সন্দেহ হল তার গলায় সন্দেশ আটকে গেছে।

অনিতা শর্মা চৌধুরি কিন্তু কেয়ার রেফারেন্সেই আদিত্যর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। কেয়ার কলিগ শাশ্বতী শাসমল অনিতাদের পাশের ফ্ল্যাটে থাকে। শাশ্বতী কেয়াকে বলেছে অনিতা তার ছোট বোনের মতো, সম্প্রতি ভীষণ বিপদে পড়েছে, কেয়ার স্বামী আদিত্য যদি অনিতাকে একটু সাহায্য করতে পারে, খুব ভাল হয়। এর বেশি আর কিছু শাশ্বতী কেয়াকে বলেনি। তাই কেয়া জানে না অনিতার বিপদটা ঠিক কী।

'আপনি আপনার বিয়ের কথা বলছিলেন। আপনি বললেন, আপনাদের বিয়েটা আপনার বাপের বাড়ি মেনে নেয়নি, কিন্তু আপনার শ্বশুর-শাশুড়ি মেনে নিয়েছিলেন।' আদিত্য খেই ধরিয়ে দিল।

'হ্যাঁ। আমাদের পরিবার খুব গোঁড়া। আমাদের কমিউনিটির মধ্যেই আমার বিয়ে ঠিক করা হয়েছিল। আমি কমিউনিটির বাইরে বিয়ে করব এটা কেউ মেনে নিতে পারেনি। তার ওপর আবার সৈকতরা ব্রাহ্মণও নয়।'

'আপনার স্বামী খুন হয়েছে বললেন। আপনার সমস্যাটা কি আপনার স্বামীর মৃত্যু সংক্রান্ত?'

'হ্যাঁ। একেবারেই তাই। তবে সমস্যাটা বোঝাতে গেলে একেবারে গোড়া থেকে শুরু করতে পারলে ভাল হয়। একটু সময় লাগবে। আমাকে একটু সময় দেবেন?' অনিতা খুব কুণ্ঠিতভাবে বলল।

'আপনি যত খুশি সময় নিন। কোনও তাড়া নেই।' আদিত্য দরাজ গলায় বলল। তার খুব সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কেয়ার সামনে সে সিগারেট ধরাতে সাহস পেল না।

মাঘ মাসের আলগা রোদ্দুর পুবদিকের জানলা খোলা পেয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছে। তবে খুব বেশি দূর এগোতে পারেনি। আদিত্যর পড়ার টেবিলের পায়ের কাছে একটা হলুদ চতুষ্কোণ রচনা করে থেমে রয়েছে। রবিবার। শিগগিরই এগারোটা বাজবে। কেয়া তার চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে আদিত্যর পাশে একটা মোড়ায় বসে পড়ল।

'আমার স্বামী সৈকত চৌধুরি ছিল পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার।' অনিতা বলতে শুরু করল। 'যাদবপুর থেকে পাশ করেছিল। আমার কলেজের বন্ধু শুক্তি সৈকতের মাস্তুতো বোন। শুক্তির বাড়িতেই সৈকতের সঙ্গে আলাপ। আমি তখন সিটি কলেজে হিস্ট্রি পড়ি। থার্ড ইয়ার। সৈকত খুব ভাল ক্রিকেট খেলত। ইউনিভার্সিটির ক্যাপ্টেন ছিল। টল-ডার্ক-হ্যান্ডসাম। ভীষণ জোভিয়াল। এক মুহূর্তে মানুষকে আপন করে নিতে পারে। আমার সঙ্গে যখন আলাপ হয় তখন ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করে বেরিয়ে গেছে, তবে খেলা ছাড়েনি।

রাজস্থান ক্লাবে খেলে। আমাকে বলল, সামনের রবিবার ইডেনে আমার খেলা আছে। শুক্তির সঙ্গে তুমিও দেখতে এসো। আমার বয়েস তখন সবে একুশ। সৈকতকে প্রথমবার দেখেই আমি একেবারে হেড ওভার হিলস।' বলতে বলতে অনিতা শর্মা চৌধুরি লজ্জা পেয়ে থেমে গেল। আদিত্যর মনে হল, সে তার স্বামীর সঙ্গে প্রথম আলাপের স্মৃতিটা উপভোগ করছে।

'তারপর? তারপর কী হল?' কেয়া সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল। সে অনিতার গল্পে বেশ রস পেয়ে গেছে।

'পরের রবিবার শুক্তির সঙ্গে ইডেনে খেলা দেখতে গেলাম। সৈকত সেদিন সেঞ্চুরি করে দলকে জেতাল। যতদূর মনে পড়ছে, খেলাটা ছিল কালীঘাটের এগেন্সটে। লিমিটেড ওভার ম্যাচ। খেলার শেষে সৈকত আমাদের নিয়ে পার্ক স্ট্রিটে গেল। আমাকে বলল, আজকের সেঞ্চুরিটা তোমাকে ডেডিকেট করলাম। আমরা ফ্লুরিজে চা-পেস্ট্রি খেলাম। অনেকক্ষণ বসলাম। বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে গেল। কেন দেরি হয়েছে বলতে গিয়ে বাবা-মাকে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলতে হল। এর আট মাস পরে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে সৈকতকে বিয়ে করি।'

'আপনার স্বামী তখন কী করতেন?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

সৈকত কোনও দিনই চাকরি করতে চায়নি। ও ওর ফ্রিডমটা খুব ভ্যালু করত। কারও গোলামি করা ওর ধাতে ছিল না। তাই পাশ করার পরে ও ওর এক বন্ধুর সঙ্গে পার্টনারশিপে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম শুরু করেছিল। আমাদের যখন বিয়ে হয় তখন ফার্মটা বেশ দাঁড়িয়ে গেছে। তবে সৈকত ব্যবসাটার দিকটা কোনও দিনই তেমন বুঝত না। ও ভাল ইঞ্জিনিয়ার ছিল, কিন্তু ব্যবসার ব্যাপারটা পুরোপুরি ওর পার্টনার মণিময় গুপ্তর ওপর ছেড়ে দিয়েছিল। সেই সুযোগে ওর পার্টনার মণিময় গুপ্ত ওকে ঠকায়।'

'এই ব্যবসার ব্যাপারটা আর একটু ভাল করে বলবেন?' আদিত্য একটা খাতায় নোট নিচ্ছিল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওটা তো বলতেই হবে। সৈকতের মৃত্যুর সঙ্গে ওর ব্যবসার একটা সম্পর্ক থাকতেই পারে। তবে ওটা একটু পরে বলছি। তার আগে আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা বলে নিই।'

'ঠিক। ঠিক। আপনি আপনার মতো করে বলুন।' আদিত্য খাতা থেকে মুখ তুলে বলল।

'বিয়ের মাস দুয়েক আগে আমি বাড়িতে সৈকতের কথা জানালাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার ওপর প্রচণ্ড অত্যাচার শুরু হল। বাবা, মা, দাদা, বউদি সকলেই আমার ওপর চাপ দিতে লাগল। বলতে লাগল, সৈকতের সঙ্গে সম্পর্কটা ভেঙে দিতে হবে। আমাকে আমার ঘরে আটকে রাখা হল। বাড়ির বাইরে এক পা বেরোবার হুকুম নেই। আমার এক মাসি, হিমাচল প্রদেশের হামিরপুরে থাকে, আমার জন্যে সেখানে একটা সম্বন্ধ দেখে রেখেছিল। এবার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দেবার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। বাড়িতে আমার একমাত্র বন্ধু ছিল আমার ছোট ভাই জয়। জয় আমাকে সৈকতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে সাহায্য করত। ও তখন টুয়েলভ-এ পড়ে। তারপর একদিন আমি জয়ের সাহায্যে বাড়ি থেকে পালালাম। বাড়ির বাইরে একটু দূরেই সৈকত অপেক্ষা করছিল। সৈকত আমাকে শুক্তিদের বাড়িতে নিয়ে গেল। এর দুদিন পরে, ক্রিক রোতে একজন ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে আমাদের বিয়ে হয়।'

'তোমার বাড়িতে ব্যাপারটা কবে জানাজানি হল?' কেয়া জিজ্ঞেস করল।

'আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছি দেখে এফ আই আর করা হয়েছিল। তবে জয়কে কেউ সন্দেহ করেনি। নাহলে তার ওপরেও খুব অত্যাচার করা হত। যাই হোক, আমার বিয়ের তিন-চার দিন পরে বাড়িতে পুলিশ এসে হাজির। বাড়িতে মানে সৈকতদের বাড়িতে। আমি তখন ওখানে থাকতে শুরু করেছি। আমি পুলিশকে আমার বার্থ সার্টিফিকেট দেখালাম, আধার কার্ড দেখালাম। বুদ্ধি করে ওগুলো সঙ্গে এনেছিলাম। ম্যারেজ সার্টিফিকেটটাও পুলিশকে দেখালাম। পুলিশ যখন দেখল আমি সাবালিকা, নিজের ইচ্ছেতে সৈকতকে বিয়ে করেছি, তখন তারা ফিরে গেল।'

'আপনার বাপের বাড়ির কেউ আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি?'

'জয় তো প্রত্যেক সপ্তাহে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত। এখন আর আসে না। ও কাকার কাছে অস্ট্রেলিয়া চলে গেছে। কাকা-কাকিমার ছেলেমেয়ে নেই তো, ওরাই ওকে নিয়ে গেছে। ওখানে এমবিএ করছে। কিন্তু অন্যরা তো এখানেই আছে। তারা কেউ আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনি। আর আমার দাদা, সঞ্জয়, ভীষণ কনজারভেটিভ, আর প্রচণ্ড রাগী, তাছাড়া অনেকদিন রাগ পুষে রাখতে পারে, মাঝে মাঝেই ফোন করে ভয় দেখাত আমাদের দুজনকে খুন করে ফেলবে। একমাত্র তাহলেই নাকি পরিবারের ইজ্জত বাঁচবে। আমি জানি না, দাদা আমাদের শুধু ভয় দেখানোর জন্যে ফোন করত, নাকি সত্যি সত্যি আমাদের খুন করতে চেয়েছিল।'

'আপনার দাদা কাকে ফোন করত? আপনাকে? নাকি আপনার স্বামীকে?'

'দুজনকেই করত। আমরা একটা নম্বর ব্লক করে দিলে, সিম বদল করে আবার ফোন করত। আমাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল।'

'শেষ কবে আপনার দাদার কাছ থেকে ফোন এসেছিল?'

'আমার ঠিক মনে নেই। বছর খানেক হবে। আসলে একটা ঘটনা ঘটার পর দাদা ফোন করা বন্ধ করে দিয়েছিল।'

'কী ঘটনা?'

'একদিন রাত্তির বেলা সৈকত একা অফিস থেকে বেরিয়েছে, গাড়িতে উঠবে। সেই সময় দুজন লোক সৈকতকে ফিজিকালি অ্যাসল্ট করার চেষ্টা করে। দুজনের মধ্যে একজন আমার দাদা। আর একজন মনে হয় কোনও ভাড়াটে গুন্ডা।'

'তারপর?'

'সল্ট লেক ফাঁকা জায়গা। ওরা ভেবেছিল সৈকতকে মারধোর করে পালিয়ে যাবে। কেউ ওকে বাঁচাতে আসবে না। কিন্তু ওরা সৈকতের আনইউজুয়াল ফিজিকাল স্ট্রেংথের কথা জানত না। সৈকত একাই দুজনকে মেরে প্রায় আধমরা করে দিল। নিজেও খানিকটা ইঞ্জিয়োরড হল। দাদা আর অন্য লোকটা কোনও রকমে একটা গাড়িতে উঠে পালাল। সৈকত ওই অবস্থাতেই গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরে এল। এরপর থেকে দাদা আর ভয় দেখিয়ে ফোন করেনি।'

'আপনারা কি পুলিশে ডায়েরি করেছিলেন?'

'আমি করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সৈকত বলল, যেহেতু এটার মধ্যে আমার দাদা ইনভলভড, এটা একটা ফ্যামিলি স্ক্যান্ডেল হয়ে যাবে। তাই শেষ অব্দি ডায়েরি করা হয়নি।'

'ইন্টারেস্টিং।' আদিত্য কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, 'এবার বলুন, আপনার স্বামী কবে, কীভাবে খুন হলেন?'

'মাস দেড়েক আগে আমার স্বামী খুন হন।' অনিতা শর্মা চৌধুরির গলাটা আবার ধরে এল।

'কীভাবে, কোথায়?'

'বলছি। বলছি।' অনিতা নিজেকে গুছিয়ে নেবার জন্যে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। হয়তো সে বীভৎস কিছু বলার আগে শক্তি সঞ্চয় করছিল। 'দিনটা ছিল শনিবার। আমি প্রত্যেক শনিবার একটা কুকিং ক্লাসে যেতাম, মানে, তখন যেতাম এখন আর যাই না, সেদিনও গিয়েছিলাম। বাড়িতে সৈকত তখন ছিল না। সকালেই বেরিয়ে গিয়েছিল। বেশি কাজ থাকলে শনিবারও ওকে অফিস যেতে হত। মাঝে মাঝে ওর বাবা-মার সঙ্গেও দেখা করতে যেত।'

'আপনার শ্বশুর-শাশুড়ি কোথায় থাকেন?'

'আমার শ্বশুর কল্যাণী ইউনিভার্সিটিতে পড়াতেন। রিটায়ার করার পর কল্যাণীতে বাড়ি করেছেন। তিনি এবং আমার শাশুড়ি ওখানেই থাকেন।'

'আপনার স্বামী ছাড়া ওদের আর ছেলেমেয়ে নেই?'

সৈকতের এক দিদি আছে, অ্যামেরিকায় বিয়ে হয়েছে। খুব বেশি দেশে আসে না। আমি বিয়ের পর একবারই আসতে দেখেছি।'

'আপনার কত বছর বিয়ে হয়েছে?'

'সামনের মার্চে ছবছর হবে।'

'ঠিক আছে। বলুন তারপর কী হল।'

'আমি যখন বাড়ি ফিরলাম তখন সন্ধে হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে ফ্ল্যাটের মেন দরজার চাবি থাকে। আমি চাবি খুলে দেখি বাড়ি একেবারে অন্ধকার। ভাবলাম সৈকত নিশ্চয় এখনও ফেরেনি। বসার ঘরে আলো জ্বালালাম। ফাঁকা বসার ঘর। শোবার ঘরে গিয়ে বাইরের ড্রেসটা চেঞ্জ করলাম। তারপর ভাবলাম চা খাব। সন্ধেবেলার চা-টা সাধারণত আমরা একসঙ্গে খাই। বিশেষ করে শনি-রবিবার। মনে হল, সৈকতকে একবার ফোন করে জেনে নিই ও কখন ফিরছে। যদি দেখি ও শিগগির ফিরে আসছে তাহলে দু'কাপ চা ভিজিয়ে দেব।

সৈকতকে ফোন করতেই পাশের ঘরে ফোনটা বেজে উঠল। পাশের ঘরটা সৈকতের স্টাডি। ভাবলাম সৈকত নিশ্চয় ফোনটা ফেলে গেছে। ফোনের খোঁজে পাশের ঘরে গিয়ে আলো জ্বালাতেই দেখি মেঝের ওপর সৈকত পড়ে রয়েছে। সাদা কুর্তার ওপর টকটকে লাল রক্ত। মেঝেতেও রক্ত।'

বলতে বলতে অনিতা হু-হু করে কেঁদে উঠল। তার কান্না আর থামে না। কেয়া তার পিঠে হাত দিয়ে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছিল।

(২)

চৌকো রোদ্দুর চেয়ারের পায়ার কাছ থেকে কিছুটা সরে গিয়ে আলমারির ওপর পড়েছে। আদিত্য জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল রবিবারের রাস্তা প্রায় ফাঁকা। শুধু রাস্তার যেদিকটায় বাজার বসে সেদিকে একটা চাষি-বউ চার-পাঁচটা রুগণ ফুলকপি আর কয়েক আঁটি শুকনো পালং শাক নিয়ে খদ্দেরের আশায় এখনও বসে রয়েছে। তার অনতিদূরে দুটো কুকুর পাশ ফিরে শুয়ে অকাতরে ঘুমিয়ে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গী আর একটা কুকুর আধবসা অবস্থায় তাকিয়ে রয়েছে আদিত্যদের বাড়ির দিকে। তার চোখে খুব মায়া।

এখনও কেঁদে চলেছে মেয়েটা। যেন ভেতরে অনেকটা কান্না লুকিয়ে বসেছিল, এখন লোকজনের সাড়া পেয়ে বেরিয়ে পড়ছে সেসব। এই রকম অবস্থায় আদিত্য বুঝে উঠতে পারে না কী করবে। তাই সে মেয়েটাকে সামলানোর দায়িত্ব কেয়ার ওপর ছেড়ে দিয়ে জানলার বাইরে তাকিয়েছিল। কেয়া যে মেয়েটাকে খুব ভাল সামলাতে পারছে, তা নয়। মাঝে মাঝে মেয়েটার পিঠে আলতো চাপড় মারছে, বাচ্চাদের ঘুম পাড়ানোর সময় মায়েরা যেমন চাপড় মারে।

ভাগ্যবশত, একটু পরে অনিতা শর্মা চৌধুরি নিজের থেকেই সামলে গেল। ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে চোখ মুছে আদিত্যর দিকে তাকাল।

আদিত্য বলল, 'আপনার স্বামী খুন হবার ব্যাপারটা কি আপনি বাপের বাড়িতে জানিয়েছিলেন?'

'ঘটনাটা ঘটার কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি জয়কে ফোন করে ব্যাপারটা বলি। জয় অত দূর থেকে কী করবে? তবে ও সঙ্গে সঙ্গে আমার বাড়িতে সব কিছু জানিয়েছিল। কিন্তু আমার বাবা, মা বা দাদা কেউই আসেনি, আমাকে ফোনও করেনি।'

'জয় ছাড়া আর কাউকে কি আপনি ঘটনাটা জানিয়েছিলেন?'

অনিতা একটু ইতস্তত করে বলল, 'আমার পড়শিরা তো কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যাপারটা জানতে পেরেছিল। জয়কে ফোন করার পর শাশ্বতীদির বাড়িতে আমি নিজেই চলে গিয়েছিলাম। তারপর যতদূর মনে পড়ছে প্রদীপদাদের বাড়ি। কিন্তু ফোনে আর কারও সঙ্গে আমার এটা নিয়ে কথা হয়নি।'

আদিত্যর মনে হল অনিতা শর্মা চৌধুরি পুরো সত্যিটা বলছে না।

সে জিজ্ঞেস করল, 'প্রদীপদা কে?'

'প্রদীপ চক্রবর্তী। আমাদের নীচের তলায় থাকেন।'

'আপনাদের বাড়িটা কোথায়?' আদিত্য কথা ঘুরিয়ে বলল।

'জামির লেনে। বালিগঞ্জ স্টেশনের খুব কাছে।'

'আপনাদের নিজেদের বাড়ি?'

'বাড়ি নয়, ফ্ল্যাট। আগে এখানে একটা দোতলা বাড়ি ছিল। দোতলায় বাড়িওলা থাকত। আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা একতলায় ভাড়া থাকত। সৈকত ওখানেই বড় হয়েছে। আমার শ্বশুর তখন কলকাতার একটা কলেজে পড়াতেন। তারপর উনি চাকরি নিয়ে কল্যাণী চলে গেলেন। সৈকত তখন ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেছে। নিজের ফার্ম করেছে। সে ওই বাড়িতেই রয়ে গেল। আমি বিয়ের পর ওখানেই গিয়ে উঠেছিলাম। বাড়িটা ভেঙে যখন ফ্ল্যাটবাড়ি হল তখন সৈকত নিজের নামে একটা ফ্ল্যাট নিল। তবে এখনও সব টাকা শোধ হয়নি।'

'বাড়িটা এখন কত তলা?'

'চারতলা। দোতলা বাড়ি ভেঙে চারতলা ফ্ল্যাটবাড়ি হয়েছে। খুব বেশি জায়গা ওখানে ছিল না।'

'কটা ফ্ল্যাট?'

'একতলায় শুধু গাড়ি রাখার জায়গা, কোনও ফ্ল্যাট নেই। দোতলায় দুটো ফ্ল্যাট, তিনতলায় আরও দুটো ফ্ল্যাট আর চারতলার পুরোটা নিয়ে পুরোনো বাড়িওলা থাকে। আমাদের ফ্ল্যাটটা তিনতলায়।'

'শাশ্বতীরা কি তোমাদের তলাতেই থাকে?' কেয়া জিজ্ঞেস করল। 'শাশ্বতী অনেকবার যেতে বলেছে, যাওয়া হয়নি। ইচ্ছে আছে একদিন যাব।'

'হ্যাঁ। শাশ্বতীদি-দীপকদারা আমাদের পাশের ফ্ল্যাটেই থাকে। ওরা না থাকলে আমি যে কী করতাম!'

আদিত্য ধরে নিল শাশ্বতী শাসমলের স্বামীর নাম দীপক। সে বলল, 'দোতলার ফ্ল্যাটে কারা থাকে?'

'পুব দিকের ফ্ল্যাটে প্রদীপ চক্রবর্তীরা স্বামী-স্ত্রী থাকেন। ওঁদের ছেলে-মেয়ে নেই। প্রদীপদা কোনও একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করতেন। বেশ কিছুদিন রিটায়ার করেছেন। সৈকতকে খুব ভালবাসতেন। সৈকতও ছিল প্রদীপদা বলতে অজ্ঞান। সৈকত বলত, আমাদের পুরো ফ্ল্যাটবাড়িতে প্রদীপদাই একমাত্র লেখাপড়া জানা লোক। আসলে প্রদীপদা খুব ভাল ছাত্র ছিলেন। সিক্সটিজে প্রেসিডেন্সিতে ফিজিক্স পড়তেন। কলেজে পড়ার সময় নকশাল হয়ে গিয়ে আর খুব বেশি লেখাপড়া হয়নি। পরে বিএসসিটা পাশ করেছিলেন। প্রদীপদার স্ত্রী রাখিদিও নকশাল করতেন। প্রদীপদারই ক্লাসমেট। রাখিদি একটা স্কুলে পড়াতেন। উনিও রিটায়ার করেছেন।'

আদিত্যর মনে হল অনিতা মেয়েটার একটু বেশি কথা বলা স্বভাব। প্রথম দিকে একটু আড়ষ্ট ছিল। এখন একটু একটু করে স্বাভাবিক হচ্ছে।

'তাহলে তো বলতে হয়, শুধু শাশ্বতী শাসমলরা নয়, প্রদীপ চক্রবর্তীরাও আপনার একটা ভরসা।'

'ভরসা তো বটেই। তবে ...' অনিতা কিছু একটা বলতে ইতস্তত করেছে।

আদিত্য জিজ্ঞাসু চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল। অনিতা যেটা বলতে চায় সেটা যতক্ষণ সে নিজে থেকে না বলছে ততক্ষণ আদিত্য ঠিক করেছে তার দিকে তাকিয়েই থাকবে।

কিছুক্ষণ পরে অনিতা বলল, 'আসল ব্যাপারটা খুব বেশি কেউ জানে না। রাখিদির ব্রেনে টিউমার হয়েছে। ম্যালিগনেন্ট। এটা জানার পর থেকে প্রদীপদা ভেতরে ভেতরে এতটাই ভেঙে পড়েছে যে ওকে আর আমার সমস্যাগুলো নিয়ে বিব্রত করতে ইচ্ছে করে না।'

'দোতলায় আর কারা থাকে?'

'আমাদের ঠিক নীচে পশ্চিম দিকের ফ্ল্যাটে মলয়া বিশ্বাস মেয়ে নিয়ে থাকে। ওর স্বামী সুব্রত বিশ্বাস ব্যাঙ্কে চাকরি করে। শিলিগুড়িতে পোস্টেড। মাঝে মাঝে আসে। মলয়া বিশ্বাস খুব ডিফিকাল্ট মহিলা। সব সময় ওর মনে হয় ওকে সবাই ঠকাচ্ছে। আমাদের বাড়িতে একটা লিফট আছে। ওরা দোতলায় থাকে বলে খুব একটা লিফট ব্যবহার করে না। তাই কিছুতেই মেনটেনেন্স-এর পুরো টাকা দেবে না। অথচ মেনটেনেন্স-এর টাকায় লিফট চলবে জেনেই তো ফ্ল্যাট কিনেছিল। বারান্দায় জামাকাপড় শুকোতে দিলেও খ্যাচখ্যাচ করে। ওদের বারান্দায় নাকি জল পড়ছে। বিশ্বাসদের বারান্দাটা আমাদের বারান্দার ঠিক নীচে। আমরা কোথায় জামাকাপড় শুকোতে দেব?'

'আর বাড়িওলারা? তারা কতজন চারতলায় থাকে?'

'সেখানে থাকে শুধু বুড়ো-বুড়ি। একটা ফ্ল্যাট ছেলের জন্যে রাখা আছে। কিন্তু ছেলে ব্যাঙ্গালোরে চাকরি করে। সেখানেই সে ফ্যামেলি নিয়ে থাকে। আর মেয়ে থাকে ক্যানাডায়। সেখানেই এখন বুড়ো-বুড়ি বেড়াতে গেছে। এই ঘটনার সময় তারা টরোন্টোতেই ছিল।'

'একটা প্রশ্ন। আপনাদের ফ্ল্যাটবাড়ির মূল ফটকে নিশ্চয় সিকিউরিটি থাকে। ঘটনার দিন সিকিউরিটি কি বাইরের কাউকে ঢুকতে দেখেছিল?'

প্রশ্নটা শুনে অনিতা যেন খানিকটা থতমত খেয়ে গেল। কিছুক্ষণ থেমে বলল, 'সিকিউরিটি কাউকে দেখেছিল কিনা আমি বলতে পারব না। পুলিশ হয়তো বলতে পারবে। তারা শুনেছি সিকিউরিটিকে অনেকক্ষণ ধরে ইন্টারোগেট করেছে। আমি যখন বাড়ি ঢুকছি তখন কিন্তু সিকিউরিটি গেটের পাশেই বসেছিল। বাইরে থেকে কেউ এসে থাকলে সে নিশ্চয় বলতে পারবে।'

আদিত্য চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে জানলার পর্দাটা টেনে দিয়ে এল। রোদ্দুরটা এতক্ষণে গায়ের ওপর এসে পড়েছে। এতক্ষণ যা শুনেছে কিছু সময় ধরে সেসব খাতায় নোট করল। তারপর মুখ তুলে অনিতাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার স্বামীর ব্যবসার ব্যাপারটা এবার একটু বলবেন? আপনি বলছিলেন না আপনার স্বামীর পার্টনার আপনার স্বামীকে ঠকিয়েছে?'

'চলে যাবার কিছুদিন আগে থেকে সৈকত আমাকে তাই বলছিল। একবার নয়, বারবার। সৈকতের পার্টনার মণিময় গুপ্ত কলেজে ওর কয়েক বছরের সিনিয়ার ছিল। বলতে গেলে মণিময়দাই ছিল ওর ফ্রেন্ড-ফিলসফার-গাইড। মণিময়দার কথাতেই সৈকত চাকরির চেষ্টা না করে ব্যবসায় নেমেছিল। মণিময়দাকে ও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করত। অথচ সেই মণিময়দাই ওকে ঠকাল। আসলে সৈকত সব মানুষকেই এক কথায় বিশ্বাস করে ফেলত।'

'কীভাবে মণিময় গুপ্ত সৈকতবাবুকে ঠকিয়েছিল আপনি জানেন? মানে, আপনার স্বামী আপনাকে বলেছিলেন?'

'দেখুন, সৈকতের টাকাপয়সার দিকটা আমি কিছুই জানতাম না। আমার যেটুকু দরকার সৈকতের কাছ থেকে না চাইতেই পেয়ে গেছি। তবে শেষের দিকে সৈকতকে ভীষণ চিন্তিত দেখাত। চিন্তিত না বলে বলা ভাল ডিপ্রেসড দেখাত। আমি জিজ্ঞেস করলেই বলত মণিময়দা ওকে ঠকিয়েছে।'

'আপনাদের কি তখন কোনও টাকাপয়সার টানাটানি হয়েছিল?'

'হলেও আমি টের পাইনি। সংসারটা সৈকতই চালাত। সেটা আগের মতোই চলছিল।'

সৈকতবাবু চলে যাবার পর কি এখন আপনার কোনও অর্থকষ্ট হচ্ছে? মাফ করবেন, সত্যিটা জানার জন্য এই ডেলিকেট প্রশ্নটা আমাকে করতেই হচ্ছে।' আদিত্য কুণ্ঠিতভাবে বলল।

'একটু অসুবিধে তো হচ্ছেই। সৈকতের তো একটা ভাল রোজগার ছিল। সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। তাছাড়া সৈকত কোনওদিনই খুব জমাতে পারেনি। তবে যেটুকু ও রেখে গেছে তা দিয়ে আমার আপাতত চলে যাচ্ছে। হয়তো ভবিষ্যতে একটা কাজ-টাজ খুঁজতে হবে।' অনিতার গলাটা কিছু বিপন্ন শোনাল।

'আচ্ছা মণিময় গুপ্তর কাছ থেকে তো আপনার কিছু পাওনা থাকতে পারে? আপনি গিয়েছিলেন তার কাছে?'

'মণিময়দা গত কয়েক সপ্তাহ ল্যাটিন অ্যামেরিকা ট্যুর করছে। একা মানুষ, বিয়ে করেনি, তাই সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ায়। কাউকে জানায় না কোথায় আছে। যেমন এখন মণিময়দা কোথায় আছে কেউ বলতে পারছে না। সৈকতের ব্যাপারটা মণিময়দা এখনও জানেই না। সৈকত মারা যাবার কয়েকদিন আগেই মণিময়দা বেরিয়ে পড়েছিল। পুলিশ এখনও মণিময়দার সঙ্গে কনট্যাক্ট করে উঠতে পারেনি। এবার বোধহয় মণিময়দার ফেরার সময় হয়েছে। ফিরলে আমি যোগাযোগ করব।'

সৈকতবাবুর অফিসটা কি এখন তাহলে বন্ধ রয়েছে?'

'বন্ধ আছে বলে মনে হয় না। বিশ্বজিৎ মজুমদার বলে একজন আছে, সৈকতদের কম্পানির জেনারেল ম্যানেজার। ও তো এই সেদিনও ফোন করেছিল। মাঝে মাঝেই ফোন করে খবর নেয়। সৈকতদের অফিসে এখনও কুড়ি-বাইশজন কাজ করে। মনে হয়, মণিময়দা ফিরে এসে আবার অফিসের হাল ধরবে।'

'আপনি সৈকতবাবুর অফিসের ঠিকানাটা দিতে পারেন? একবার ওখানে যাওয়া খুব দরকার।'

'একজ্যাক্ট ঠিকানাটা অফ হ্যান্ড বলতে পারছি না। অফিসটা সল্ট লেক সেক্টর থ্রিতে। স্টেডিয়ামের কাছে। আমি দু-তিনবার গেছি।' তারপর একটু থেমে অনিতা বলল, 'দাঁড়ান। বিশ্বজিৎকে ফোন করে জেনে দিচ্ছি।'

অনিতা যখন ফোন করছে তখন আদিত্য এক মনে খাতায় লিখছিল। কেয়া ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। লিখতে লিখতে আদিত্য আশা করছিল কেয়া হয়ত চা করতে গেছে। আর এক কাপ চা খেতে আদিত্যর খুব ইচ্ছে করছিল।

অনিতা ফোনে বিশ্বজিৎকে ধরে ফোনটা আদিত্যকে দিল। 'আপনি কথা বলে নিন।'

কিছুক্ষণ পর কথা শেষ করে অনিতার ফোনটা ফেরত দিয়ে আদিত্য খাতায় লিখতে লিখতে বলল, 'গুপ্ত অ্যান্ড চৌধুরি সিভিল কনস্ট্রাকশান্স। আই বি ৯৪৫ সল্ট লেক। সেক্টর থ্রি। সাদা দোতলা বাড়ির একতলায়।' যেন মুখে না বললে ঠিকানাটা ভুলে যাবে।

আদিত্য আরও কীসব খাতায় লিখে রাখছিল। অনিতা কিছুটা ব্যাগ্র হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। এবার লেখা শেষ করে সে খাতা থেকে মুখ তুলে বলল, 'আপনার স্বামীর খুন হবার ব্যাপারটা খানিকটা জানতে পারলাম। এখন প্রশ্ন হল, আপনি আমাকে ঠিক কী করতে বলছেন?'

অনিতা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'খাতাটা এখনই বন্ধ করবেন না। আসল কথাটা এখনও বলা হয়নি। আসল কথাটা বললে বুঝতে পারবেন কেন আপনার কাছে এসেছি।'

কেয়া সত্যি সত্যি আবার চা নিয়ে ঘরে ঢুকেছে। সে অনিতাকে বলল, 'আমরা কর্তা-গিন্নি খুব চা-খোর। তুমিও আমাদের সঙ্গে আর একবার চা খাও।'

অনিতা উত্তর দিচ্ছে না। গভীরভাবে অন্য কথা ভাবছে। যেন কেয়ার কথাটা সে শোনেইনি। যেন খুব দরকারি কিছু বলার আগে নিজেকে গুছিয়ে নিচ্ছে। তারপর সে বলতে শুরু করল।

'মারা যাবার কিছুদিন আগে আমার স্বামী একটা ইনশিয়োরেন্স করেছিলেন। পাঁচ কোটি টাকার লাইফ ইনশিয়োরেন্স। অনেক টাকার প্রিমিয়াম। বেনিফিশিয়ারি আমি। আমি কিন্তু এই পলিসিটার কথা কিছুই জানতাম না। সৈকত চলে যাবার পর জানতে পেরেছি। কেন সৈকত এত মোটা টাকার পলিসি করেছিল

বুঝতে পারছি না। একটা প্রিমিয়ামও দিয়েছিল। আর একটা প্রিমিয়াম ডিউ হবার আগেই ও চলে গেল। সৈকত কি ওর জীবনের আশঙ্কা করছিল?'

'তার মানে ইনশিয়োরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে আপনি এখন পাঁচ কোটি টাকা পাবেন? আপনার আর্থিক সমস্যা তো তাহলে মিটে গেল।' আদিত্য খানিকটা বিভ্রান্ত।

'না। ব্যাপারটা অত সহজ নয়। পলিসিতে লেখা আছে, সৈকত যদি আত্মহত্যা করে কিংবা যদি প্রমাণ হয় যে পলিসির বেনিফিশিয়ারিই সৈকতকে খুন করেছে, তাহলে ইনশিয়োরেন্স কোম্পানিকে এক পয়সাও দিতে হবে না। এখন, ব্যালিসটিক রিপোর্ট জোর দিয়ে বলছে সৈকতের মৃত্যুটা আত্মহত্যা নয়, খুন। সেই রিপোর্টটা ইনশিয়োরেন্স কোম্পানি উড়িয়ে দিতে পারছে না। অতএব তারা এটা প্রমাণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে যে পয়সার লোভে আমিই সৈকতকে খুন করেছি। আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছেন? সৈকত চলে যাবার পর একে আমি ডিভাস্টেটেড হয়ে গেছি। তার ওপর রোজ ইনশিয়োরেন্স কোম্পানির লোক এসে নানারকম প্রশ্ন করে আমাকে পাগল করে দিচ্ছে। ওরা তো চেষ্টা করবেই। পাঁচ কোটি খুব কম টাকা নয়।'

অনিতা থামল। আদিত্য লিখছে।

'সব মেয়েদের একটা করে বাপের বাড়ি থাকে। আমার তো তাও নেই। আমি কার কাছে যাব? শাশ্বতীদি বলল আপনার কাছে এলে একটা সুরাহা হতে পারে। তাই আপনার কাছে এলাম। আপনি আসল খুনিকে ধরে দিন, এটাই আপনার কাছে আমার আর্জি। আমি কিন্তু আগেই বলে রাখছি, এক্ষুনি আপনাকে কোনও ফিস দিতে পারব না। আমার সে সামর্থ্য নেই। তবে যদি কখনও ইনশিয়োরেন্সের টাকাটা পাই কিংবা যদি মণিময়দা সৈকতের প্রাপ্য বলে আমাকে কিছু টাকা দেয়, তাহলে আপনার সমস্ত ফিস আমি মিটিয়ে দেব। আপনি কি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন?' অনিতার শেষ কথাগুলো প্রায় আর্তির মতো শোনাল।

'টাকা-পয়সার কথা আপতত বাদ দিন। আমি একটা অন্য কথা ভাবছি। আপনার বাড়িটা কোন থানার আওতায় পড়বে? পুলিশের কাছ থেকে কিছু তথ্য পাওয়া গেলে সুবিধে হত।'

'গড়িয়াহাট থানা। ওখান থেকেই তো একজন পুলিশ ইন্সপেক্টার তদন্ত করতে এসেছিল।'

'ঠিক আছে। আমি ওখানেই আগে খোঁজ নেব। সৈকতবাবুর আপিসেও যেতে হবে একদিন। বিশ্বজিৎবাবুর সঙ্গে তো আলাপ হয়েই গেল। উনি কতদিন এই কোম্পানিতে আছেন, জানেন?

'অনেকদিন। ঠিক কতদিন বলতে পারব না।'

'ঠিক আছে। আপনাদের বাড়িতেও খুব শিগগির একদিন যাচ্ছি।'

(৩)

মাত্র ছ-সাত মাস হল কেয়া সংসার পেতেছে, অথচ এর মধ্যেই সে যে কী করে এত চমৎকার গৃহিণীপনা রপ্ত করে ফেলল ভেবে আদিত্য অবাক হয়ে যায়। পরীক্ষার খাতা দেখতে দেখতে সে যখন কাজের মাসিকে অনায়াসে কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছে, কিংবা যখন সারাদিন ক্লাস নিয়ে ইস্কুল থেকে ফিরেই আবার সদ্য ইউ-টিউবে শেখা নারকেল দিয়ে লাউয়ের খোসা ভাজার নতুন রেসিপি অথবা উচ্ছে দিয়ে কাঁচা মুগের সাবেকি তেতোর ডাল নিয়ে রান্নাঘরে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, তখন আদিত্য আড়াল থেকে তাকে দ্যাখে। যেন নিষিদ্ধ কিছু দেখছে। দ্যাখে আর মুগ্ধ হয়ে যায়। আদিত্যর অভিজাত নাগরিক সত্তা টের পায়, এই মুগ্ধতার আড়ালে আর একটা হাবাগোবা গ্রাম্য আদিত্য মজুমদার লুকিয়ে রয়েছে। থাকলে থাকুক, কিছু এসে যায় না। অভিজাত, নাগরিক, হাবাগোবা, গ্রাম্য, বুদ্ধিমান, বোকা আদিত্যর সবকটা সত্তা এখন নতুন দাম্পত্যের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে।

বাড়িটা ছোট। পশ্চিমে শোবার ঘরের জানলা খুললে খাড়া দেয়াল। দেয়ালের আড়ালে একটা লোহা-লক্কড়ের কারখানা আছে। জানলা দিয়ে সেটা দেখা না গেলেও লোহা পেটানোর শব্দে কানে তালা ধরে যায়। তাই জানলাটা দিনের বেলায় খোলা যায় না। রাত্তিরে কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে আদিত্য জানলাটা খুলে দেয়। একদিন রাত্তিরবেলা আদিত্য যখন অন্ধকারে আকুল হয়ে কেয়াকে আদর করছে তখন খোলা জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে তাদের বেআব্রু করে দিয়েছিল।

পুব-দক্ষিণেও জানলা আছে। সেদিক দিয়ে তাকালে রাস্তা দেখা যাবে। বড় রাস্তা নয়, বড় রাস্তা থেকে বেরোনো একটা শাখা। তবে বড় রাস্তার ট্র্যাফিক লাইট এড়াতে প্রায় সারাদিন সেখানে গাড়ি-অটো চলে। কালেভদ্রে বাড়িঘর-কাঁপানো ট্রাক। জানলার সামনে আদিত্য একটা আরাম-চেয়ার পেতেছে। ওটাই তাদের বসার ঘর। বাইরের কেউ এলে এই ঘরেই বসানো হয়। আদিত্যর সখের আরাম-চেয়ার ছাড়াও ঘরে তিনটে আলগা আলগা বেতের চেয়ার, একটা ছোট সেন্টার টেবিল, আর এক কোণে একটা ডিভান আছে। ডিভানের পেটে সুটকেস, কম্বল, বাড়তি বালিশ-চাদর-বেডকভার, কাগজপত্র এবং আরও হাবিজাবি জিনিস রাখার বন্দোবস্ত। ডিভানের ওপরে তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় কেয়া পরীক্ষার খাতা দ্যাখে। খুব শিগগির একটা টিভি কেনা হবে বলে সে শাসিয়েছে। ওটা কোথায় রাখা হবে তাই নিয়ে এখন জল্পনা চলছে।

আর একটা খুব ছোট কাজের ঘর আছে। সেখানে এক সেট চেয়ার টেবিল, দেয়ালে বই রাখার খোলা র‍্যাক, কাগজপত্র রাখার ছোট আলমারি। আদিত্যর সিডিগুলো বই-এর র‍্যাকের এক ধারে জায়গা পেয়েছে। আদিত্য বা কেয়া, যার যখন দরকার, এই ঘরে বসে লেখাপড়ার কাজ করে। এটা আদিত্যর গান শোনার ঘরও বটে।

এছাড়া আছে একটা রান্না ঘর। সেখানে রান্নার ব্যবস্থা এবং খাবার চেয়ার-টেবিল। ওগুলো কিছুদিন আগে অন-লাইনে কেনা হয়েছে। রান্নাঘরে আদিত্যও মাঝে মাঝে রান্না করে। বিশেষ করে লাঞ্চ। কেয়ার ইস্কুলে বেরোনোর তাড়া থাকলে আদিত্য লাঞ্চ বানিয়ে দেয়। একটু সাহেবি ধরনের খাবার সে বানাতে পারে। স্যান্ডউইচ, বয়েলড ভেজিটেবলস, পাস্তা, কিংবা স্রেফ আলু সেদ্ধ, ডিম সেদ্ধ, মাখন-পাঁউরুটি। কাজের মাসি কেটে-বেটে দেয়, রান্না করে না। তবে আদিত্য বা কেয়া কেউই রুটি করতে শেখেনি। একটু রাতের দিকে হাঁটতে বেরিয়ে আদিত্য বাইরে থেকে রুটি কিনে আনে। রাস্তার মোড়ে বিহারিদের একটা রুটির দোকান আছে।

আজকাল আদিত্যর একটু নামডাক হয়েছে, বিশেষ করে সরকারি মহলে। সরকারি কাজ নিয়ে গত মাসে দু'বার দিল্লি যেতে হয়েছিল। আসল কাজটা হয়ে গেলেও এখনও কিছু সরকারি লৌকিকতা বাকি রয়ে গেছে। তার মধ্যে বড় কাজ একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট লিখতে হবে। সেটা লিখতে আদিত্যর আলস্য লাগছিল। রিপোর্ট লেখার থেকে অনিতা চৌধুরির ব্যাপারটা চিন্তা করা অনেক সন্তোষজনক। সকালবেলা ঘণ্টাখানেক রিপোর্ট লেখা নিয়ে ধস্তাধস্তি করার পর আদিত্য ঠিক করল গড়িয়াহাট থানায় সৈকত চৌধুরির কেসটা সম্বন্ধে জানতে যাবে। কিন্তু তার আগে, যে ইন্সপেক্টার মামলাটার তদন্ত করছে তার কাছে লালবাজার থেকে একটা ফোন গেলে ভাল হত। ফোনের বন্দোবস্ত করতে কিছুটা সময় লেগে গেল।

শ্যামবাজার থেকে মেট্রোতে কালীঘাট। অফিস যাত্রীদের ভিড়ে ঠাসা কামরা, আদিত্য কোনও ক্রমে একটু দাঁড়াবার জায়গা পেয়েছে। সে তেরচাভাবে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল সাড়ে বারোটা বেজে গেছে। আশ্চর্য, এখনও আপিসযাত্রীদের ভিড় কমল না! সেন্ট্রাল স্টেশন থেকে কামরা ফাঁকা হচ্ছে। চাঁদনি, এসপ্লানেড পেরিয়ে পার্ক স্ট্রিট আসার আগেই আদিত্য বসার জায়গা পেয়ে গেল। ভবানীপুর স্টেশন, ইতিহাসকে কাঁচকলা দেখিয়ে যার নাম দেওয়া হয়েছে নেতাজী ভবন, পৌঁছতেই এক ঝাঁক বাচ্চা হুড়মুড় করে কামরায় উঠে পড়ল। তাদের সঙ্গে তাদের মায়েরা। নিশ্চয় কোনও মর্নিং ইস্কুল ছুটি হয়েছে। বসার জায়গা থাকা

সত্ত্বেও বাচ্চারা বসতে চায় না। কামরাটাই এখন তাদের খেলার মাঠ। কোনও কোনও মা অবশ্য তাদের বাচ্চাদের পাশে বসিয়ে টিপিন খাওয়াচ্ছিল। আড়ি পেতে বাচ্চাদের কথাবার্তা শুনতে আদিত্যর খুব ভাল লাগে। কিন্তু বেশিক্ষণ সে সুযোগ পাওয়া গেল না, দেখতে দেখতে ট্রেন পৌঁছে গেল কালীঘাট।

মাঘ মাসের মিঠে রোদ্দুর। মেট্রো স্টেশন থেকে বেরিয়ে আদিত্য হাঁটার মতলব করছিল। কিন্তু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অটোতে উঠে পড়তে বাধ্য হল। ইন্সপেক্টার অচিন্ত্য সাহাকে সোয়া একটায় টাইম দেওয়া আছে। দেরি হয়ে গেলে সে থানা থেকে বেরিয়ে যেতে পারে।

'বসুন স্যার।' ইন্সপেক্টার অচিন্ত্য সাহা তার সামনের চেয়ারটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিয়ে বলল। 'আপনার কথা অনেক শুনেছি।'

'কার কাছে শুনলেন আমার কথা?' আদিত্য একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করল।

'আপনার কথা লালবাজারে তো সকলেই জানে। তবে আমি শুনেছি এমন একজনের কাছ থেকে যার সরাসরি সৌভাগ্য হয়েছে আপনার সঙ্গে কাজ করার। সুব্রত চাকিকে আপনার মনে আছে?'

'বিলক্ষণ মনে আছে। চাকি আপনাকে আমার কথা বলেছে? সে এখন কোথায় পোস্টেড?'

'আমাদের এখানেই স্যার। গড়িয়াহাট থানায়। চাকি আর আমি এক ব্যাচ, খুব বন্ধু। আপনার কথা চাকি খুব বলে। বলে, কুমুদিনী মামলায় আপনার সঙ্গে ও কাজ করেছিল।'

'অবশ্যই করেছিল। চাকি কোথায়? তাকে ডাকুন না একবার?'

'চাকি থানায় নেই স্যার। একটা কেসে সমন পেয়ে আলিপুর কোর্ট গেছে। আপনার সঙ্গে দেখা হল না বলে খুব আপশোষ করে গেল।'

'আরে আজ দেখা হল না তো কী হয়েছে? আমি তো জেনে গেলাম চাকি এখানে পোস্টেড। আর একদিন সময় করে আসব।'

'ঠিক আছে স্যার। আমি চাকিকে বলে দেব। একটু চা খাবেন তো স্যার? চা-টা আমাদের এখানে খুব ভাল করে।' আদিত্যর সম্মতির অপেক্ষা না করেই অচিন্ত্য সাহা গলা তুলে কাউকে বলল, 'আমার টেবিলে দুটো চা দিস গোবিন্দ।'

অন্তরীক্ষ থেকে উত্তর এল, 'দিচ্ছি দাদা।'

চা-টা ভাল। আদা দেওয়া। চায়ে দ্বিতীয় চুমুকটা দিয়ে আদিত্য বলল, 'আপনার কাছে একটা সাহায্য চাইতে এসেছি। জানতে পারলাম জামির লেনের সৈকত চৌধুরির খুনের কেসটা আপনি ইনভেস্টিগেট করছেন। সৈকত চৌধুরির স্ত্রী আমার কাছে এসেছিলেন। ইনশিয়োরেন্স কোম্পানির গোয়েন্দা ওকে খুব বিরক্ত করছে। বললেন, আমি যদি ওকে হেল্প করতে পারি।'

কথাগুলো বলতে বলতে আদিত্য লক্ষ করছিল অচিন্ত্য সাহার মুখটা ক্রমশ গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। আদিত্যর কথাগুলো শেষ হবার পর অচিন্ত্য সাহা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'স্যার, আপনাকে আমরা সকলে খুব সম্মান করি। তার থেকেও বড় কথা আপনাকে আমরা নিজের লোক মনে করি। তাই আপন ভেবে আপনাকে বলছি, আমাদের স্থির বিশ্বাস ওই মহিলাই ওর স্বামীকে খুন করেছে। আমার ইনভেস্টিগেশন অন্তত তাই বলছে। দেখুন, বাড়ির গেটে একজন সিকিউরিটি বসে থাকে। তার চোখ এড়িয়ে বাইরের লোকের পক্ষে বাড়িতে ঢোকা সম্ভব নয়। সিকিউরিটির ছেলেটা জোর দিয়ে বলছে সেদিন বিকেলে বাইরে থেকে কেউ বাড়িতে ঢোকেনি। তাহলে এটাই দাঁড়াচ্ছে যে বাড়ির ভিতরের কেউ সৈকত চৌধুরিকে খুন করেছে। কিন্তু অন্য ফ্ল্যাটের কারও সঙ্গে তো সৈকতের কোনও শত্রুতা ছিল না। সৈকতের মৃত্যুতে কারও কোনও লাভের সম্ভবনাও ছিল না। তাহলে একমাত্র বাকি রইল সৈকতের স্ত্রী অনিতা, সৈকত মারা গেলে যার পাঁচ কোটি টাকা পাবার কথা।'

'সিকিউরিটি ছেলেটা কখনও গেট ছেড়ে যায়নি?'

'আমি এটা বারবার জিজ্ঞেস করেছি। ছেলেটা হলফ করে বলছে সকালে ডিউটিতে আসার পর থেকে সে গেট ছেড়ে কোথাও যায়নি। বাড়িটা নতুন বলে এখনও সিসি টিভি বসেনি। তাই সিকিউরিটির কথাই আমাদের একমাত্র এভিডেন্স।'

'সেদিন বাড়ির লোক কারা কারা বাইরে গিয়েছিল? সিকিউরিটি কিছু বলেছে?'

'হ্যাঁ স্যার, বলেছে। আমি একটু আমার ডায়েরিটা দেখে বলতে পারব। দেখে বলছি স্যার।'

অচিন্ত্য সাহা তার ডেস্কের ড্রয়ার থেকে একটা ডায়েরি বার করল। তারপর দেখে দেখে বলল, 'প্রদীপ চক্রবর্তী বেরিয়েছিল খুব সকালে। সিকিউরিটি ডিউটিতে আসার আগে। সিকিউরিটি ছেলেটা তাকে বেরোতে দেখেনি। বিকেলবেলা সে ফিরে আসে। পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে প্রদীপ চক্রবর্তী বলেছে সে তার স্ত্রীর জন্যে একটা ওষুধ কিনতে বেরিয়েছিল। ওষুধটা কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না। সারাদিন ঘুরে বড়বাজারের মেহতা বিল্ডিং, মানে যেখানে ওষুধের হোলসেলারদের দোকান, সেখানে সে ওষুধটা পেয়েছিল।'

'অত সকালে বেরিয়েছিল কেন? অত সকালে ওষুধের দোকান খোলে নাকি?'

'এই প্রশ্নটা স্যার আমার মাথাতেও এসেছিল। প্রদীপ চক্রবর্তী বলল, এস এস কে এম-এর কাছে কিছু দোকান আছে চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকে। ওখানেই প্রথম ওষুধটা খুঁজেছিল। তারপর না পেয়ে অন্য জায়গায় খুঁজেছিল।'

'বুঝলাম। আর কে কে বেরিয়েছিল?'

'দীপক শাসমল দুপুরবেলা বেরিয়েছিল। ফিরেছিল প্রায় আটটা নাগাদ। কাছেই তার কলেজের একজন সহকর্মীর বাড়ি গিয়েছিল।'

'আর?'

'সকালে সৈকত চৌধুরি নিজে বেরিয়েছিল। বিকেলে ফিরে এসেছিল। অনিতা চৌধুরিও বেরিয়েছিল।'

'আচ্ছা, সৈকত আত্মহত্যা করেনি কী করে বুঝলেন?' আদিত্য প্রসঙ্গ পাল্টালো।

'এই প্রশ্নটা প্রথম থেকেই আমাদের মাথায় ছিল। সৈকত আত্মহত্যা করেনি তো? কিন্তু ব্যালিস্টিক রিপোর্ট জোর দিয়ে বলছে এটা কিছুতেই আত্মহত্যা হতে পারে না। এটা নিঃসন্দেহে খুন। যেভাবে, মানে যে দিক থেকে, গুলিটা শরীরে এসে ঢুকেছে সেটা ভিক্টিম নিজে গুলি চালালে কখনই সম্ভব হত না।'

'ব্যালিস্টিক রিপোর্ট থেকে আর কী জানা যাচ্ছে?'

'বিশেষ কিছু না। শুধু এটাই যে একটা ছোট .৩২ ক্যালিবারের পিস্তল থেকে গুলিটা ছোঁড়া হয়েছিল।'

'মার্ডার ওয়েপনটা কি পাওয়া গেছে?'

'না, সেটা অবশ্য এখনও পাওয়া যায়নি' অচিন্ত্য সাহাকে একটু অপ্রস্তুত দেখাল, 'তবে আমরা ওটার খোঁজে আছি। মনে হয়, পেয়ে যাব।'

'তাহলে আপনারা কি শিগগির অনিতা চৌধুরিকে অ্যারেস্ট করছেন?'

'আমরা একটু সময় নিচ্ছি। আসলে কেসটায় আরেকটা অ্যাঙ্গেল আছে। আমরা সেই ব্যাপারে কিছু এভিডেন্স জোগাড় করছি।'

আদিত্য জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অচিন্ত্য সাহার দিকে তাকাল। অচিন্ত্য সাহা বলল, 'এই বাড়তি অ্যাঙ্গেলটার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ইনশিয়োরেন্স কোম্পানির গোয়েন্দা বিপ্লব সমাদ্দার। বিপ্লবদা আমাদের চেনা লোক। আমাদের সার্ভিস থেকেই রিটায়ার করে সদ্য এই জাপানি ইনশিয়োরেন্স কোম্পানিতে জয়েন করেছেন, যে কোম্পানি ইনশিয়োরেন্সটা বিক্রি করেছে। বিপ্লবদা খোঁজ নিয়ে দেখেছেন ইদানীং অনিতা চৌধুরি একটা বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল। মলয়া বিশ্বাস বলে অনিতাদের একজন পড়শি বলেছেন, যখন সৈকত চৌধুরি বাড়িতে থাকত না, একটি ছেলে অনিতাদের ফ্ল্যাটে নিয়মিত আসা যাওয়া

করত। মলয়া বিশ্বাস অনিতাদের ঠিক ওপরের ফ্ল্যাটে থাকেন। তাই হয়তো তাঁর চোখে পড়েছে। আমরা এই ব্যাপারে আরও খোঁজ খবর নিচ্ছি।'

'ছেলেটি অনিতার ভাই নয় তো?'

'না, না। ভাই নয়। ভাই তো অস্ট্রেলিয়া চলে গেছে। এটা তার পরের ঘটনা। তাছাড়া অনিতার ভাইকে মলয়া বিশ্বাস ভাল করেই চেনেন। আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি অনিতার ভাই অনেক দিন দেশে আসেনি। অতএব অনিতার বাড়িতেও আসেনি।'

'তাহলে তো কেসটা বলতে গেলে সলভডই হয়ে গেছে।'

'একরকম তাই। আমরা শুধু আরও এভিডেন্স সংগ্রহ করছি যাতে আদালতে কোনও সমস্যা না হয়।'

'আমাকে ইনশিয়োরেন্স কোম্পানির ডিটেকটিভ এই বিপ্লব সমাদ্দারের ফোন নম্বরটা দিতে পারেন?'

'অন্য কেউ হলে দিতাম না। কিন্তু আপনি তো স্যার আমাদের ঘরের লোক। আপনাকে তো দিতেই হবে। তবে আপনাকে যে কথাগুলো বললাম সেগুলো, বুঝতেই তো পারছেন, হাইলি কনফিডেন্সিয়াল। আপনাকে বলার দরকার নেই জানি। তবু বলছি, এসব কথা পাঁচ কান হলে স্যার আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে।' অচিন্ত্য সাহা তার মুখটা করুণ করে দেখাল।

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন এসব কেউ জানতে পারবে না।'

আদিত্য যখন গড়িয়াহাট থানা থেকে বেরোল তখন আড়াইটে বেজে গেছে।

(৪)

কয়েকটা দিন রিপোর্ট লিখে কেটে গেল। রিপোর্টের মূল অংশটা বিবাদী বাগের কাছে একটা গোপন সরকারি দপ্তরে জমা দেবার পর আদিত্যর একটু ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। একটানা পরীক্ষা শেষ হবার পর যেমন লাগে। অবশ্য আরেকটা অংশ এখনও জমা দেওয়া বাকি রইল। সেটা ততটা গোপনীয় নয়, তাই মেল করে দিলেও হবে। সই করা একটা হার্ড কপি কুরিয়ারও করে দিতে হবে। কিন্তু আজ সে আর এই হতচ্ছাড়া রিপোর্ট নিয়ে ভাববে না। মিনিট দশেক হেঁটে বৌবাজারে তার আপিসে পৌঁছে আদিত্য ভাবল আজ বাকি দিনটা আরাম করবে। সে কেটলিতে কফির জল বসিয়ে সিগারেট ধরাল। ল্যাপটপে সঞ্চয় করে রাখা আলি আকবর খাঁ সাহেবের লঙ্কাদহন সারং চালাল। বাজনা শুনতে শুনতে আদিত্য একেবারে মগ্ন হয়ে গিয়েছিল। প্রচলিত বৃন্দাবনী সারং-এ অবরোহণের সময় কোমল গান্ধার লাগাচ্ছেন খাঁ সাহেব। কখনও কখনও শুদ্ধ ধৈবতও লাগাচ্ছেন। এই তাহলে লঙ্কাদহন সারং! অমিতাভর কাছ থেকে অনেকদিন আগেই এটা আদিত্য পেয়েছিল। এতদিনে শোনার সময় হল। অমিতাভ বলেছিল, এই রাগটার পেছনে একটা গল্প প্রচলিত আছে। হনুমান লঙ্কা জ্বালিয়ে দেবার পর খেয়াল করলেন এই লঙ্কা শহরেই তো মা সীতা বন্দিনী রয়েছেন। শহর জ্বলে গেলে তাঁর কী হবে? লঙ্কাদহন সারং হনুমানের সেই ভয়, উৎকণ্ঠা এবং বিষাদের প্রকাশ। গল্পটা যাই হোক, আদিত্যর মনে হল সুরগুলো হাহাকার করছে। বিশেষ করে খাঁ সাহেবের এক-একটা দিগন্তব্যাপী মিড় আদিত্যকে একেবারে পেড়ে ফেলেছিল।

বাজনা শেষ হবার পরেও আদিত্যর ঘোর কাটছিল না। মোবাইলটা বেজে না উঠলে কতক্ষণে কাটত বলা শক্ত। কেয়া ফোন করছে।

'এই শোনো, আমরা সামনের রবিবার, মানে পরশুদিন, স্কুলের সবাই পিকনিকে যাচ্ছি। সব্বার বর যাবে। বাচ্চারাও আসছে। তুমিও যাচ্ছ কিন্তু। আমি বলে দিয়েছি তুমিও যাচ্ছ। তোমাকে জানিয়ে রাখলাম। না বলতে পারবে না।' একটানা কথাগুলো বলে কেয়া থামল।

'পিকনিক? কোথায় পিকনিক?' আদিত্য একটু একটু করে ব্যাপারটা বুঝতে চাইছে।

'ব্যারাকপুর ছাড়িয়ে, গঙ্গার ধারে একটা বাগানবাড়ি ভাড়া করা হয়েছে। সকালবেলা যাব, বিকেল অবধি প্রোগ্রাম। তুমি যাচ্ছ কিন্তু। আমাদের বিয়েতে তো কাউকে নেমন্তন্ন করতে পারিনি, তাই কেউ তোমাকে দেখেনি। সবাই তোমাকে দেখতে চায়।'

'আমি কি একটা দেখার জিনিস?' আদিত্য মৃদু আপত্তি জানাল। 'ঠিক আছে যাব। শাশ্বতী শাসমল আসছেন তো? মানে, যিনি অনিতা শর্মা চৌধুরিকে আমার কাছে পাঠালেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে দুএকটা কথা জিজ্ঞেস করতাম।'

'শাশ্বতী অবশ্যই আসবে। শাশ্বতী আর কেমিস্ট্রির অদ্রিজাই তো মেন অরগানাইজার।'

'তোমাদের কি কেমিস্ট্রির অদ্রিজা ছাড়া আরও অদ্রিজা আছে?'

'আছে তো। হিস্ট্রিতে আর একজন অদ্রিজা আছে। সেও যাচ্ছে। হিস্ট্রির অদ্রিজা আবার তোমার বিরাট ফ্যান। প্রায়ই জিজ্ঞেস করে তুমি এখন কী করছ। কোন কেস নিয়ে কাজ করছ। এইসব। খবর কাগজে তোমার কথা পড়েছে।'

'সর্বনাশ করেছে।' আদিত্যর গলাটা শঙ্কিত শোনাল। 'আমার তাহলে বোধহয় না যাওয়াই ভাল।'

'আরে ধ্যাৎ। তুমি কি উত্তমকুমার নাকি যে মবড হয়ে যাবে? কেউ তোমাকে বিরক্ত করবে না।'

'না, না। আমি মবড হবার কথা বলিনি। আসলে, তুমি তো জান, আমার প্রফেশনটা নিয়ে আমার খুব সংকোচ আছে। মজুমদার বাড়ির ছেলে আর কিছু করতে না পেরে পেটের দায়ে টিকটিকির কাজ করছে, এটা কি বড়াই করে বলার মতো কিছু?' আদিত্যর গলাটা বিষণ্ণ শোনাল।

'তোমার সব কিছুই অদ্ভুত। সংকোচের কী আছে? খবর কাগজে তোমার নাম বেরোচ্ছে, সবাই তোমার কথা বলছে। আমার তো তোমাকে নিয়ে খুব গর্ব।'

কেয়া ফোন রেখে দেবার পর আদিত্য অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। সৈকত চৌধুরির মৃত্যু রহস্যটা তাকে খুব ভাবাচ্ছে। অচিন্ত্য সাহা যদিও বলছে রহস্য কিছু নেই, অনিতাই টাকার লোভে এবং সম্ভবত তার প্রেমিকের প্ররোচনায় স্বামীকে খুন করেছে, অনিতাকে দেখে আদিত্যর একবারও মনে হয়নি যে সে বন্দুক চালিয়ে নিজের হাতে স্বামীকে খুন করতে পারে। হয়তো লোক লাগিয়ে খুন করানো তার পক্ষে সম্ভব ছিল, কিন্তু সিকিউরিটি ছেলেটাই তো বলছে সেই বিকেলে বাইরে থেকে কেউ বাড়িতে ঢোকেনি। তাছাড়া সৈকত চৌধুরির পার্টনার মণিময় গুপ্তর সঙ্গেও কথা বলা দরকার। অনিতা চৌধুরি বলছে মণিময় নাকি সৈকতকে ঠকিয়েছিল। কথাটা সত্যিও হতে পারে, আবার অনিতার বানানোও হতে পারে। আরও কিছু প্রশ্নের উত্তর না পেলে আদিত্যর স্বস্তি হচ্ছে না। অনিতা চৌধুরির রহস্যময় প্রেমিকটি কে? তার বাপের বাড়ির লোকজনই বা এখানে কোন ভূমিকা পালন করছে? স্ত্রীকে না জানিয়ে সৈকত চৌধুরি অত মোটা টাকার ইনশিয়োরেন্স করতে গেল কেন? যদি ধরে নেওয়া যায় ইনশিয়োরেন্সের কথা অনিতা জানত তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়, অনিতা কি এতই বোকা যে সে বুঝতে পারবে না মোটা টাকার ইনশিয়োরেন্স করে তার স্বামী খুন হয়ে গেলে পুলিশ তাকেই সন্দেহ করবে? তাহলে সে এই কাঁচা কাজটা করতে গেল কেন?

আদিত্য মোবাইলটা তুলে অচিন্ত্য সাহার নম্বরটা লাগাল।

'আর একবার একটু বিরক্ত করছি।' আদিত্য কুণ্ঠিতভাবে বলল।

'না, না। বিরক্ত বলবেন না স্যার। আমরা অলোয়েজ অ্যাট ইয়োর সারভিস। আপনি বলুন স্যার।'

'আমার ছোট্ট প্রশ্ন, তখন জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম। প্রশ্নটা হল, আপনারা কি সৈকত চৌধুরির পার্টনার মণিময় গুপ্তকে ট্রেস করতে পেরেছেন?'

'না স্যার। এখনও পারিনি। তবে ওই অফিসের অনেকে বলছে এরকম অজ্ঞাতবাসে মণিময়বাবু আগেও কয়েকবার গিয়েছিলেন। এতদিনে তাঁর ফিরে আসার সময় হয়েছে।'

'মণিময়বাবুর খবর পেলে আমাকে একবার জানাবেন?'

'নিশ্চয় জানাব স্যার। আর কিছু?'

'আর যদি অনিতা চৌধুরির গোপন প্রেমিকের সন্ধান করতে পারেন, একটু জানাবেন প্লিজ।'

'ঠিক আছে স্যার। জানাব।' অচিন্ত্য সাহার গলায় আদিত্য একটু দ্বিধা লক্ষ করল। আদিত্যর মনে হল এই প্রেমিকের ব্যাপারটা অচিন্ত্য খানিকটা জানে। হয়তো ইনশিয়োরেন্স কোম্পানির ডিটেকটিভ বিপ্লব সমাদ্দারের কাছ থেকে জেনেছে। হয়ত বিপ্লব সমাদ্দার অন্য কাউকে ব্যাপারটা জানাতে তাকে বারণ করেছে। অনিতাকে খুনি প্রমাণ করার ব্যাপারে ইনশিয়োরেন্স কোম্পানি এবং বিপ্লব সমাদ্দার দু'তরফেরই স্বার্থ আছে। সে মুখে বলল, 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ অচিন্ত্যবাবু। আজ রাখছি, কেমন?'

'ঠিক আছে স্যার। ভাল থাকবেন।'

অনিতার গোপন প্রেমের ব্যাপারে অচিন্ত্য আর কিছু জানাবে বলে মনে হচ্ছে না। সে আর বিপ্লব সমাদ্দার দুজনে মিলে অনিতার বিরুদ্ধে ঘুটি সাজাচ্ছে। অনিতার গোপন প্রেমের ব্যাপারটা অন্যভাবে জানতে হবে। আদিত্য মোবাইলটা হাতে তুলে নিয়ে আবার ডায়াল করল। বিমল।

'আপনি স্যার যাদু জানেন। এই আপনাকেই ফোন করতে যাচ্ছিলাম। তার আগেই আপনার ফোন। কেমন আছেন স্যার?'

'ভাল আছি। তোমরা কেমন আছ?'

'আমরা সবাই ভাল আছি স্যার। ম্যাডাম কেমন আছেন?'

'ম্যাডাম ভাল আছে। তুমি আমাকে ফোন করতে যাচ্ছিলে কেন?'

'স্যার আমার মেয়ের বিয়ে। এই ফাল্গুন মাসে। ১৬ই ফাল্গুন। দিনটা ১লা মার্চ পড়েছে।'

'সেকি ? তোমার মেয়ে তো ইস্কুলে পড়ে। এর মধ্যেই বিয়ে দিয়ে দিচ্ছ? মেয়ের বয়েস কত?'

'মেয়ের বিয়ের বয়েস হয়ে গেছে স্যার। গত ডিসেম্বর মাসে আঠেরো পূর্ণ করে উনিশে পড়ল। ও একটু বেশি বয়েসে পড়ছে স্যার।'

'তাও এমন কিছু বয়েস হয়নি। আর একটু লেখাপড়া করত না হয়। এখনই বিয়ে দিয়ে দেবার কী আছে?' আদিত্য ধমকের স্বরে বলল।

'আমরা বিয়ে দেবার কে স্যার? মেয়ে নিজেই তার বিয়ে ঠিক করেছে। পাড়ারই ছেলে। দুজনে এত বেশি মিশছিল যে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। ভাবলাম বিয়েটা দিয়েই দিই।'

'ছেলে কী করে?'

'আমাদের ওদিকে তৃপ্তি ক্যাটারার বলে একটা ক্যাটারার আছে স্যার। তার মালিক বোসবাবু আমাদের পাড়াতেই থাকেন। তৃপ্তি ক্যাটারারের খুব নামডাক আমাদের ওদিকে। আমার হবু জামাই তৃপ্তি ক্যাটারারের কুক। ও যা বিরিয়ানি বানায় না স্যার, একবার খেলে বারবার খেতে হবে।'

'বয়েস কত ছেলের? মেয়ের সঙ্গে মানাবে তো?' আদিত্য এখনও যেন খবরটা মেনে নিতে পারছে না।

'তিরিশের কাছাকাছি বয়েস হবে স্যার। আর একটু কম হলে হয়তো ভাল হত, কিন্তু মেয়ে নিজে পছন্দ করেছে। আমাদের আর কী বলার আছে? মেয়ে তো এখন সাবালিকা। আমরা আপত্তি করলে আমাদের অমতেই বিয়ে করে নেবে। যাই হোক, আপনাকে আর ম্যাডামকে কিন্তু আসতেই হবে স্যার। আমি বাড়ি গিয়ে পত্তর দিয়ে নেমন্তন্ন করে আসব। এখন শুধু বলে রাখছি। ওই দিনটা কোনও কাজ রাখবেন না যেন।'

'রাখব না, রাখব না। কোনও কাজ রাখব না। তোমার মেয়ের বিয়ে বলে কথা। যেতে তো হবেই। এখন শোনো, যে কারণে তোমাকে ফোন করেছি। আমার একটা কাজ করে দিতে হবে। পারবে? খুব বেশি সময় লাগবে না।'

'নিশ্চয় পারব স্যার। আপনার জন্যে আমি সব সময় হাজির আছি। বলুন কী করতে হবে।'

'জামির লেনের একটা ঠিকানা দিচ্ছি। ফ্ল্যাটবাড়ি। ছটা ফ্লাট আছে। কিছুদিন আগে তিনতলার একটা ফ্ল্যাটে খুন হয়ে গেছে। স্বামী-স্ত্রী থাকত। স্বামী খুন হয়েছে। স্বামীর নাম সৈকত চৌধুরি। স্ত্রীর নাম অনিতা। অনিতার একজন পুরুষ বন্ধু আছে। সে বোধহয় মাঝে মাঝে অনিতার সঙ্গে দেখা করতে আসে। অন্তত আগে আসত। সৈকত খুন হবার পর আসে কিনা জানি না। তোমাকে কোনওভাবে ওই পুরুষ বন্ধুটির সম্বন্ধে জানতে হবে। সে কোথায় যায়, কী করে, অনিতার সঙ্গে তার কতদিনের সম্পর্ক, কতটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক, আমার সবটা জানা দরকার। পারবে তো?'

'পারব স্যার। এটা কোনও ব্যাপারই না। আমার তো এখনও রাত্তিরের ডিউটি। দিনের বেলাটা ঘুমিয়েই কাটে। কটা দিন না হয় না ঘুমিয়ে আপনার কাজটা করে দেব স্যার।'

'ঠিক আছে তুমি তাহলে ঠিকানাটা টুকে নাও।'

'আপনি মুখে বলে দিন স্যার। ও আমার মনে থাকবে। আর ওই ১ মার্চ তারিখটা যেন ভুলবেন না।'

বিমল ফোন রেখে দেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মোবাইলটা আবার বেজে উঠল। এবার অমিতাভ।

'শোন, তোর সঙ্গে একটা খুব জরুরি আলোচনা আছে। কাল দুপুরের দিকে ফ্রি আছিস?'

'কাল দুপুরে? ঠিক আছে। তেমন কোনও কাজ নেই। কিন্তু কী ব্যাপার বলত?'

'আমাকে খুব শিগগির একটা সিরিয়াস ডিসিশন নিতে হবে। স্কুল অফ হিস্টোরিকাল স্টাডিজ আছে নিউ ইয়র্কে, আজকাল ওখানে খুব ভাল কাজ হচ্ছে। ওরা আমাকে একটা চেয়ার অফার করেছে। খুবই প্রেস্টিজিয়াস চেয়ার। অফারটা অ্যাকসেপ্ট করতে গেলে দেশের পাততাড়ি গোটাতে হবে। ওরা বলছে রত্নারও একটা কাজের ব্যবস্থা করে দেবে। এদিকে এখানে আর টিকতে পারছি না। পদে পদে পলিটিকাল ইন্টারফিয়ারেন্স। কোনও রিক্রুটমেন্ট ঠিকঠাক হয় না। সত্যিই হাঁপিয়ে উঠেছি। অ্যামেরিকায় চলে গেলে টুবলুর কেরিয়ার অপশানগুলোও অনেক বেটার হবে মনে হয়। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে সুযোগটা হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। কিন্তু তোর সঙ্গে আলোচনা না করে কোনও ফাইনাল ডিসিশন নিতে পারছি না। তাহলে কাল দুপুরে, ধর একটা নাগাদ, তোর অফিসে চলে যাচ্ছি। ঠিক আছে?'

'এখানকার চাকরি ছেড়ে একেবারে পাকাপাকি চলে যাবি?'

'না, এক্ষুনি চাকরি ছাড়ছি না। ছুটি নিয়ে যাব ভাবছি। নৌকো পুড়িয়ে না যাওয়াই ভাল। ওখানে গিয়ে কেমন লাগবে তো জানি না।'

'বুঝতে পারছি। ঠিক আছে, তুই চলে আয়, তখন কথা হবে।'

আদিত্য মোবাইলটা টেবিলে রেখে চুপ করে বসে রইল। তার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে। অমিতাভ-রত্না তার নিকটতম বন্ধু। তারাও যদি কলকাতা ছেড়ে চলে যায় তাহলে বন্ধু বলতে কে আর রইল?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(১)

শনিবার অমিতাভ আসতে পারল না। সকালে ফোন করে জানাল, একটা কাজ পড়ে গেছে তাই আসতে পারছে না। তার বদলে রবিবার রাত্তিরে যদি আদিত্য আর কেয়া ওদের বাড়িতে ডিনার খেতে যায় তাহলে ওদের খুব ভাল লাগবে। আদিত্যর মনে হল, অমিতাভর হাত থেকে রত্না ফোনটা কেড়ে নিয়েছে। রত্না বলল, 'তুই কেয়াকে দে। আমি ওর সঙ্গে কথা বলব।'

কেয়া বাথরুমে। আদিত্য বলল, 'কেয়া তোকে একটু পরে ফোন করছে।'

একটু পরে কেয়া বাথরুম থেকে বেরোলে আদিত্য তাকে বলল, রবিবার রাত্তিরে অমিতাভ-রত্না তাদের নেমন্তন্ন করতে চাইছে। 'সারাদিন পিকনিক করে সন্ধেবেলা যেতে পারবে? নাকি অন্য কোনও দিন বলব?'

কেয়া কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, 'এমনিতে রবিবারে আমার কোনও অসুবিধে নেই। তুমি পারবে?'

'আমার তো ভালই হবে। অমিতাভর ওখানে গিয়ে গান শুনব।'

'রবিবার হলে আর একটা সুবিধে আছে।' কেয়া আর একটু চিন্তা করে বলল। 'পিকনিকে যাবার জন্যে একটা গাড়ি তো ভাড়া করতেই হচ্ছে। সেটাকে নিয়েই রত্নাদের বাড়ি চলে যাব। অন্য দিন হলে আবার নতুন করে একটা গাড়ি ভাড়া করতে হত।'

আদিত্য ভাবল, কেয়া আজকাল বেশ সংসারী হয়েছে। হস্টেলে থাকা, বেহিসেবি কেয়া আর নেই।

রত্নার সঙ্গে কথা বলে এগারোটা নাগাদ কেয়া বেরিয়ে গেল। আজ তার স্কুল বন্ধ, কিন্তু কোচিং ক্লাস আছে সেই রাত্তির আটটা অবধি। আদিত্যর মনে হল, হাতে তেমন কোনও কাজ তো এখন নেই, এই ফাঁকে অনিতা শর্মা চৌধুরির বাড়িটা একবার ঘুরে এলে হতো। বাড়ির বাসিন্দাদের সঙ্গে একটু কথা বলে দেখা যেতে পারে। একটা কনস্টেবল সঙ্গে থাকলে সুবিধে হত। বাড়ির বাসিন্দারা তাকে আর একটু সিরিয়াসলি নিত। কিন্তু এর জন্যে অচিন্ত্য সাহাকে বলতে আর ইচ্ছে করছে না। সে মোবাইলটা তুলে অনিতা চৌধুরির নম্বরটা লাগাল।

'আপনি কি বাড়ি আছেন? তাহলে একবার যেতাম। আপনার পড়শিদের সঙ্গে কথা বলা দরকার ছিল।'

'আমি বাড়িতেই আছি। কোথায় আর যাব? তবে পড়শিরা সকলে আছে কিনা বলতে পারব না। যেমন শাশ্বতীদিরা ছেলেমেয়েদের নিয়ে কর্তা-গিন্নি সকালে বেরিয়ে গেল। আমার সঙ্গে লিফটে দেখা হয়েছিল। বলল, কাল নাকি পিকনিক আছে তাই ছেলেমেয়েদের মামারবাড়ি রেখে কেনাকাটা করবে। ফিরতে সন্ধে হয়ে যাবে। অন্যরা বাড়ি আছে কিনা বলতে পারব না। তবে রাখিদি অসুস্থ হবার পর থেকে প্রদীপদারা কোথাও যায় না। আর মলয়া বিশ্বাস, সুব্রত বিশ্বাস আপনার সঙ্গে কথা বলবে কিনা বলতে পারব না।'

'ঠিক আছে। আমি একবার চেষ্টা করে তো দেখি কতজনের সঙ্গে কথা বলতে পারি। অন্তত বাড়িটা দেখা হবে। আমি ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছি। হয়তো তার আগেই পৌঁছে যাব।'

'ঠিক আছে, আমি বাড়িতেই আছি।'

শনিবার বলে বোধহয় মেট্রো কম। আদিত্য প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ টিভি দেখল। কিছু চলতি হিন্দি গানের ভিডিও, বাকিটা বিজ্ঞাপন। জামা-জুতোর বিজ্ঞাপন, মুক্তি-আসন্ন সিনেমার বিজ্ঞাপন, চকোলেট-লবেঞ্চুসের বিজ্ঞাপন। আসলে আদিত্য টিভির দিকে তাকিয়েছিল বটে, কিন্তু মন দিয়ে কিছুই দেখছিল না। তার চিন্তাটা সৈকত চৌধুরির খুনের রহস্যে আটকে আছে। সেই একই প্রশ্ন ফিরে ফিরে আসছে। সেই একই

খটকা তার কিছুতেই যাচ্ছে না। ধরা যাক, পুলিশ যেটা ভাবছে সেটাই সত্যি, অর্থাৎ অনিতা চৌধুরিই তার প্রেমিকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে নিজের স্বামীকে খুন করেছে। এবং সে যে বলছে ইনশিয়োরেন্সের ব্যাপারটা সে কিছুই জানত না, সেটা মিথ্যে। ধরা যাক, সে সবই জানত এবং টাকার লোভেই খুনটা করা হয়েছে। এখানেই আদিত্যর বারবার খটকা লাগছে। অনিতা চৌধুরি কি এতই বোকা যে সে আন্দাজ করতে পারবে না ইনশিয়োরেন্স করার পর সৈকত চৌধুরি খুন হলে প্রথম সন্দেহটা বেনিফিশিয়ারির ওপরেই গিয়ে পড়বে? অনিতাকে দেখে খুব বোকা মনে হয়নি। সে এত কাঁচা একটা কাজ করবে, বিশ্বাস করা শক্ত। তাহলে কি ধরে নিতে হবে সৈকত চৌধুরির খুন হবার সঙ্গে তার ইনশিয়োরেন্স কেনার কোনও সম্পর্কই নেই? খুন হওয়া এবং ইনশিয়োরেন্স কেনা দুটো যে এক সঙ্গে ঘটেছে সেটা কাকতালীয়? এতটা কাকতালীয় মেনে নিতে মন চায় না। তারও আগের প্রশ্ন, সৈকত চৌধুরি হঠাৎ পাঁচ কোটি টাকার ইনশিয়োরেন্স করতে গেল কেন? এত টাকার ইনশিয়োরেন্স, ফলে প্রিমিয়ামের অঙ্কটাও তো নেহাত কম ছিল না। সৈকত কি তাহলে খারাপ কিছু আশঙ্কা করছিল? নাকি এর মধ্যে অন্য কিছু রয়েছে?

ঝমঝম করে ট্রেন এসে প্ল্যাটফর্মে ঢুকেছে। মোটামুটি ফাঁকা একটা কামরা আদিত্যর সামনে এসে থামল। বসার জায়গা নেই বটে, কিন্তু উল্টোদিকের দরজা, যেটা শুধু পার্ক স্ট্রিট স্টেশনে খুলবে, তার সামনে আদিত্য দাঁড়াবার জায়গা পেয়ে গেছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ে গেল তার ইস্কুলের বন্ধু সায়ন্তন রায় একদিকে বসে আছে। সায়ন্তন আদিত্যকে দেখতে পায়নি। আদিত্য একবার ভাবল সে নিজের থেকে সায়ন্তনকে দেখা দেবে না। এক একটা সময় এমন আসে যখন কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু সেটা হবার নয়। সায়ন্তন আদিত্যকে দেখতে পেয়েছে। আদিত্য নিজের জায়গা ছেড়ে সায়ন্তনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ইস্কুল পাশ করে সায়ন্তন আর্ট কলেজে পড়েছিল। এখন কার্টুন আঁকে। একটা নামকরা খবর কাগজে চাকরি করে। সেই কাগজে সায়ন্তনের আঁকা কার্টুন মাঝে মাঝেই দেখা যায়। এদের যে পত্র-পত্রিকাগুলো আছে সেখানে গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে সায়ন্তনের ইলাসট্রেশন আদিত্যর চোখে পড়েছে। সায়ন্তন তো কালীঘাটের দিকে থাকত, এদিকে কোথায় চলেছে?

'কোথায় চললি?' সায়ন্তনের গলাটা একটু কাহিল শোনাল।

'বালিগঞ্জের দিকে একটু কাজ আছে। তুই?'

'আমি তো অফিস যাচ্ছি। তুই আছিস কেমন?'

'আমি ভালই আছি। তুই কেমন আছিস? তোর গলাটা শুনে মনে হচ্ছে কিছু একটা হয়েছে।'

'হয়েছিল। টাইফয়েড হয়েছিল। সিপ্রো রেসিস্টেন্ট। জানিস তো সিপ্রো হল টাইফয়েডের খুব কমন একটা ওষুধ। আমাদের দেশের ডাক্তাররা টেস্ট-ফেস্ট না করেই প্রথমে সিপ্রো খাইয়ে দেয়। তো আমার শরীরে যে পোকাগুলো বাসা বেঁধেছিল, ওই যে বীজাণু না জীবাণু কী যেন বলে, তারা আবার সিপ্রোতে মরে না। সিপ্রো খেয়েও যখন আমার জ্বর কমল না, আমাদের ডাক্তারবাবু ভাবলেন আমার টাইফয়েড হয়নি, অন্য কিছু হয়েছে। তিনি নানারকম এক্সপেরিমেন্ট চালালেন। শরীরটা তো তাঁর নয়। কী এসে যায়। শেষে আর এক ডাক্তারের কাছে যেতে অসুখটা ধরা পড়ল। সেরেও গেলাম, তবে সেরে উঠতে অনেক সময় লেগে গেল। এই তিন চারদিন হল অফিস যেতে শুরু করেছি। এখনও খুব দুর্বল।'

'তুই এদিক থেকে অফিস যাচ্ছিস কেন? তুই তো কালীঘাটে থাকতিস?'

'থাকতাম। এখন আর থাকি না। কালীঘাটে আমাদের পৈত্রিক বাড়ি। ভাইরা থাকে। আমি দমদমে নতুন ফ্ল্যাট কিনেছি। অনেকে বলছে, নতুন বাড়ি সবার সহ্য হয় না। তাই এত অসুখে ভুগলাম। হবেও বা। একদিন আয় না আমাদের বাড়ি।'

'যাব, নিশ্চয় একদিন যাব।' সায়ন্তনের পাশে একটা জায়গা খালি হয়েছে। আদিত্য সেখানে বসতে বসতে বলল। 'স্কুলের কারও সঙ্গে যোগাযোগ আছে?'

'খুব বেশি নেই। আমাদের ক্লাসে তো প্রায় সকলেই হয় ইঞ্জিনিয়ার না হয় ডাক্তার আর নয়তো চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়েছে। আমার লাইনে কেউ নেই। তাই যোগাযোগ কারোর সঙ্গেই খুব একটা রাখা হয় না। শুধু স্যমন্তকের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়, আড্ডাও হয়।'

'স্যমন্তক, মানে নাটকের স্যমন্তক? ওর সঙ্গে আমারও যোগাযোগ আছে।'

'জানি। ওর থেকেই তো তোর খবর পাই। তুই তো এখন রীতিমতো বিখ্যাত রে! সেলিব্রিটি! কে জানত আমাদের আদু বড় হয়ে শার্লক হোমস হবে?'

আদিত্যর মনে পড়ে গেল ক্লাস ফাইভ-সিক্সে কোনও কোনও বন্ধু তাকে আদু বলে ডাকত। আদিত্যর এটা ভেবে অস্বস্তি হল যে সায়ন্তন এখনও সেটা মনে রেখেছে। সে তেতো গলায় বলল, 'আর কিছু করে উঠতে পারিনি তাই টিকটিকির কাজ করে পেট চালাই। বড়াই করে বলার মতো কিছু নয়।' তারপর কথা ঘুরিয়ে বলল, 'তোর পুরোনো ফোন নম্বরটাই আছে তো?'

'না, না। ওটা পাল্টেছে। দাঁড়া নতুন নম্বরটা তোকে হোয়াটস অ্যাপ করে দিচ্ছি। এক্ষুনি পাবি না। মেট্রোর ভেতর নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় না। তুই মেট্রোর বাইরে গেলেই মেসেজটা এসে যাবে।' সায়ন্তন পকেট থেকে মোবাইল বার করল। 'তোর আগের নম্বরটাই আছে তো?'

আদিত্য ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। সায়ন্তন বলল, 'তুই যাই বলিস না কেন, মিডিয়ার দৌলতে তোর কীর্তিকলাপ কিন্তু অনেকে জানতে পারছে। বিশেষ করে ওই মন্দাকিনী চৌধুরির কেসটা সলভ করার পর থেকে, জানিস তো তোর একটা ফ্যান ফলোইং তৈরি হয়েছে। আমাদের কাগজে অর্ণব ব্যানার্জী বলে একটি বাচ্চা রিপোর্টার আছে। সে তোর খুব ভক্ত। আমি তোর বন্ধু বলাতে ওর কাছে আমার খাতির বেড়ে গেছে।'

'অর্ণব ব্যানার্জী?' আদিত্য ভুরু কুঁচকে ভাবল। 'নামটা আমি তোদের কাগজে দেখেছি মনে হচ্ছে। ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং খুব ভাল করে। তাই বোধহয় আমার নামটা মনে আছে।'

'তোর ঠিকই মনে আছে। অর্ণব ইজ ওয়ান অফ আওয়ার এইস রিপোর্টারস। বিশেষ করে কিছুদিন আগে ও পশ্চিমবঙ্গে সরকারি প্রকল্পগুলোর স্ক্যাম নিয়ে একটা সিরিজ করেছিল। ওটা খুব নাম করেছে।'

'আমিও ওটা পড়েছি মনে হচ্ছে। সব কটা হয়তো পড়া হয়নি, কিন্তু কয়েকটা ডেফিনিটলি পড়েছি।'

'শোন, আমার স্টেশন এসে পড়েছে।' সায়ন্তন উঠে দাঁড়াল। 'একদিন এক সঙ্গে বসা যাক। অর্ণবকেও ডেকে নেব। ও তোর সঙ্গে খুব আলাপ করতে চায়। তুই এখনও বিয়ার-টিয়ার খাস তো?'

'খাই মাঝে মধ্যে। ওই সোশাল ড্রিংকিং আর কী। কিন্তু তোর যা শরীরের অবস্থা তাতে মনে হচ্ছে কিছুদিন মদ্যপানটা তোর স্থগিত রাখাই ভাল।'

'আরে না, না। আমার নতুন ডাক্তার এইসব ব্যাপারে খুব লিবারাল। বলেছে, আর সপ্তাহ খানেক গেলে একটু-আধটু খেতে পারি। চলি রে। ফোন করব।' সায়ন্তন দরজার দিকে এগোতে এগোতে বলল।

বাড়ির নাম স্বাগতম। হলুদ-সবুজ চারতলা বাড়ি। আদিত্যর রুচিতে রংটা ক্যাটক্যাটে লাগছে, অন্য কেউ হয়তো ঝলমলে বলবে। একতলায় গাড়ি রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। দোতলা থেকে ফ্ল্যাট শুরু। মূল ফটক পেরিয়ে ড্রাইভওয়ে, তারপর বাড়ি। বাড়ির ভেতরে ঢুকলে ওপরে ওঠার লিফট। ফটকে উর্দিপরা সিকিউরিটি বসে আছে। 'কোথায় যাবেন?' জিজ্ঞেস করাতে আদিত্য বলল, 'মলয়া বিশ্বাস, সুব্রত বিশ্বাসদের বাড়ি।' আদিত্য শুনেছিল এই বাড়িতে এখনও ইন্টারকম বসেনি। তাই সাহস করে নাম দুটো বলে দিল। সিকিউরিটি ফোন করে চেক করতে পারবে না।

'খাতায় নাম লিখতে হবে। তার নীচে ঠিকানা। পাশের খোপে যে ফ্ল্যাটে যাবেন তার নম্বরটা লিখবেন।' সিকিউরিটি ভারিক্কি গলায় জানাল। 'বিশ্বাসদের ফ্ল্যাট নম্বর টু বি। লিফট থেকে নেমে ডান দিকে। সিঁড়ি দিয়েও উঠে যেতে পারেন। দোতলায়।'

দোতলায় উঠে আদিত্য দেখল দুই প্রান্তে দুটি ফ্ল্যাট। ডানদিকেরটিতে কালো কাঠের দরজা, তার গায়ে তামার ফলকে ইংরেজিতে লেখা 'বিশ্বাস'। তার ঠিক নীচে লেখা টু বি। বাঁদিকের ফ্ল্যাটের দরজা কাঠ রঙের, সেখানে কোনও নাম-টাম লেখা নেই। শুধু টু এ লেখা আছে। আদিত্য কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে বিশ্বাসদের ফ্ল্যাটে বেল বাজাল। সংক্ষিপ্ত ঘণ্টাধ্বনির পর যে মহিলা দরজা খুললেন তাকে কেউ কেউ হয়ত সুন্দরীই বলবে। লম্বা-চওড়া চেহারা। ফরসা রং, তীকষ্ন নাক, বড় বড় চোখ, কিন্তু সব মিলিয়ে লাবণ্যের প্রবল অভাব।

আদিত্যকে দেখে ভদ্রমহিলা ভুরু তুললেন। সেই অভিব্যক্তিতে প্রশ্ন ছাড়াও বিরক্তি এবং তাচ্ছিল্য ফুটে উঠল।

'নমস্কার। আমার নাম আদিত্য মজুমদার। আমি সৈকত চৌধুরির কেসটা ইনভেস্টিগেট করছি। আপনাদের দু-একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'পুলিশ কিন্তু অনেকবার এসে আমাদের বিরক্ত করেছে। আপনি কে? আপনি কি পুলিশ?'

'না আমি পুলিশ নই। আমি একজন বেসরকারি গোয়েন্দা। তবে পুলিশের সঙ্গেই কাজ করে থাকি। এই কেসটাতে অবশ্য অনিতা চৌধুরি আমাকে নিয়োগ করেছেন।'

'অনিতা চৌধুরি? তার লোককে আমরা বাড়িতে ঢোকাব কেন? গোল্লায় যাওয়া একটি মেয়েছেলে। আপনি যান, এখানে আপনার কিছু সুবিধে হবে না।' ভদ্রমহিলা মুখের এমন একটা ভাব করলেন যেন ভিখারি তাড়াচ্ছেন। 'বেসরকারি গোয়েন্দা না হাতি। যত সব উটকো লোক দুপুরে এসে ঝামেলা করছে। সিকিউরিটি একে ঢুকতে দিয়েছে কেন?' ভদ্রমহিলা আদিত্যকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন।

আদিত্য আধখোলা দরজা দিয়ে দেখেছিল একজন কালো লম্বা লোক ভদ্রমহিলার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। নিশ্চয় গৃহকর্তা। তার মুখটা আদিত্যর খুব হালকাভাবে চেনা মনে হল।

'ওঁকে ঢুকতে দাও। আমি চিনি ওঁকে। আমাদের ব্যাঙ্কের একটা ফ্রড কেসে উনি খুব সাহায্য করেছিলেন। আদিত্যবাবু আপনি ভিতরে আসুন। আমার স্ত্রীর কথায় কিছু মনে করবেন না। আমি তো সারা সপ্তাহ এখানে থাকি না, আমার স্ত্রীকে মেয়ে নিয়ে একা থাকতে হয়। তার ওপর আমাদের ঠিক ওপরের ফ্ল্যাটে এই কাণ্ড। সব মিলিয়ে উনি একটু ওভার সেন্সিটিভ হয়ে পড়েছেন।' গৃহকর্তার গলার আওয়াজটা গমগমে।

আদিত্য নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাল। ভাগ্যিস এই লোকটা তাকে চিনতে পেরেছে। সে-ও এখন লোকটাকে মনে করতে পারছে। কিছুদিন আগে একটা ব্যাঙ্ক জালিয়াতির কেসে লোকটার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। অনেক অফিসারের মধ্যে এ-ও ছিল। চেনা না বেরোলে ফিরে যেতে হত। পুলিশ নিয়ে আবার আসতে হত। অনেকটা খাটনি বেঁচে গেল।

মলয়া বিশ্বাস নিজের মনে গজগজ করতে করতে বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেছে। আদিত্য সোফার একধারে বসল।

'আমার প্রশ্নগুলো কিন্তু আমি আপনার স্ত্রীকেই করব। আপনি তো এখানে থাকেন না, আপনার পক্ষে প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা সম্ভব নয়। আপনি কি আপনার স্ত্রীকে একবার রাজি করাতে পারবেন? আমি বেশি সময় নেব না। আপনি বলুন যে আমি অনিতা চৌধুরিকে বাঁচাতে আসিনি, সত্যটা জানতে এসেছি মাত্র। কেবল দুটো প্রশ্ন আমি করব। একটু দেখুন না, যদি একবার আসার জন্য আপনার স্ত্রীকে রাজি করাতে পারেন।' আদিত্যর গলায় অনুনয়।

'নিশ্চয় উনি আসবেন এবং আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবেন।' সুব্রত বিশ্বাস জোর দিয়ে বলল। 'আপনি একটু বসুন।

মিনিট পাঁচেক আদিত্য বসে আছে। এর মধ্যে একটি বছর দশেকের বালিকা পর্দার আড়াল থেকে তাকে বিস্ময়াবিষ্ট চোখে নিরিক্ষণ করে গেছে। যেন ভিনগ্রহের কোনও প্রাণীকে দেখছে। আদিত্য হাত নেড়ে তাকে কাছে আসতে বলার সঙ্গে সঙ্গে সে অন্দরমহলে গা ঢাকা দিল।

অবশেষে বাড়ির ভেতর থেকে সস্ত্রীক বেরিয়ে এলেন সুব্রত বিশ্বাস। তিনি তাঁর স্ত্রীকে কী বুঝিয়েছেন আদিত্য জানে না, কিন্তু মলয়া বিশ্বাসের হাবভাবে একটা পরিষ্কার পরিবর্তন হয়েছে। তিনি আদিত্যর দিকে তাকিয়ে একবার হাসির চেষ্টা করলেন। প্রত্যুত্তরে আদিত্যও মুখে একটা হাসির ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল। আদিত্য খেয়াল করল ভদ্রমহিলা তাঁর বাড়ির পোশাকটা পাল্টে একটা শাড়ি পরে এসেছেন। যতদূর মনে হয়, ঠোঁটেও হালকা রং মেখে এসেছেন। ব্যাঙ্ক জালিয়াত ধরার সময় আদিত্যকে যে সুব্রত বিশ্বাসের অন্তত চার-পাঁচ ধাপ ওপরের অফিসারদের সঙ্গে কাজ করতে হত, এটা বোধহয় মলয়া বিশ্বাস জানতে পেরেছেন।

'আপনার সময় বেশি নষ্ট করব না। মাত্র দুটো প্রশ্ন করব আপনাকে। আমি চাইব আপনি কোনও ব্যক্তির কথা না ভেবে, যেটা আপনার সত্যি মনে হয়, সেটা বলবেন। আমি কিন্তু কাউকে প্রোটেক্ট করতে আসিনি। শুধু সত্যিটা জানতে এসেছি।' আদিত্য মলয়া বিশ্বাসের দিকে তাকিয়ে বলল।

'হ্যাঁ বলুন, কী জানতে চান।' মলয়ার গলা শুনে মনে হয় একটা বনবিড়ালকে কেউ পোষ মানিয়েছে।

'আমার প্রথম প্রশ্ন, সৈকত চৌধুরি যখন বাড়িতে থাকতেন না তখন অনিতা চৌধুরির কাছে নিয়মিত কি তার কোনও পুরুষ বন্ধু আসত?'

প্রশ্নের আকস্মিকতায় বোধহয় মলয়া একটু থতমত খেয়ে গেছে। সে প্রথমে তার স্বামীর দিকে তাকাল। যেন সত্যিটা বলার জন্যে স্বামীর অনুমতি চাইছে।

'আমি আবার বলছি ম্যাডাম, আপনি খোলা মনে যেটা সত্যি মনে হয় সেটা বলুন। কারোর প্রতি আপনাকে পক্ষপাতিত্ব দেখাতে বলছি না। আবার অকারণ বিদ্বেষ দেখাতেও বলছি না।'

'আপনি যখন বারবার সত্যিটা জানতে চাইছেন তখন খোলাখুলি বলছি। সৈকত চৌধুরি লোকটা মোটেই খারাপ ছিল না। কিন্তু তার বউটা একটা নষ্ট মেয়েছেলে, এক নম্বরের ভিজে বেড়াল। আপনি ওপর থেকে দেখে কিছু বুঝতে পারবেন না। কিন্তু দিন কয়েক দেখলেই বুঝে যাবেন। কথাটা খোলাখুলি বললাম কারণ আপনি সত্যিটা জানতে চেয়েছেন।'

'ব্যাপারটা আর একটু খুলে বলবেন?'

'দেখুন, খুলে বলার খুব বেশি কিছু নেই। দুপুরবেলা সৈকতবাবু যখন বাড়ি থাকতেন না তখন অনিতার এক বয় ফ্রেন্ড নিয়মিত তার সঙ্গে দেখা করতে আসত। আমি বারান্দা থেকে তাকে অনেকবার আসতে দেখেছি। যেতেও দেখেছি। বেলা একটা-দুটোর সময় সে আসত আর পাঁচটা বাজার আগে চলে যেত। আপনি সিকিউরিটিকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন। ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে অনিতা তার বয় ফ্রেন্ডের সঙ্গে ঠিক কী করত আমি বলতে পারব না।'

'কতদিন থেকে এই বয় ফ্রেন্ড আসছে?'

'তা ধরুন ছ-সাত মাস হবে। এটা অবশ্য আমি আন্দাজে বলছি।'

'আপনাদের ফ্ল্যাটের আর কেউ কি তাকে দেখেছে?'

'বলতে পারব না। আমি কাউকে জিজ্ঞেস করিনি। তবে রাস্তার দিকে বারান্দা আমাদের আর সৈকত চৌধুরিদের। আর আগে যারা এই জায়গাটার মালিক ছিল তাদের চারতলার একটা ফ্ল্যাট থেকেও রাস্তা দেখা

যায়। কিন্তু সেই ফ্ল্যাটটা বন্ধই পড়ে থাকে। ফলে অন্য যে দুটো ফ্ল্যাট আছে সেখান থেকে দেখাই যায় না বাইরের কে বাড়িতে ঢুকছে বেরোচ্ছে। তবে সিকিউরিটি ছেলেটা সব জানে।'

'আপনি কী করে জানলেন যে লোকটি নিয়মিত আসছে সে অনিতা চৌধুরির ফ্ল্যাটেই আসছে? অন্য কোনও ফ্ল্যাটেও তো সে যেতে পারে?'

'সিকিউরিটি ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করে জেনেছি। আপনি আমাকে খোলাখুলি কথা বলতে বলেছেন বলে বলছি, আমার বারান্দা থেকে অনিতার বয় ফ্রেন্ডের কয়েকটা ছবি তুলে আমি সৈকতবাবুকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তাঁকে জানিয়েছিলাম এই লোকটা রোজ দুপুরে আপনার বউ-এর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে আসে। বাড়ির মধ্যে এই বেলেল্লাপনা আমার অসহ্য লাগছিল।'

'সৈকতবাবুর কী রিঅ্যাকশান হয়েছিল জানেন?'

'জানি না। ওর দিক থেকে কোনও উত্তর পাইনি। তবে আমাদের যে কাজের লোক আছে সে সৈকতবাবুদের বাড়িতেও কাজ করে। সে আমাকে বলেছে সৈকতবাবু খুন হবার বেশ কয়েক মাস আগে থেকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথাবার্তা ছিল না। এটা আমার ছবি পাঠানোর ফল কিনা বলতে পারব না।'

'আচ্ছা আপনি যে ছবিগুলো পাঠিয়েছিলেন তার কপি আমাকে দিতে পারেন?'

'নিশ্চয় পারি। ইনশিয়োরেন্স কোম্পানি থেকে যে ভদ্রলোক এসেছিলেন, বিপ্লব সমাদ্দার না কী যেন নাম, বললেন আগে পুলিশে কাজ করতেন, তাকেও তো ছবিগুলো দিয়েছি। আপনার হোয়াটস অ্যাপ নম্বরটা বলুন, পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

ছবি পাবার পর আদিত্য উঠতে যাচ্ছিল। হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে বলল, 'আপনাকে দ্বিতীয় প্রশ্নটা তো করাই হল না। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, ঘটনার দিন, অর্থাৎ সৈকতবাবু যেদিন খুন হন সেদিন, আপনি কি সন্দেহজনক কিছু দেখেছিলেন?'

'না আমি কিছু দেখিনি। আমার স্বামী সেদিন বাড়ি ছিলেন না। সারা দুপুর এবং বিকেল আমি ঘুমিয়েছিলাম। পাশের বাড়ির প্রদীপবাবু বেল বাজাতে ঘুম ভাঙল। দরজা খুলে দেখি এই ব্যাপার।'

'আপনার মেয়ে কোথায় ছিল?'

'আমার মেয়ে কোচিং ক্লাসে গিয়েছিল। শনিবার ওর পরপর চারটে কোচিং ক্লাশ থাকে। আমার ড্রাইভার যখন ওকে নিয়ে ফিরল তখন বাড়িতে পুলিশ এসে গেছে।'

'আর একটা প্রশ্ন করব?' আদিত্য উঠতে উঠতে বলল। 'এটা অবশ্য প্রথম প্রশ্নটার সঙ্গেই কানেকটেড। সৈকতবাবু খুন হবার পরেও কি আপনি অনিতার বয় ফ্রেন্ডকে এই বাড়িতে আসতে দেখেছেন?'

'দেখেছি। এখনও মাঝে মধ্যেই লোকটা আসে। পরশু দিনও তো লোকটাকে আসতে দেখলাম।'

'আমার আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই। আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।'

মলয়া বিশ্বাসের স্বামীর সঙ্গে কয়েকটা কুশল প্রশ্ন বিনিময় করে আদিত্য টু বি ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এল। সামনেই টু এ ফ্ল্যাট। কিন্তু এখানে অনিতাকে সঙ্গে করে আসাই ভাল। তার আগে একটা দরকারি কাজ সারতে হবে। এখানকার নিয়ম, ভিজিটারদের খাতায় নাম ঠিকানা লিখতে হবে। হয়তো সিকিউরিটির কাছে গেলে অনিতার বয় ফ্রেন্ডের নাম ঠিকানা পাওয়া যেতে পারে।

(২)

'১৯৬৮ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে ঢুকেছিলাম। ১৯৭১-এ পাশ করে বেরোনোর কথা ছিল। সেটা আর হয়ে ওঠেনি। রাজনীতির ভূত মাথায় চাপল। সশস্ত্র বিপ্লব করতে গ্রামে চলে গেলাম। ফিরলাম ছবছর জেলখানায়

কাটিয়ে, ১৯৭৭ সালে। ঝাড়গ্রাম কলেজ থেকে বি এসসিটা পাশ করলাম। ঝাড়গ্রামের কাছেই আমাদের আদি বাড়ি।'

প্রদীপ চক্রবর্তী কথা বলেন নিচু গলায়, থেমে থেমে। কথা বলার ঢঙটা তাঁর চেহারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। শ্যামবর্ণ, পক্ককেশ, দীর্ঘদেহী, কৃশতনু পুরুষ। চশমায় ঢাকা শান্ত এক জোড়া চোখে কোনও অনিশ্চয়তা নেই, কোনও উত্তেজনার লেশ মাত্র নেই। যেন পৃথিবীর সব সংশয়, সব দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয়ে গেছে।

'আমি আপনার আড়াই দশক পরবর্তী। আপনারা যখন কলেজে ঢুকছেন তখনও আমাদের জন্ম হয়নি। তবে আমরা কলেজে ঢুকে প্রেসিডেন্সির সেই উত্তাল দিনগুলোর গল্প অনেক শুনেছি। রাজনীতির সঙ্গে আপনার আর কি কোনও যোগ আছে?' আদিত্য খেয়াল করল, প্রদীপ চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তার নিজের ভাষাও কিছুটা শুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। লোকটা ব্যক্তিত্ববান, সন্দেহ নেই।

'মনে মনে যোগ আছে। বাহ্যত নেই। টিভি খুব একটা দেখা হয় না। তবে নিয়মিত খবর কাগজ পড়ি। আজকাল ইন্টারনেটের দৌলতে দেশ-বিদেশের চার-পাঁচটা খবর কাগজ তো অনায়াসেই পড়ে ফেলা যায়। হাতে সময়ও অঢেল। বছর পাঁচেক হল অবসর নিয়েছি।'

'কী পড়েন খবর কাগজে?' আদিত্য খেই ধরিয়ে দেবার মতো করে জিজ্ঞেস করল।

'দেশ-বিদেশের খবর পড়ি। মনে হয় পৃথিবীটা খুব একটা বদলালো না। সেই একই রকম দারিদ্র্য, সেই অন্যায়, সেই অসাম্য। মানুষের দুঃখ-কষ্ট আগের মতোই আছে। তাই আমার রাজনৈতিক বিশ্বাসটাও বিন্দুমাত্র বদলায়নি।'

'আপনারা তো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটাকেই তুলে দিতে চেয়েছিলেন?' আদিত্য ইচ্ছে করে প্রদীপ চক্রবর্তীকে উত্তেজিত করে দিতে চাইছে।

'গণতন্ত্র? গণতন্ত্র আমাদের কী দিয়েছে? গণতন্ত্র তো বড়লোকদের জন্যে। আমি তো বলব, ডেমক্রেসি ইজ অফ দ্য রিচ, বাই দ্য রিচ, ফর দ্য রিচ। গণতন্ত্র কখনও গরিবদের হয়ে কাজ করে না।' প্রদীপ চক্রবর্তী থেমে থেমে জোর দিয়ে দিয়ে বললেন।

'একটা কথা তো ঠিক। বাজারে যেমন গরিবদের থেকে বড়লোকদের দাপট বেশি, কারণ বেশি টাকা দিয়ে বাজারের সব কিছু বড়লোকরা কিনে নিতে পারে, গণতন্ত্রে কিন্তু তা নয়। সেখানে গরিব-বড়লোক সকলেরই একটা করে ভোট। এটাকে আপনি সাম্য বলবেন না?' আদিত্যকেও তর্ক পেয়ে বসেছে।

'ওপর ওপর ওই সাম্যটা আছে। কিন্তু ওটা একটা মানুষ ঠকানো ব্যাপার। তলায় তলায় টাকার খেলা চলে। একটা ইলেকশান লড়তে গেলে কোটি কোটি টাকা খরচ করতে হয়। বড়লোক ব্যবসায়ীরা ইলেকশন ফান্ড করে নিজেদের স্বার্থে। ইলেকশন হয়ে গেলে তারা সরকারের কাছ থেকে নানারকম সুযোগ সুবিধে আদায় করে নেয়। সেই সুযোগ সুবিধেগুলো গরিবদের স্বার্থ বিরোধী।' আদিত্য লক্ষ করল কথা বলতে গিয়ে প্রদীপ চক্রবর্তীর গলাটা একবারের জন্যেও চড়ছে না।

'কিন্তু গণতন্ত্রের যে বিকল্পটার কথা আপনারা বলেন, সশস্ত্র বিপ্লব বা ওই ধরনের একটা কিছু, সেটাতে তো বহু নিরীহ মানুষ মারা পড়ে। সেটাকে আপনি কী ভাবে জাস্টিফাই করবেন? এন্ড দিয়ে কি মিনস জাস্টিফাই করা যায়?'

'অবশ্যই যায়। অবশ্যই যায়। উদ্দেশ্যটা যদি মহৎ হয় তাহলে সেটাকে হাসিল করতে গিয়ে দু-একটা অনৈতিক কাজ করাটা আমি অন্যায় মনে করি না। এই যে ধরুন আমি, মনে প্রাণে কর্পোরেটদের বিরোধী, সারা কর্মজীবন একটা কর্পোরেটেই চাকরি করে গেলাম। পেট চালানোর জন্যে এটা আমাকে করতে হয়েছে। এতে আমার বিবেকের সায় ছিল না, কিন্তু মানুষের জীবনে বেঁচে থাকাটা যে আরও ফান্ডামেন্টাল একটা লক্ষ্য সেটা তো স্বীকার করবেন। এই লক্ষ্য বা এন্ডটা অ্যাচিভ করতে গিয়ে আমাকে বিবেক-বিরুদ্ধ একটা মিনস নিতে হয়েছে।'

'কিন্তু এটা তো মানবেন, জীবিকার জন্য বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করা আর বিপ্লবের নামে পাইকারি হারে মানুষ মারার মধ্যে একটা বড় তফাত আছে?' আদিত্য খানিকটা উত্তেজিত হয়ে বলল।

'বিপ্লবের সঙ্গে অগণিত পিছিয়ে পড়া মানুষের স্বার্থ জড়িত। তার জন্য যদি দু-একজন ব্যক্তি মারা যায়, যারা বিপ্লবের শত্রু, তাতে আমি কোনও দোষ দেখি না। কারণটা যদি জোরালো হয়, তাহলে আমার মতে, একজন ব্যক্তিমানুষের জীবনের আলাদা করে তেমন দাম নেই। আমি এই অব্জেক্টিভিটিতে এখনও বিশ্বাস করি।'

প্রদীপ চক্রবর্তীর স্ত্রী রাখি চক্রবর্তী চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকেছেন। তিনি ঘরে ঢুকে অনিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুই এখানে বসে কী করছিস? এইসব ইন্টেলেকচুয়াল আলোচনার মধ্যে বসে থেকে বোর হচ্ছিস নিশ্চয়।' তারপর স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা যদি তোমাদের কথাবার্তাটা একটু আমাদের লেভেলে নামিয়ে আনতে পার, তাহলে আমরাও এখানে তোমাদের সঙ্গে বসে চা খেতে পারি।'

আদিত্য লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল। সে কুণ্ঠিতভাবে বলল, 'দোষটা আমারই। আমিই মনে হয় প্রদীপবাবুকে উত্তেজিত করে দিয়েছিলাম।'

'উত্তেজিত হবার লোক আমার স্বামী নয়। আসলে ও এসব নিয়ে খুব ভাবে। কথা বলতেও ভালবাসে, কিন্তু বলার লোক পায় না। দেখছেন না আপনাকে পেয়ে ওর মুখটা কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।' রাখি স্বামীর দিকে তাকিয়ে হাসলেন। আদিত্যর মনে হল, রাখি চক্রবর্তীর চেহারাটা একটু কাঠ কাঠ হলেও মানুষটা খাঁটি।

'আমি যা নিয়ে কথা বলতে এসেছিলাম সেটা কিন্তু শুরুই করা হয়নি।' আদিত্য সুযোগ পেয়ে বলল। 'আমি সৈকত চৌধুরি সম্বন্ধে একটু জানতে এসেছিলাম।'

'খুব ভাল ছেলে ছিল সৈকত। খুব পরোপকারী ছিল। এত ভাল ছেলেটাকে কে যে এভাবে মারতে পারে আমার মাথায় আসে না।' রাখি চক্রবর্তীকে হঠাৎ খুব বিষণ্ণ দেখাল।

'ঘটনার দিন আপনারা কোথায় ছিলেন?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'সেই সময় আমি একটু অসুস্থ ছিলাম। ঘুমোচ্ছিলাম। তার আগের দিন একটা কেমো নিয়ে হাসপাতাল থেকে ফিরেছিলাম। অনিতা আপনাকে বলেছে কিনা জানি না, আমি একজন ক্যান্সার ফাইটার। কিছুদিন ধরে কেমো চলছে। কেমো নেবার পরের কয়েক দিন শরীরটা এমন খারাপ হয়ে যায় যে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারি না। সেদিনও সেই রকম শরীর খারাপ ছিল। প্রদীপ জেগে ছিল। কিন্তু আমাকে আর জাগায়নি। পরের দিন সকালবেলা খবরটা দিল।' রাখি চক্রবর্তীর গলাটা স্বাভাবিকই মনে হল।

'রাখি ঠিক বলেছে। ঘটনার সময় রাখি ঘুমিয়েছিল। ওকে অনেকটা সিডেটিভ দেওয়া হয়েছিল। আমি জেগেই ছিলাম। বারান্দায় বসে বই পড়ছিলাম। দুপুরে ঘুমোনো আমার অভ্যেস নেই। আমাদের বারান্দা থেকে রাস্তা দেখা যায় না, কিন্তু একতলা ওপরে সৈকতদের বারান্দার খানিকটা দেখা যায়। বিকেল নাগাদ একটা হালকা শব্দ শুনলাম। টায়ার ফাটার মতো একটা শব্দ। একবার হয়তো বই বন্ধ করে রাস্তার দিকে তাকিয়েছিলাম। তারপর আর ব্যাপারটাকে আমল দিইনি। তবে শব্দ যে একটা শুনেছিলাম তাতে সন্দেহ নেই। অনেক পরে, তখন সন্ধে নেমে গেছে, আমি বারান্দার আলো জ্বেলে দিয়েছি, রাখি তখনও ঘুমিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ দরজায় দুমদুম শব্দ। কলিং বেল নয়, কেউ প্রাণপণে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। খুলে দেখি অনিতা। উদভ্রান্ত চেহারা। সঙ্গে শাশ্বতী শাসমল। অনিতার কাছে সব শুনে ইন্টারনেট থেকে গড়িয়াহাট থানার ফোন নম্বরটা খুঁজে বার করে আমিই পুলিশকে ফোন করি।'

'আপনি ছাড়া আর কেউ কি টায়ার ফাটার শব্দটা শুনেছিল?'

'সিকিউরিটি বলছে সে শুনেছিল। কিন্তু ব্যাপারটা তখন সে ঠিক বুঝতে পারেনি।'

'আচ্ছা, একটা কথা বলুন। আপনার কি মনে হয় বাইরে থেকে কেউ এসে সৈকতকে খুন করে থাকতে পারে? সিকিউরিটি কিন্তু জোর দিয়ে বলছে সেদিন দুপুরে কিংবা বিকেলে বাইরে থেকে কেউ বাড়িতে ঢোকেনি।'

'আমার মনে হয় সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সিকিউরিটি যতই বলুক, মনে রাখতে হবে সে গরিব মানুষ। তাকে দু-চার পয়সা ঘুষ দিয়ে মিথ্যে বলিয়ে নেওয়াটা শক্ত নয়। তাছাড়া আমাদের বাড়িতে রাত আটটা নাগাদ সিকিউরিটি বদল হয়। আগের রাত্তিরে সেই সময় সকলের চোখ এড়িয়ে বাইরের কেউ ঢুকে পড়তেই পারে। ঢুকে পড়ে সে অনায়াসে ছাতে রাত্তিরটা কাটিয়ে দিতে পারে। তারপর কাজ হয়ে যাবার পর গণ্ডগোলের সুযোগ নিয়ে টুক করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে পারে। আমি দেখেছি, ছাদের দরজাটা সব সময় তালা বন্ধ থাকে না। কেবলওলারা তো সারাক্ষণ ছাদে উঠে অ্যান্টেনা ঠিক করছে। তারাই দরজাটা খোলা রেখে দেয়।'

'বুঝতে পারছি। সব সম্ভাবনাই খোলা আছে।' আদিত্যকে চিন্তান্বিত দেখাল।

'কিন্তু প্রদীপদা গুলির শব্দটা শোনার অনেক পরে যে আমি বাড়ি ফিরেছি সেটা তো সিকিউরিটি বলছে। তাহলে এটাই কি প্রমাণ হয় না যে আমি সৈকতকে মারিনি?' এতক্ষণে অনিতার গলা শোনা গেল। কথাগুলো বলতে বলতে তার স্বর কান্নায় বুজে এসেছে।

'ইনশিয়োরেন্স কোম্পানি বলবে আপনি যে টাকার লোভে লোক লাগিয়ে আপনার স্বামীকে খুন করাননি তার কী প্রমাণ?' আদিত্য খানিকটা ইতস্তত করে বলল।

রাখি চক্রবর্তী বললেন, 'যে জিনিসটা আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না সেটা হল এত লোক থাকতে সৈকতকে কেন কেউ খুন করতে চাইবে? জীবনে আমি অনেক ধরনের মানুষ দেখেছি। ভাল, খারাপ, খুব খারাপ। এত খারাপ মানুষও দেখেছি যাকে খুন করলে পাপের বদলে পুণ্য হয়। কিন্তু সৈকত ছিল এমন একজন মানুষ যে সাধারণ ভাল-খারাপের ঊর্ধ্বে। এক কথায় বলতে গেলে, ওরকম অদ্ভুত মানুষ আমি আমার সত্তর বছরের জীবনে আর একটিও দেখিনি। আমি কিন্তু একটুও বাড়িয়ে বলছি না। আশ্চর্য মাত্রায় উদারহৃদয়, বিবেকসম্পন্ন অথচ ন্যায়বিচারের ব্যাপারে একেবারে নির্দয়, আপোশহীন।'

আদিত্য উদগ্রীব হয়ে শুনছিল। সৈকতবাবুর চরিত্রের এইসব অদ্ভুত দিকগুলোর দু'একটা উদাহরণ দিতে পারবেন?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

রাখি কিছু বলার আগেই অনিতা বলে উঠল, 'রাখিদি একদম ঠিক বলেছে। একটা ঘটনা তো এই কিছুদিন আগেই ঘটেছিল। সেটা বললেই সৈকত কেমন ছিল খানিকটা বুঝতে পারবেন।

'মাস ছয়-সাত আগেকার কথা হবে। আমি আর সৈকত রাত্তিরবেলা একটা পার্টি থেকে ফিরছিলাম। সৈকতদের অফিসের পার্টি। সৈকত গাড়ি চালাচ্ছিল। আমরা প্রায় বাড়ি পৌঁছে গিয়েছিলাম। আপনি খেয়াল করেছেন কিনা জানি না, আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ডানদিকে একটু গেলেই একটা বড় বস্তি আছে। বস্তির সামনে দিয়ে আসার সময় একটা লোক আমাদের গাড়ির সামনে পড়ল। একদম ড্রাঙ্ক। লোকটা বস্তিতেই থাকে, আমাদের মুখচেনা। সৈকত অতি কষ্টে ব্রেক করে গাড়িটা থামাল। মনে হল গাড়ির সঙ্গে লোকটার ধাক্কা লাগেনি, শুধু বাইরের আয়নায় ধাক্কা লেগে লোকটা মাটিতে পড়ে গেছে।

'ইতিমধ্যে আমাদের গাড়ির চারদিকে বেশ ভিড় জমে গেছে। সবই ওই বস্তির লোক। এরা সৈকতকে খুব ভাল করে চেনে। খুব ভালও বাসে। সৈকত বিপদে আপদে অনেকবার ওদের পাশে দাঁড়িয়েছে। ওরা বলল, দাদা আপনি চলে যান। আমরা একে দেখছি। আমরা জানি আপনার কোনও দোষ নেই। এই লালু রোজ রাত্তিরে মদ খেয়ে ঝামেলা করে। আগেও একবার গাড়ি, আর একবার বাইকের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়েছে।

সৈকত অবশ্য শোনার লোক নয়। সে গাড়ি থেকে নেমে লালুকে ধরে ধরে একটা ওষুধের দোকানে নিয়ে গেল। এটিএস নেয়াল। পেন কিলার কিনে দিয়ে বলল, যদি এতে ব্যথা না কমে তা হলে যেন সে সৈকতকে

খবর দেয়। আমার মনে হচ্ছিল লোকটার কিছুই হয়নি। তার পা যেটুকু কাঁপছে সেটা অ্যাক্সিডেন্টের জন্যে নয়, নেশা করেছে বলে। কিন্তু সৈকতকে সেটা বিশ্বাস করানো অসম্ভব।

'রাত্তিরে সৈকত কিছুতেই ঘুমোতে পারে না। মুখে একটাই কথা। আর আমি কোনও দিন গাড়ি চালাব না। আমি একটা লোককে ধাক্কা দিয়ে দিলাম! লোকটা তো মরে যেতে পারত! আমার গাড়ি চালানোর কোনও অধিকার নেই! কিছুতেই ওকে বোঝাতে পারি না দোষটা ওর নয়, সেই লোকটার।

'পরদিন সকালে আমাদের ফ্ল্যাটে একটা চোদ্দো-পনেরো বছরের ছেলে এসে হাজির। ছেলেটার মুখটা খুব দুঃখী। বলল, সে লালুর ছেলে, নাম মোতি। বলল, তার বাবা সারারাত যন্ত্রণায় ঘুমোতে পারেনি। আজ ডাক্তার দেখাতে যাবে। কিন্তু ডাক্তার দেখানোর খরচ তাদের বাড়িতে নেই। তাছাড়া কাজে যেতে পারবে না বলে বাবা আজ মজুরিও পাবে না। জানতে পারলাম লালু রঙের মিস্ত্রি, বাড়ি রং করে।

'ছেলেটার কথা শুনে সৈকত সঙ্গে সঙ্গে ওয়ালেট থেকে একটা দু-হাজার টাকার নোট বার করে তার হাতে দিয়ে দিল। আমার মনে হচ্ছিল ছেলেটা সত্যি বলছে কিনা একবার যাচাই করে দেখা দরকার। সৈকতকে বললামও সে কথা। কিন্তু সৈকত আমাকে পাত্তাই দিল না। এর পর প্রায় এক মাস নিয়মিত ছেলেটা আসত, তার বাবার চিকিৎসার জন্যে টাকা নিত। তার বাবার অবস্থার নাকি কিছুতেই উন্নতি হচ্ছে না। সব মিলিয়ে, আমার ধারণা, তিরিশ-চল্লিশ হাজার টাকা সৈকত ছেলেটাকে দিয়েছিল। বলতে ভুলে গেছি, এর মধ্যে সৈকত একদিনও গাড়ি চালায়নি।

'তারপর একদিন সন্ধেবেলা মাধব সিং আমাদের ফ্ল্যাটে এসে হাজির। মাধব ওই বস্তির মাতব্বর, বস্তির সকলে তার কথা খুব মেনে চলে। মাধব আবার সৈকতকে খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করত। মাধব এসে অনেক কথা বলে গেল। মোদ্দা কথাটা হল, সে গতকালই জানতে পেরেছে সৈকতকে ঠকিয়ে লালু দিনের পর দিন টাকা নিয়ে যাচ্ছে। লালুর আসলে কিছুই হয়নি। মাধব যদি আগে জানতে পারত সৈকতকে সাবধান করে দিত। সৈকত বলল, টাকাটা তো সে মোতির হাতে দিয়েছে। মোতিও কি এর মধ্যে আছে? মাধব বলল, না। ছেলেটার কোনও দোষ নেই। ছেলেটা তার বাবাকে প্রচণ্ড ভয় পায়। বাবার কথা মতো কাজ না করলে তার বাবা বোধহয় মারতে মারতে তাকে মেরেই ফেলত।

'মাধব চলে যাবার পর সৈকত অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। তারপর একবার বিড়বিড় করে বলল, লোকটাকে এর জন্যে শাস্তি পেতে হবে। এর পরে ঠিক কী হয়েছিল আমি জানি না, তবে খানিকটা আন্দাজ করতে পারি। মোতি আর আমাদের বাড়ি আসেনি, হয়তো মাধব তাকে বারণ করে দিয়েছিল। কিন্তু মাধব চলে যাবার সপ্তাহ দুয়েক পরে রাত্তিরে আমরা একটা নেমন্তন্ন খেয়ে বাড়ি ফিরছি, সৈকত আবার গাড়ি চালাচ্ছে, দেখি গেটের মুখে সেই লালু বলে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। একেবারে হতশ্রী অবস্থা। দেখে মনে হয় কয়েক দিন পেটে কিছু পড়েনি। সৈকতকে দেখে লোকটা সৈকতের পা-দুটো জড়িয়ে ধরল। বলল, তার মস্ত ভুল হয়ে গেছে। সে সৈকতের কাছ থেকে যত টাকা নিয়েছে আস্তে আস্তে সব শোধ করে দেবে। সৈকত যেন তাকে ভাতে না মারে।

'লালুর কথা শুনে মনে হল, যে কনট্রাকটরের কাছে লালু কাজ করত সে সৈকতের চেনা। আন্দাজ করলাম, সৈকতের কথায় লালুর কাজটা চলে গেছে। শুধু ওই কাজটা নয়, সৈকত এমন ব্যবস্থা করেছে যাতে লালুর অন্য কোথাও কাজ পাওয়াও প্রায় অসম্ভব। কলকাতার কনট্রাকটরদের অনেককেই সৈকত চেনে। সৈকত লোকটাকে তার পা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াতে বলল। আমি ভাবলাম সৈকত হয়তো এবার লোকটাকে ক্ষমা করে দেবে। কিন্তু এর পরে যেটা ঘটল তার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। লোকটা উঠে দাঁড়াতেই সৈকত তার গালে একটা বিরাট চড় কষাল। সৈকতের হাইট ছ-ফুটের ওপর। খেলাধুলো করা পেটানো স্বাস্থ্য। চড়টা খেয়ে রোগা লোকটা তিন পাক ঘুরে বাড়ির মেন গেটের ওপর গিয়ে পড়ল। তার কষ বেয়ে রক্ত পড়ছে। গেটের রেলিং-এ লেগে কপালটাও কেটে গেছে। আমার মনে হল, সৈকত লোকটাকে

একটু বেশি শাস্তি দিয়ে ফেলছে। কিন্তু সৈকত থামল না। আমি অবাক হয়ে দেখলাম সে লোকটাকে মেরেই চলেছে, মেরেই চলেছে। একটা সময় আমার মনে হল মার খেতে খেতে লোকটা এবার মরেই যাবে। আমি সৈকত আর লোকটার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। সৈকতকে কাকুতি-মিনতি করে বললাম লোকটাকে ছেড়ে দিতে। আমি অনেকবার বলার পর সৈকত লোকটাকে ছেড়ে দিল। ছেড়ে দেবার আগে কর্কশভাবে লোকটাকে বলল, আবার যদি তোকে এখানে দেখি তা হলে আরও মারব। কথাটা যেন মনে থাকে। এই বলে সৈকত বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। একবার ফিরেও তাকাল না। এর কিছুদিন পরে শুনলাম লালু পরিবার নিয়ে কলকাতা ছেড়ে চলে গেছে। তাই বলছিলাম, সৈকত যেমন এক কথায় লোককে বিশ্বাস করে ফেলত, তেমনি তার চোখে কেউ অন্যায় করলে তাকে নিষ্ঠুরভাবে শাস্তি দিত। সৈকতের মনটা এত বড় ছিল, কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হল ক্ষমা জিনিসটা ওর মধ্যে একেবারে ছিল না।'

অনিতা থামল। ঘরে একটা স্তব্ধতা নেমে এসেছে।

'তাহলে তো বলতে হবে সৈকতবাবুর শত্রুর অভাব ছিল না। মানুষ উপকার পেলে ভুলে যায়, কিন্তু কেউ অপকার করলে সহজে ভুলতে চায় না।' আদিত্য স্তব্ধতা ভেঙে বলল।

স্বাগতম বাড়িটা থেকে বেরোবার সময় আদিত্য দেখল সিকিউরিটি ছেলেটা তখনও গেটের সামনে বসে আছে।

'শোনো ভাই, তোমাকে দু'একটা জিনিস জিজ্ঞেস করার ছিল। আমি সৈকত চৌধুরির মার্ডার কেসটা তদন্ত করতে এসেছি।' আদিত্য ভারিক্কি চালে বলল।

কথাটা সত্যি। কিন্তু সে যে পুলিশের লোক নয়, একজন বেসরকারি গোয়েন্দা, সেটা সিকিউরিটি ছেলেটিকে ইচ্ছে করেই আদিত্য বলল না। ফলে ছেলেটা ধরে নিয়েছে আদিত্য পুলিশের লোক। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার আগের তাচ্ছিল্য ভাব আর নেই।

'বলুন স্যার।'

'যেদিন সৈকত চৌধুরি খুন হন, তুমি এই গেটে ডিউটিতে ছিলে, তাই তো?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'তুমি পুলিশকে বলেছ সেদিন বিকেলে তুমি বাইরের কাউকে এই বাড়িতে ঢুকতে দ্যাখোনি, ঠিক তো?'

'হ্যাঁ স্যার। আমি সারা বিকেল এই গেটেই ছিলাম। বাইরের কাউকে ঢুকতে বা বেরোতে দেখিনি।'

'বাড়ির কেউ কি বাইরে গিয়েছিলেন, বা বাইরে থেকে বাড়ি ফিরেছিলেন?'

'আমার পরিষ্কার মনে আছে বিকেলবেলা, মানে এই সাড়ে-তিনটে চারটে হবে, সৈকত চৌধুরি সাহেব বাড়ি ফিরেছিলেন। গাড়ি পার্ক করে লিফট দিয়ে উঠে গেলেন। তার খানিক আগে অনিতা ম্যাডাম বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। অনিতা ম্যাডাম যখন বেরিয়েছিলেন তখনও চৌধুরি সাহেব বাড়ি ফেরেননি।'

'চৌধুরি সাহেব কখন বেরিয়েছিলেন?'

'আমার যতদূর মনে পড়ছে সকাল ন'টা-সাড়ে ন'টা নাগাদ সৈকত চৌধুরি সাহেব গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।'

'অনিতা ম্যাডাম কি পায়ে হেঁটে বেরিয়ে গেলেন?'

'উনি বাড়ির সামনে থেকে ট্যাক্সিতে উঠেছিলেন। আমিই ট্যাক্সিটা ধরে দিয়েছিলাম। ফেরার সময়ও উনি ট্যাক্সি করে বাড়ির সামনে নেমেছিলেন।'

'অনিতা ম্যাডাম কখন ফিরেছিলেন?'

'আমার যতদূর মনে পড়ছে তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল।'

'আর কেউ বাড়ির বাইরে যাননি?'

'হ্যাঁ, দুপুরবেলা দীপক শাসমল সাহেব পায়ে হেঁটে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। ফিরেছিলেন অনেক রাত্তিরে। আর হ্যাঁ, তার আগে মলয়া বিশ্বাসের মেয়ে টুম্পা ড্রাইভারের সঙ্গে টিউশানি থেকে ফিরেছিল।'

'আর কেউ?'

ছেলেটা কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, 'প্রদীপ চক্রবর্তী সাহেব বিকেলের দিকে ফিরেছিলেন। উনি কখন বেরিয়েছিলেন বলতে পারব না। বোধহয় আমি আটটায় ডিউটিতে আসার আগেই বেরিয়েছিলেন। আমি অন্তত ওকে বেরোতে দেখিনি।'

'ঠিক আছে। আবার দরকার হলে তোমাকে প্রশ্ন করব।'

(৩)

বেশ সকাল সকাল আদিত্যরা বেরিয়ে পড়েছিল। পিকনিকের জায়গায় গিয়ে ব্রেকফাস্ট খাবার কথা। আজ কেয়ার চেনা ড্রাইভার একটা অন্য গাড়ি নিয়ে এসেছে। নতুন একটা সুইফট ডিজায়ার। ড্রাইভার জানাল তার মালিক পুরোনো গাড়িগুলো বদলে পাঁচটা নতুন গাড়ি কিনেছে। এটা তার মধ্যে একটা। একে রবিবার, তার ওপর সাতটাও বাজেনি। রাস্তা একেবারে ফাঁকা। শ্যামবাজার পেরিয়ে বি টি রোড ধরতে মিনিট পাঁচেকও লাগল না।

ফুটপাথবাসীরা কেউ কেউ ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। কেউ আবার মাটিতে পাতা বিছানায় বসে আড়মোড়া ভাঙছে। মানে ঘুম থেকে ওঠার তোড়জোড় করছে। রাস্তার কলে মুখ ধোয়ার লম্বা লাইন। পাশে চায়েরদোকানে ভিড়, শুধু ফুটপাথের বাসিন্দারাই নয়, ট্যাক্সিচালক, রাজমিস্তিরি, জোগাড়ে, ঠিকে শ্রমিক, রিকশাওয়ালা দিনের কাজ শুরু করার আগে চায়ের সঙ্গে পাঁউরুটি-ঘুগনি খেয়ে নিচ্ছে। ভোরবেলার আধো-ঘুমন্ত বি টি রোড, আদিত্য দেখতে দেখতে যচ্ছিল।

সিঁথির মোড়ের কাছে ট্র্যাফিক সিগনালে গাড়িটা আটকে গেছে। আদিত্য দেখল রাস্তার ধারে একটা দোকানে কচুরি ভাজা হচ্ছে, সঙ্গে জিলিপি। দেখেই লোভ লাগে। আদিত্যর বেশ খিদে পেয়ে গেছে। কেয়াকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, 'ওরা ব্রেকফাস্টে কচুরি-টচুরি দেবে নাকি গো?', দ্যাখে কেয়া জানলার কাঁচে মাথা রেখে কাত হয়ে নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে। আসলে কেয়া একদম ভোরে উঠতে পারে না। কেয়ার ঘুমন্ত মুখটা দেখে আদিত্যর হঠাৎ খুব মায়া হল।

বেলঘরিয়া, আগরপাড়া, খড়দা, টিটাগড়। রবিবার সকালের ফাঁকা রাস্তা, গাড়ি হু হু করে চলছে। এক সময় এসব অঞ্চলে অনেক কলকারখানা ছিল। এখন তার বেশিরভাগই বন্ধ। কেয়া নাগাড়ে ঘুমিয়ে যাচ্ছে। ব্যারাকপুরের মোড়ে পৌঁছে গাড়ি বাঁদিকে বাঁক নিল। গঙ্গা ওদিকেই। ড্রাইভার জানে কোথায় যেতে হবে। যেখানে পিকনিক হবার কথা সেটা বেশ পপুলার একটা রিসর্ট। তাই অভিজ্ঞ ড্রাইভাররা এটার সন্ধান জানে। মনে হচ্ছে গন্তব্যস্থল প্রায় এসে গেছে। আদিত্য কেয়াকে জাগিয়ে দিল। ঘড়িতে নটা দশ।

একটা সবুজ লন। লনের এক প্রান্তে দুটো বড় ঘর। সেখানে খাওয়া এবং বিশ্রামের ব্যবস্থা। অন্য প্রান্তে বিস্তীর্ণ গঙ্গা। নয়নাভিরাম। যিনি পিকনিকের ব্যবস্থা করেছেন তাঁর ব্যবস্থাপনার তারিফ করতেই হবে।

আদিত্যরা যখন পৌঁছল তখন অনেকেই পৌঁছে গেছে। লনের ওপর ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গল্প করছে। নানা বয়সের বাচ্চারাও এসেছে। ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টনের তোড়জোড় চলছে। টানা ঘুম দিয়ে কেয়ার এনার্জি খুব বেড়ে গেছে। সে বিপুল উৎসাহে তার সহকর্মীদের সঙ্গে আদিত্যকে আলাপ করিয়ে দিচ্ছে। তাদের স্বামীদের সঙ্গেও। অত মহিলার নাম মনে রাখা আদিত্যর পক্ষে অসম্ভব। সে শুধু খুব ব্যগ্র হয়ে অনিতার প্রতিবেশিনী শাশ্বতী শাসমলকে খুঁজছিল। কেয়া বলেছিল, শাশ্বতী অন্যতম অরগানাইজার। তাই নিশ্চয়ই কোথাও ব্যস্ত রয়েছে।

শাশ্বতীকে না পেয়ে আদিত্য এখন সিগারেট ধরাবার সুযোগ খুঁজছে। আজকাল সিগারেট নিয়ে মানুষের এত আপত্তি, একটু আড়ালে গিয়ে সিগারেট খাওয়াই ভাল। লনের এক কোণে একটা বটগাছের আড়াল রয়েছে। আদিত্য গাছের তলায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল। গঙ্গাটাকে বেশ দেখাচ্ছে। একটু দূরে ফেরিঘাট থেকে শ্রীরামপুরের ফেরি ছেড়ে গেল। আবার একটা ফেরি এসে দাঁড়িয়েছে। এটা বোধহয় শেওড়াফুলি যাবে। অন্তত ফেরির গায়ে তাই লেখা আছে।

'আদিত্যদা? এখানে একা একা দাঁড়িয়ে রয়েছেন? ব্রেকফাস্ট দেওয়া হয়েছে। ভেতরে চলুন। কেয়াদি আমাকে বলল, আমার কর্তাকে ধরে আনতে পারবি? মনে হচ্ছে ওই গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। আমি অদ্রিজা। সবাই আমাকে হিস্ট্রির অদ্রিজা বলে।'

আদিত্য দেখল পাঁচ ফুট লম্বা সুশ্রী, হাসিখুশি একটি বছর তিরিশের যুবতী। সে সিগারেট হাতে ধরা পড়ে যাওয়া ইস্কুলের ছাত্রের মত তাড়াতাড়ি আধ-খাওয়া সিগারেটটা পায়ে মাড়িয়ে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনার কথা কেয়ার কাছে অনেক শুনেছি।'

'শুনবেনই তো। আমি রেগুলার কেয়াদিকে আপনার কথা জিজ্ঞেস করি। জানেন, আমি আপনার বিরাট ফ্যান।' অদ্রিজা আদিত্যর পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল।

আদিত্য লজ্জা পেয়ে চুপ করে রইল।

'আপনার সব কটা বড় কেসের কাটিং, যেগুলো খবর কাগজে বেরিয়েছে, আমি খাতায় পেস্ট করে রেখেছি।' অদ্রিজা বলেই চলেছে।

আদিত্য বুঝতে পারছে না কী বলবে, তাই চুপ করেই রইল। ভাগ্যক্রমে তারা ইতিমধ্যে খাবার ঘরে পৌঁছে গেছে, তাই তাকে আর উত্তর দিতে হল না।

'কেয়াদি, ধরে এনেছি তোমার কর্তাকে।' অদ্রিজা গলা তুলে বলল।

ঘরে কয়েকটা বড় ডাইনিং টেবিল ঘিরে অনেকে বসে খাচ্ছে। কেয়ার পাশে একটা জায়গা ফাঁকা। নিশ্চয় কেয়া আদিত্যর জন্য জায়গা রেখেছে। আদিত্য সেখানে গিয়ে বসল। কেটারিং-এর লোক ব্রেকফাস্ট পরিবেশন করতে শুরু করে দিয়েছে। হাতে গরম রাধাবল্লভী, আলুর দম। অমৃত। শেষে সন্দেশ। সন্দেশটা উত্তর কলকাতার একটি বিখ্যাত দোকানের। অতি উত্তম। তবু আদিত্যর মনে হল রাধাবল্লভী-আলুর দমের পরে গরম বোঁদে হলেই ঠিক হত।

খাবার পরে চা এসে গেছে।

'আমার নাম দীপক শাসমল।' আদিত্যর ডানপাশের ভদ্রলোক হাত তুলে নমস্কার করলেন। 'ইনি আমার স্ত্রী শাশ্বতী।'

'তুমি তো ওদের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলে?' কেয়া বাঁ দিক থেকে বলল। 'তাই ওদের পাশে বসলাম।'

'আপনারা অনিতা চৌধুরির প্রতিবেশী?' আদিত্য আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল। 'আপনাদের সঙ্গে অনেক কথা ছিল।'

'আমরাই অনিতার পাশের ফ্ল্যাটে থাকি। আমিই অনিতাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম।' শাশ্বতী শাসমল বলল। 'আমরাও আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'একটু অপেক্ষা করা যাক। এই জায়গাটা একটু খালি হোক। আমরা এখানে বসেই কথা বলব।' আদিত্য সাবধানি গলায় বলল।

চা খাওয়া সেরে আস্তে আস্তে সকলেই ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। বাইরে নানারকম খেলাধুলোর ব্যবস্থা হয়েছে। ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন ছাড়াও মেমরি গেম, অন্তাক্ষরী। তাছাড়া নির্ভেজাল আড্ডা তো আছেই। একটু পরেই ঘরটা খালি হয়ে গেল। আদিত্য-কেয়া, শাশ্বতী-দীপক ওরা চারজন চারটে চেয়ারে ছড়িয়ে ছড়িয়ে বসেছে।

'আমি খুব বেশি প্রশ্ন করব না। আমি জানি আপনি আজ ব্যস্ত, তবু এই জায়গাটা প্রশ্ন করার জন্য বেছে নিলাম কারণ আমি চাইছিলাম প্রশ্ন করার সময় অনিতা যেন উপস্থিত না থাকে। সেটা আপনাদের ফ্ল্যাটে হয়তো সম্ভব হত না।'

'না, না। আমি মোটেই ব্যস্ত নই। কেটারাররাই তো সব কাজ করছে। আপনি সময় নিয়ে প্রশ্ন করুন।'

'আমার প্রথম প্রশ্ন, ঘটনার সময়, অর্থাৎ সৈকত চৌধুরি খুন হওয়ার সময়, আপনারা কোথায় ছিলেন?'

'আমি বাড়ির কাছেই আমাদের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্টের বাড়ি গিয়েছিলাম। কলেজ নিয়ে কয়েকটা আলোচনা ছিল। আমি কলকাতার একটা কলেজে বটানি পড়াই। আমাদের ডিপার্টমেন্টের দুজন মহিলা ফ্যাকাল্টি একসঙ্গে মেটারনিটি লিভ নিয়েছেন। ফলে পড়ানো নিয়ে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেসব নিয়ে কথা বলতে গিয়েছিলাম। ফিরেছিলাম রাত্তির আটটা নাগাদ। ফিরে দেখি এই কাণ্ড।' দীপক শাসমল থামলেন।

'আর আপনি?' আদিত্য শাশ্বতীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'আমি সারা দুপুর পরীক্ষার খাতা দেখছিলাম। কখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নেমে গেছে টের পাইনি। অনিতার ধাক্কাধাক্কিতে দরজা খুলে সব জানতে পারলাম।'

'আপনি কোনও শব্দ শুনেছিলেন? টায়ার ফাটার মতো কোনও শব্দ?'

'পুলিশও আমাকে এই প্রশ্নটা করেছিল। না আমি কোনও শব্দ শুনিনি। হয়তো খুব মন দিয়ে খাতা দেখছিলাম বলে শুনতে পাইনি।'

'এবার একটা ডেলিকেট প্রশ্ন করব। শোনা যাচ্ছে অনিতা চৌধুরির বাড়িতে, যখন তার স্বামী থাকত না, তখন তার ভাই ছাড়াও অন্য একটি ছেলে তার সঙ্গে দেখা করতে আসত। আপনি কি এ-বিষয়ে কিছু জানেন?'

শাশ্বতী শাসমল কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে রইল। গভীরভাবে কিছু একটা ভাবছে। শেষে মুখ তুলে বলল, 'এটা অনিতার ব্যক্তিগত ব্যাপার, সাধারণ অবস্থা হলে আমি কখনোই এটা নিয়ে কথা বলতাম না। কিন্তু এখন তো একটা অস্বাভাবিক অবস্থা। তাই আমি যেটুকু জানি সেটুকু বলতেই হবে।'

'আর একটু চা খাবেন আপনারা?' কেটারারের ছেলেটি এসে বলল। হয়তো ব্যবস্থাপক বলে শাশ্বতীকে বাড়তি খাতির করতে চাইছে।

'আমি একটু চা খেতে পারি।' আদিত্য আগ বাড়িয়ে বলল।

'আমিও।' এবার দীপক শাসমলের গলা।

'আপনারা খাবেন না ম্যাডাম?'

'খাই একটু? কী বলিস?' কেয়া শাশ্বতীর দিকে তাকিয়ে বলল।

খানিক পরে, চা-পর্ব শেষ হলে, শাশ্বতী শাসমল বলতে শুরু করল।

'কীভাবে শুরু করব বুঝতে পারছি না। অনিতা আমাকে অনেক কথাই বলত। ওর কথা থেকে বুঝতে পারতাম সৈকতের সঙ্গে অনিতার সম্পর্কটা কিছুদিন ভাল যাচ্ছিল না। আমি অনিতার ভার্সানটাই বলতে পারি, সৈকতের সঙ্গে এসব নিয়ে কখনও কথা হয়নি। অনিতা বলত, সৈকত যেন মানসিকভাবে তার থেকে সরে যাচ্ছে। যেন ওর কোনও একটা গভীর সমস্যা আছে যেটা ও অনিতাকে বলছে না। বারবার জিজ্ঞেস করার পরেও বলছে না। বলতে পারছে না। অথচ সারাদিন সৈকত ভীষণ বিমর্ষ হয়ে থাকে। কথা বলে না। এইভাবে প্রায় আট-নমাস, নাকি প্রায় এক বছর চলতে থাকার পর, অনিতার সঙ্গে তার একজন পুরোনো বন্ধুর আবার দেখা হয়। ছেলেটি অনিতার কলেজের বন্ধু, কিন্তু ওদের মধ্যে অন্য কোনও রকম সম্পর্ক কখনও ছিল কিনা আমি বলতে পারব না। অনিতা এসব নিয়ে আমাকে সরাসরি কিছু বলেনি। তবে ওর

কথাবার্তায় বুঝতে পারতাম যত সৈকত ওর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, ওই ছেলেটির ওপর অনিতার নির্ভরতা তত বাড়ছে।'

'অনিতা কি ছেলেটির নাম বলেছিল? কী করে? কোথায় থাকে? সেসব কিছু বলেছিল?' আদিত্য খানিকটা উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'ছেলেটি বাঙালি নয়, গুজরাটি। তবে ভবানীপুরের গুজরাটি, বাঙালিদের মতই বাঙলা বলে। সেদিক থেকে অনেকটা অনিতার মতো। ছেলেটির নাম সমীর, সম্ভবত সমীর প্যাটেল। এজরা স্ট্রিটে ওদের ইলেক্ট্রিÉকাল গুডস-এর দোকান। দোকানটা ওর বাবার। সেখানে ও সন্ধেবেলা বসে। দুপুরে দোকানে বসে ওর বাবা এবং দাদা। তাই দুপুরগুলো ওর ফ্রি। ওই ফ্রি টাইমেই ও অনিতার সঙ্গে দেখা করতে আসত। এসব কথা অনিতা আমাকে বলেছে।'

'এই সমীর বলে ছেলেটির কথা কি সৈকত চৌধুরি জানত?'

'সেটাই বলতে যাচ্ছিলাম। অনিতা নিজের মতো করে সমীরের কথা সৈকতকে বলেছিল। হয়তো পুরোটা বলেনি। কিন্তু আমাদের কমপ্লেক্সে একজন অত্যন্ত অবনক্সাস মহিলা থাকেন। নাম মলয়া বিশ্বাস। হয়তো এর কথা অনিতা আপনাকে বলেছে। এই মহিলা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মোবাইলে সমীরের ছবি তুলে সৈকতের কাছে এই বলে পাঠান যে এই ব্যক্তি আপনার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে প্রত্যেক দুপুরবেলা আপনার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসে। আপনি আপনার স্ত্রীকে সামলান। এটা ভদ্রলোকদের থাকার জায়গা। এখানে এইসব বেলেল্লাপনা চলবে না। এর ফলে, বুঝতেই পারছেন, অনিতার সঙ্গে সৈকতের সম্পর্কটা আরও ধাক্কা খায়। আমি যতদূর জানি, সৈকত খুন হবার কিছুদিন আগে থেকে অনিতার সঙ্গে সৈকতের কথাবার্তা বন্ধ ছিল।'

'আর একটা প্রশ্ন। সৈকত চৌধুরি মানুষটি সম্বন্ধে আপনাদের কী ধারণা? মানে, আপনাদের যেটা মনে হয় সেটাই বলুন।'

'আমি সৈকতকে খুব বেশি চিনতাম বলব না।' শাশ্বতী একটু চিন্তা করে বলল। 'বিশেষ করে এই কারণে যে অনিতা আমার ভীষণ ক্লোজ ছিল, তাই সৈকতের সঙ্গে অনিতার দূরত্ব যত বাড়ছিল, আমার সঙ্গেও সৈকতের কথাবার্তা কমছিল। করিডোরে কিংবা লিফটে দেখা হলে হয়তো একটু হাসতাম। কিন্তু ব্যস ওই পর্যন্ত। তাই সৈকত চৌধুরি লোকটা সম্বন্ধে আমি তেমন কিছু বলতে পারব না।'

'আমি কিন্তু সৈকতকে আর একটু বেশি চিনতাম। রেগুলারলি নয়, তবে মাঝে মাঝে সৈকত আমাকে ফোন করে দাবা খেলতে ডাকত। একজন ক্রিকেটারের যে দাবায় এত উৎসাহ থাকতে পারে ওকে না দেখলে বিশ্বাস হত না।' দীপক শাসমল বলল।

'আপনারও কি দাবায় খুব উৎসাহ?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'আমি দাবায় কলকাতা ইউনিভার্সিটি রেপ্রেজেন্ট করেছি। তারপর স্টেট লেভেলেও খেলেছি কিছুদিন। সেখানে অবশ্য খুব বেশি দূর এগোতে পারিনি।'

'তা দাবা খেলতে গিয়ে সৈকত চৌধুরি সম্বন্ধে কী জানতে পারলেন?'

'এক কথায় যদি বলতে হয় তাহলে বলব সৈকত খুব সহজ-সরল মানুষ ছিল। অত সরলভাবে চিন্তা করলে ভাল দাবাড়ু হওয়া যায় না। দাবা খেলতে গেলে একটু কূটবুদ্ধির প্রয়োজন হয়। সৈকত খুব পেঁচিয়ে ভাবতে পারত না। ফলে দাবাতে ওর যতটা উৎসাহ ছিল ততটা ন্যাক ছিল না।'

'ইদানীং কি সৈকতকে কিছুটা ডিস্টার্বড দেখাত?'

'সেটা ঠিক বলতে পারব না। কারণ বিগত মাস ছয়েক সৈকত আমাকে দাবা খেলতে ডাকেনি।'

'তোরা চারজন এখানে বসে কী করছিস? বাইরে চল, বাইরে চল। সকলে বাইরে রয়েছে।' একজন প্রবল চেহারার দিদিমণি ঘরে ঢুকে বললেন। একটু আগে তার সঙ্গে আদিত্যর আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু আদিত্য তার নামটা ভুলে গেছে।

'আমার প্রশ্ন করা হয়ে গেছে।' সে নিচু গলায় বলল।

সন্ধেবেলা যখন আদিত্য আর কেয়া পিকনিক সেরে অমিতাভদের বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়েছে, কেয়া বলল, 'যাই বল, এই অনিতা মেয়েটা কিন্তু বেশ গোলমেলে। সেদিন আমাদের বাড়িতে এসে এমন একটা ধারণা দিল যে ওর বাপের বাড়ির লোকেরাই ওর স্বামীকে খুন করেছে। অথচ শাশ্বতী তো সম্পূর্ণ অন্য কথা বলছে। ওর কথা শুনে এখন মনে হচ্ছে সৈকতের খুনের পেছনে অনিতার ওই বন্ধু না প্রেমিক সমীর বলে ছেলেটার হাত আছে। এই সমীরের কথা অনিতা সেদিন স্রেফ চেপে গিয়েছিল। স্বামীর সঙ্গেও যে ওর গোলমাল চলছে সেটাও বলেনি। কে বলতে পারে অনিতাই ওর স্বামীকে খুন করায়নি? ওর কিন্তু একটা ভিজে বেড়াল ভিজে বেড়াল ভাব আছে। অভিনয়টাও ভাল করে।'

গাড়ি শেয়ালদা পেরিয়ে সি আই টি রোডে ঢুকেছে। রবিবারের সন্ধে, তাই দোকানপাট বন্ধ, রাস্তাঘাট ফাঁকা। আদিত্য সেদিকে তাকিয়ে উদাস গলায় বলল, 'মেয়েদের চরিত্র, কে কবে বুঝতে পেরেছে?'

'আমরা অনেক ভেবে দেখলাম। পাকাপাকিভাবে অ্যামেরিকায় থাকা আমাদের পোষাবে না। আমারও না, রত্নারও না।' অমিতাভ জোর দিয়ে বলল।

'আমি তো এখানে কলেজ নিয়ে খুব সুখে আছি। ওখানে যদি ওরা আমাকে একটা চাকরিও দেয়, এই বয়েসে নতুন জায়গায় গিয়ে আদৌ মানিয়ে নিতে পারব কিনা জানি না।' এবার রত্নার গলা।

আদিত্যর মনে হল বিদেশে পাকাপাকিভাবে চলে যাবার ব্যাপারে অমিতাভর সেই উৎসাহটা আর নেই। সে বলল, 'আমার পক্ষে কোনও মত দেওয়া খুব কঠিন। আমি তো কখনও বিদেশেই যাইনি। সেখানকার হালচাল কিছুই জানি না। তবে শুনেছি বিদেশে, বিশেষ করে আমেরিকায়, নিয়মিত রিসার্চ আউটপুট দেখাতে হয়। তোকে তো ছোটবেলা থেকে চিনি। তোর যা টেম্পারামেন্ট তাতে অত চাপের মধ্যে তুই কাজ করতে পারবি বলে মনে হয় না।'

'তুই আমার মনের কথাটা বলেছিস। এখানে আমি খুব রিল্যাক্সড হয়ে রিসার্চ করি। একটা আইডিয়া নিয়ে অনেকদিন ভাবতে পারি। কোনও চাপ নেই। ওখানে গেলে হয়তো আউটপুট দেখানোর জন্যে হাফ-বেকড আইডিয়াগুলোকেই লিখে ফেলতে হবে।'

'আমি বাবা অত শত বুঝি না। আমার তো এই শ্যামবাজারের মোড়, হাতিবাগান, কলেজ স্ট্রিট, কিছুটা গড়িয়াহাট, নিউ মার্কেট এসব জায়গায় ঘুরতে বেশ লাগে। খুব বেশি বেড়াতে অবশ্য যাওয়া হয়নি, তবে যেটুকু গেছি কদিনের মধ্যেই কলকাতার জন্যে মনটা হাঁপিয়ে উঠেছে। বিদেশে চলে গেলে তোমাদের কলকাতার জন্যে মন কেমন করবে না?' কেয়া খুব সরলভাবে রত্নাকে বলল। এত সরলভাবে বলল যে রত্নাও খানিকটা আবেগতাড়িত।

'করবে না আবার? খুব মন কেমন করবে। আমরা তাই ঠিক করেছি দুজনেই চাকরি থেকে ছুটি নিয়ে এক বছরের জন্যে ঘুরে আসব। টুবলুর স্কুল থেকেও এক বছর ছুটি পাওয়া যাবে। এক বছরের জন্যে ঘুরে এলে ওদের অফারটাকেও সম্মান দেওয়া হবে আবার পাকাপাকিভাবে কলকাতাও ছাড়তে হবে না।' রত্না বলল।

'হ্যাঁ। আমরা এটাই ফাইনালি ঠিক করেছি।' অমিতাভ জোর গলায় রত্নাকে সমর্থন করল।

'বাঁচালি। তোরা বিদেশ চলে গেলে আমি কী করতাম জানি না। আমার দিকের ফ্যামেলি বল বন্ধু বল তোরাই আছিস।' আদিত্য নিশ্চিন্ত হবার ভঙ্গিতে বলল।

'যাগগে, ওসব কথা থাক। তোদের কথা বল। কবে হানিমুনে যাচ্ছিস?' রত্না জিজ্ঞেস করল।

'হানিমুন? হ্যাঁ ওটার কথা কেয়া রোজ বলছে। আমার হানিমুনে যাবার টাকা কোথায়?'

'তোমাকে টাকার কথা বলেছি? টাকা আমি দেব। তুমি শুধু যাবার ব্যবস্থা করবে। তাই নিয়ে শুধু গড়িমসি করে যাচ্ছ।' কেয়া ঝাঁঝিয়ে উঠল।

'বউ-এর টাকায় হানিমুনে যেতে পৌরুষে লাগে না? তোরাই বল।' আদিত্যর গলাটা করুণ শোনাল।

'ও আচ্ছা, ভাল কথা।' কী একটা মনে পড়ে যেতে আদিত্য রত্নার দিকে তাকিয়ে বলল। 'তুই তো ইতিহাস পড়াস। সিটি কলেজে গত দশবছর ধরে ইতিহাস পড়াচ্ছে এমন কাউকে চিনিস?'

'চিনি। আমাদের একজন ক্লাসমেট সিটিতে পড়ায়। অভিজিৎ ঘোষ। আমার থেকে অমিতাভ ওকে আরও ভাল চেনে। কেন বলতো?'

'একটি মেয়ের সম্বন্ধে জানতে হবে। নাম অনিতা শর্মা। অবাঙালি। বছর ছয়েক আগে সিটি কলেজে ইতিহাস পড়ত। সুন্দরী। থার্ড ইয়ারে পড়তে পড়তেই বিয়ে হয়ে যায়।'

'কী জানতে হবে?'

'যা-কিছু জানা যায়।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(১)

বিশ্বজিৎ মজুমদার বলেছিল সৈকত চৌধুরির আপিস, গুপ্ত অ্যান্ড চৌধুরি সিভিল কনস্ট্রাকশান্স, সল্টলেক সেক্টর থ্রি-র আই বি ব্লকে। আদিত্য জিপিএস ম্যাপে দেখে নিয়েছিল জায়গাটা কলম্বিয়া এশিয়া হাসপাতালের পেছন দিকে। সকাল এগারোটায় বিশ্বজিতের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে। আদিত্য খান্না সিনেমার মোড় অব্দি হেঁটে গিয়ে উল্টোডাঙার অটো ধরল। তারপর উল্টোডাঙা থেকে একটা বাস ধরে স্টেডিয়াম। স্টেডিয়াম থেকে কলম্বিয়া এশিয়া যাবার কি কোনও বাস বা অটো আছে? আদিত্য ঠিক জানে না। বাস থেকে নেমে সে হাঁটা লাগাল।

আদিত্যর মতো যারা শহরের ঘিঞ্জি এলাকায় চলাফেরা করতে অভ্যস্ত তারা সল্ট লেকের দূরত্বগুলো ঠিক আন্দাজ করে উঠতে পারে না। সে ভেবেছিল হাতে অনেক সময় আছে, এগারোটার আগেই তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে। কার্যত দেখা গেল হাঁটছে তো হাঁটছেই। যখন কলম্বিয়া এশিয়া হাসপাতালের সামনে পৌঁছল তখনই এগারোটা পাঁচ। এখান থেকে ঠিক জায়গাটা খুঁজে বার করতে আরও কতক্ষণ লাগবে কে জানে? আদিত্য বিশ্বজিতের নম্বরটা ডায়াল করল।

বিশ্বজিৎ ধীরে সুস্থে আসতে বলছে। সে এখন অফিসেই থাকবে। তাছাড়া কলম্বিয়া এশিয়া হাসপাতাল থেকে গুপ্ত অ্যান্ড চৌধুরি সিভিল কন্সট্রাকশান্স-এর আপিসে যাবার একটা মোটামুটি ডিরেকশনও সে দিয়ে দিয়েছে। তা সত্ত্বেও সৈকত চৌধুরির আপিসে পৌঁছতে পৌঁছতে সাড়ে এগারোটা পেরিয়ে গেল।

আপিসটা খুব ছোট নয় আবার খুব বড়ও নয়। পুরো একতলা জুড়ে ছোট ছোট কিউবিকল। কতগুলোতে ছেলেমেয়েরা কাজ করছে। কিছু ফাঁকা। দুই সারি কিউবিকল-এর মধ্যে দুটো বড় ঘর, একটার দরজায় লেখা 'মণিময় গুপ্ত' অন্যটার দরজায় লেখা সৈকত চৌধুরি'। ধরে নিতে বাধা নেই, দুটো ঘরই এখন ফাঁকা। উল্টোদিকে আর একটা ঘর, তুলনায় ছোট, তার বন্ধ দরজার ওপর লেখা 'বিশ্বজিৎ মজুমদার, জেনারেল ম্যানেজার'। নিজের নাম বলতে রিসেপশানের মেয়েটি আদিত্যকে জানাল, বিশ্বজিৎবাবু আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। সোজা গিয়ে ডানদিকের ঘর। আপনি গিয়ে নক করুন।

'আমাদের কোম্পানি একটা আনপ্রিসিডেন্টেড ক্রাইসিসের মধ্যে দিয়ে চলেছে। দুজন মালিকের একজন নেই, আর একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি না। আমি আমার মতো করে যতটা পারছি চালাচ্ছি। অনেকগুলো ছেলেমেয়ের রুটিরুজির ব্যবস্থা হয় এখান থেকে। নতুন প্রজেক্ট কিছু আসছে না। অন গোইং প্রজেক্টগুলোই চলছে। কতদিন এভাবে চলবে জানি না।'

আদিত্য খুব মন দিয়ে বিশ্বজিৎ মজুমদারকে লক্ষ করছিল। টেলিফোনে গলা শুনে বিশ্বজিৎ মজুমদারের যে চেহারাটা আদিত্যর মনে তৈরি হয়েছিল, আসল লোকটা তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মোবাইলে কথা বলে আদিত্যর মনে হয়েছিল বিশ্বজিৎ মজুমদার একজন ফরসা, মাঝারি হাইটের চশমা পরা দোহারা স্বাস্থ্যের লোক। কেন এরকম মনে হয়েছিল তার কোনও ব্যাখ্যা অবশ্য আদিত্যর কাছে নেই। আসল বিশ্বজিৎ মজুমদার বেশ লম্বা, রীতিমতো কালো, বয়েস বছর পঁয়তাল্লিশ, ছিপছিপে, চোখে চশমা-টশমা কিচ্ছু নেই। চেহারায় একটা ব্যক্তিত্ব আছে। তার সঙ্গে এখন একটা অসহায়তার মিশেল ঘটেছে।

বিশ্বজিৎ মজুমদারের চেম্বারটা ছোট, কিন্তু তার মধ্যেই বেশ গোছানো। দেখে আদিত্যর মনে হল লোকটার কাজে একটা গোছ আছে।

'মণিময়বাবু কি মাঝে মাঝে এরকম অজ্ঞাতবাসে চলে যান?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'যান। মানে অতীতে অনেকবার গেছেন। পরে ফিরে এসে বেড়ানোর গল্প করেছেন। মিঃ গুপ্ত-র দুর্গম জায়গায় বেড়ানোর খুব শখ। আফ্রিকা, সাউথ আমেরিকা, মোঙ্গোলিয়া, আরও নানা জায়গা, নামই শুনিনি। বিয়ে-সাদি করেননি। ওই নিয়েই থাকেন। আর যখন বেড়াতে যান, কারও সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না। ফোন করেও পাওয়া যায় না। কিন্তু এবার যেন একটু বেশি দেরি করে ফিরছেন। যদি মিঃ চৌধুরির খবরটা জানতেন তাহলে নিশ্চয় এক্ষুনি ফিরে আসতেন।'

'মণিময় গুপ্ত-র অনুপস্থিতিতে কি সৈকত চৌধুরিই অফিস চালাতেন?'

'না। না। মিঃ চৌধুরি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কিচ্ছু দেখতেন না। ওঁর এরিয়াটা স্ট্রিক্টলি টেকনিকাল। ড্রয়িং, ডিসাইনিং এসব কাজে উনি ছিলেন সুপার্ব। সত্যি বলতে কি, কাজে ওঁর সুনামের জন্যই বেশিরভাগ ক্লায়েন্ট আমাদের কম্পানিতে আসত। অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা দেখতেন মিঃ গুপ্ত। ফিনানশিয়াল দিকটাও। উনি না থাকলে আমিই ওগুলো দেখি। এখন যেমন দেখছি।'

'আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডটাও কি ইঞ্জিনিয়ারিং-এর?'

'না, না। আমি চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। একটা ছোটখাটো এমবিএ ডিগ্রিও আছে।'

'আচ্ছা,' আদিত্য একটু থেমে থেমে বলল, 'আপনাদের তো প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, মানে ব্যক্তিগত মালিকানা।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'মালিক কারা?'

'ওই তো ওই দুজন। মণিময় গুপ্ত আর সৈকত চৌধুরি।'

'মণিময় গুপ্তর ওয়ারিস কে, জানেন?'

'আমি যতদূর জানি, মণিময় গুপ্তর কোনও ওয়ারিস নেই। খুব দূর সম্পর্কের কেউ থাকলে অবশ্য জানি না।'

'সেক্ষেত্রে, সৈকত চৌধুরি যখন আর নেই, যদি মণিময় গুপ্তর কিছু হয়ে যায়, মানে আমি হাইপথেটিকালি বলছি, কোম্পানির মালিকানা কি সৈকতের স্ত্রী অনিতার হাতে চলে যাবে?'

'সেরকমই তো মনে হয়। যদি না অবশ্য মণিময় গুপ্তর কোনও আত্মীয়, যাকে আমরা চিনি না, হঠাৎ উদয় হয়ে কম্পানির অংশ দাবি করে বসে।'

'আচ্ছা, আপনাদের কম্পানির ফিনান্সিয়াল অবস্থা কেমন? ব্যালেন্স সিটে বার্ষিক প্রফিট কতটা দেখায়?'

'খুব বেশি প্রফিট আমাদের থাকে না। খরচ, ট্যাক্স সব বাদ দিয়ে ধরুন বছরে দু-তিন কোটিও থাকে না। ইদানীং সেটার থেকেও প্রফিট কমে গেছে।'

'আপনাদের তো বেশ বড় কোম্পানি। কুড়ি-পঁচিশজন কাজ করে নিশ্চয়। প্রফিট এত কম কেন?'

'মূল কারণ, কোম্পানির প্রচুর ধার আছে। ধারের টাকা মেটাতেই লাভের বড় অংশ বেরিয়ে যায়। মালিকদের কোম্পানি চালানোর জন্য খুব বেশি টাকা ছিল না। তাই ধার করতে হয়েছিল। ব্যাঙ্ক থেকে খুব একটা ধার পাওয়া যায়নি। মালিকরা কম্পানিতে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট ইনভেস্ট না করলে ব্যাঙ্করা ধার দিতে চায় না। তাই মালিকরা প্রাইভেট সোর্স থেকে ধারটা করেছিলেন। হাই ইন্টারেস্ট। এখন তো চারদিকে সুদের হার কমছে। কিন্তু ওই পুরোনো লোনগুলোর ওপর ইন্টারেস্ট কমানো যায়নি। ওটা কন্ট্রাক্টে ছিল না!'

'কাদের কাছ থেকে কোম্পানি ধার করেছিল?'

'মেনলি একটাই সোর্স। অসীম দত্ত একজন বড় কন্ট্রাক্টার। তার এইস বিল্ডার্স বলে একটা কোম্পানি আছে। সেখান থেকেই টাকাটা ধার নেওয়া হয়েছিল।'

'অসীম দত্তর কোম্পানির সঙ্গে কি আপনাদের কোম্পানির আর কোনও সম্পর্ক আছে?'

'আছে বইকি। খুব ভাল রকমের সম্পর্ক আছে। আমাদের যত প্রজেক্ট প্রায় সবই তো অসীম দত্তর কোম্পানি এক্সিকিউট করে। মিঃ দত্ত মিঃ গুপ্তর খুব ক্লোজ। ক্লোজ, কিন্তু সুদ একচুলও কমাবে না। মিঃ চৌধুরি অবশ্য এসবের মধ্যে খুব একটা ঢুকতেন না। প্রজেক্টটা ডিসাইন করেই তাঁর কাজ শেষ।'

'আচ্ছা, এই অসীম দত্ত কি বলতে পারবেন মণিময়বাবু কোথায় আছেন?'

'ঠিক বলতে পারব না। জিজ্ঞেস করিনি।'

'আমাকে অসীম দত্তর ঠিকানাটা দিতে পারবেন? আর সম্ভব হলে ফোন নাম্বার?'

'বাড়ির ঠিকানাটা তো জানি না। অফিসের ঠিকানা এক্ষুনি দিয়ে দিচ্ছি। অফিসের ল্যান্ডলাইনটাও দিচ্ছি। মোবাইলটা না জিজ্ঞেস করে দিতে পারব না।'

'ঠিক আছে। তাতেই হবে।'

'আর শেষ কয়েকটা প্রশ্ন। সৈকত চৌধুরির সঙ্গে আপনাদের, মানে স্টাফেদের, সম্পর্ক কেমন ছিল?'

'দেখুন, এটা আমি উইদাউট এনি হেজিটেশন বলতে পারি যে মিঃ চৌধুরিকে অফিসের প্রত্যেকটি স্টাফ, ইনক্লুডিং মি, ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত। এটা শুধু মিঃ চৌধুরির টেকনিকাল নলেজের জন্যে নয়। ওঁর মতো উদার-হৃদয় মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। উনি প্রত্যেকটি স্টাফের বিপদে আপদে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। এই ম্যাগ্ন্যানিমিটিটার জন্যেই স্টাফেরা ওঁকে এত ভালবাসত।'

'মণিময়বাবুর সঙ্গে স্টাফেদের সম্পর্ক কেমন ছিল?'

'দেখুন, মিঃ গুপ্ত স্টাফেদের সঙ্গে একটা দূরত্ব বজায় রাখা পছন্দ করতেন। এটা উনি কখনোই ভুলতে দিতেন না যে উনি মালিক আর আমরা কর্মচারী। তাই মিঃ চৌধুরির কাছে আমাদের যতটা সহজ অ্যাক্সেস ছিল, মিঃ গুপ্তর বেলায় সেটা ছিল না।' বিশ্বজিৎ মজুমদারের গলাটা কিঞ্চিৎ আড়ষ্ট শোনাল।

'আপনি মণিময়বাবুর বাড়ির ঠিকানাটা আমাকে দিতে পারেন?'

'হ্যাঁ, এটাও দিতে পারব।'

'এবার শেষ প্রশ্ন। পার্টনার সৈকত চৌধুরির সঙ্গে মণিময়বাবুর কেমন সম্পর্ক ছিল?' আদিত্য খানিকটা সতর্কভাবে জিজ্ঞেস করল।

বিশ্বজিৎ মজুমদার চুপ করে রয়েছে। কিছু একটা বলতে চায় কিন্তু বলতে পারছে না। শেষে মৃদু গলায় বলল, 'এটা নিয়ে আমার কোনও মন্তব্য করা ঠিক হবে না।'

আদিত্য বলল, 'একবার ভেবে দেখুন। এটা একটা অস্বাভাবিক অবস্থা। যে সৈকতবাবুকে আপনারা এত ভালবাসতেন তিনি খুন হয়েছেন। আমি তাঁর খুনিকে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করছি। আমাকে একটু সাহায্য করবেন না?'

বিশ্বজিৎ মজুমদারের মুখে একটা যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে। একদিকে সৈকত চৌধুরির প্রতি তার ব্যক্তিগত টান। অন্যদিকে অফিস ম্যানেজারের প্রফেশনাল এথিক্স। খানিকটা মানসিক সংগ্রাম করার পর সে বলল, 'না, আমার আর কিছু বলার নেই।'

অনেক চেষ্টা করেও আদিত্য তাকে দিয়ে আর কিছু বলাতে পারল না।

আদিত্য যখন গুপ্ত অ্যান্ড চৌধুরি সিভিল কনস্ট্রাকশান্স-এর আপিস থেকে বেরচ্ছে তখন প্রায় পৌনে একটা।

স্টেডিয়ামের সামনে থেকে বাস ধরে উল্টোডাঙা পৌঁছতে অনেকটা সময় লেগে গেল আদিত্যর। স্টেডিয়ামের উল্টোদিকে বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই, বাস আর আসে না। অনেকক্ষণ পরে যদি বা একটা এল, তাতে এত ভিড় যে ওঠা যায় না। পরেরটা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা, এলও কিছু তাড়াতাড়ি। উল্টোডাঙার দিক থেকে যেখানে অরবিন্দ সেতু শুরু হয়েছে সেখানে একটা ভাতের হোটেল আছে। আগে

দু-একবার আদিত্য এখানে খেয়েছে। রান্না সাদামাটা, কিন্তু তেল-ঝাল নেই। এত খিদে পেয়ে গিয়েছিল, আদিত্য ঠিক করল এখানেই খেয়ে নেবে।

ভাত, ডাল, আলু-উচ্ছে-ভাজা, মাছের ঝোল দিয়ে পেট ভরে খেয়ে আদিত্যর মনে হল সে এই ভরা পেটে এখন বাসে উঠতে পারবে না। অথচ একবার বউবাজারে তার আপিসে না গেলেই নয়। কিছু কাগজপত্র সেখানে রয়ে গেছে যেগুলো বাকি রিপোর্টটা লেখার জন্যে দরকার। সাত পাঁচ ভেবে সে ট্রাম স্টপে গিয়ে দাঁড়াল। ট্রামের অনেক অসুবিধে। একে তো অনিয়মিত, তার ওপর অনেক ঘুরে ঘুরে যায়, গতিও সামান্য। কিন্তু এই মুহূর্তে সবার ওপরে শরীরটা আরাম চাইছে। আদিত্যর ভাগ্য ভাল, একটু পরেই দেখল একটা বেশ ফাঁকা ষোলো নম্বর ট্রাম হেলতে দুলতে এগিয়ে আসছে।

ট্রামে উঠে আদিত্য রাজা। জানলার ধারে সিট পেয়ে গেছে! ট্র্যাম নিজের গতিতে চলুক, আদিত্যর কোনও তাড়া নেই।

কী কী কাজ করতে হবে? আদিত্য ট্রামের জানলার ধারে বসে মনে মনে তালিকা তৈরি করছিল। মণিময় গুপ্তর বাড়িতে একবার গিয়ে খোঁজ-খবর করতে হবে। অসীম দত্ত বলে লোকটার সঙ্গে দেখা করতে হবে। অনিতার বন্ধু সমীর প্যাটেলের খোঁজে বিমলকে লাগাতে হবে। অনিতার দাদার সঙ্গেও দেখা করলে ভাল হয়। ইনশিয়োরেন্স কোম্পানির ডিটেকটিভ বিপ্লব সমাদ্দারের সঙ্গে কথা বলতে হবে। কাজ কম নয়। আর সবই অবৈতনিক। কিন্তু আদিত্য এই কেসটাতে একটা উৎসাহ পেয়ে গেছে। কিছু একটা ভেতরে ভেতরে চলছে যেটা সে ধরতে পারছে না। ব্যাপারটা সে মাঝপথে ছেড়ে যেতে পারবে না। কিন্তু পেটে কিল মেরেই বা কদিন কাজ করা যায়। এই মুহূর্তে না হলেও কমাস বাদে টাকার টান পড়বে। অবশ্য ততদিনে রিপোর্টটা পুরো জমা দেওয়া হয়ে যাবে। সরকার যদি পেমেন্টটা তাড়াতাড়ি করে দেয় তাহলে কিছুটা সুবিধে হয়। কেয়া সংসারটা চালিয়ে নেবে। কিন্তু হাতখরচ? কেয়ার কাছে হাত পাতার প্রশ্নই ওঠে না। এর মধ্যে আবার কেয়া হানিমুনের বায়না করছে। আদিত্যর হাসি পেয়ে গেল।

(২)

'চা খাবে না কফি?' কেয়া কেটলিতে জল বসাতে বসাতে বলল।

'চা-ই তো ভাল। অফিসে বসে অনেকবার কফি খেয়েছি।' আদিত্য ল্যাপটপে চোখ রেখে বলল। 'তোমার ছাত্রী দার্জিলিং থেকে সেই যে চা এনেছিল সেটা তো খাওয়াই হচ্ছে না।'

সারাদিনের মধ্যে এই সময়টা আদিত্যর খুব পছন্দ। দুজনেই কাজ থেকে ফিরে আসার পর একসঙ্গে বসে একটু চা-কফি খাওয়া আর আবোলতাবোল গল্প করা। নব্বইভাগ কথা কেয়াই বলে, অনর্গল বলে যায়। তার ইস্কুলের দিদিমণিদের গল্প, দিদিমণিদের সংসারের গল্প।

'নমিতাদির কথা মনে আছে? ইংলিশের নমিতাদি?'

'ওই যার ছেলের বিয়েতে নেমন্তন্ন খেয়ে এলাম?'

'ঠিক মনে করেছ।'

'মনে না করে উপায় আছে। যা বোর হয়েছিলাম। তুমি তো বন্ধুদের মধ্যে মিশে গেলে। আমি একেবারে একা। কারও সঙ্গে কথা বলার নেই। নদীয়া হাউসের বড় মাঠটার এক কোণে বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছি। ভাগ্যিস বিয়ে বাড়িতে অনেক লোক ছিল, তাই কেউ লক্ষ করেনি। কিন্তু আমার খালি মনে হচ্ছিল এক্ষুনি কেউ এসে বলবে, এই তুই কে রে? চুরি করে খেতে এসেছিস? ভাগ এখান থেকে।'

'আর বাড়িও না। ওরকম মোটেই হয়নি। আমি বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলছি, আমার মনে হচ্ছিল তুমি পাশেই আছ, হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে তুমি হারিয়ে গেলে। কিছুতেই তোমায় খুঁজে পাই না। তোমার সঙ্গে আমার

কলিগদের স্বামীরা অনেকে আলাপ করতে চাইছিল।'

'যাই হোক। সেদিন আমার পুরোনো বন্ধু বেদব্রত একেবারে সেভিয়ারের মতো উদয় হয়েছিল। বেদব্রতরা মেয়ের বাড়ির লোক। কন্যাযাত্রীর দলে এসেছে। বাকি সন্ধেটা অবশ্য বেদব্রতর সঙ্গে গল্প করে চমৎকার কেটে গেল। তা নমিতাদির কী হয়েছে?'

'হ্যাঁ সেটাই তো বলছি। নমিতাদির ছেলের নাকি ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে।'

'সে কী! এই তো বিয়ে হল। ছমাসও হয়নি।' আদিত্য সত্যিই শঙ্কিত।

'তাই তো বলছে সবাই। কী কারণে ডিভোর্স নমিতাদি বলছেন না। কিন্তু আমাদের লছিমা সান্যাল মেয়ের দিদিকে চেনে। তিনি নাকি লছিমাকে বলেছেন ছেলের শরীরে দোষ আছে।' কেয়া একটা ট্রেতে দু-কাপ চা আর একটা প্লেটে কিছু চিঁড়েভাজা নিয়ে এসে আদিত্যর গা ঘেঁষে বসল। আদুরে গলায় বলল, 'আমাদের ডিভোর্স হবে না, বল।'

'অন্তত যে কারণে নমিতাদির ছেলের ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে বলছ, সে কারণে হবে না।' আদিত্য কেয়ার দিকে তাকিয়ে অল্প হাসল। 'তবে তুমি যদি বল হানিমুনে না গেলে বিয়ে ভেঙে যাবে, তা হলে জানি না।'

'তুমি হানিমুনে যাবে নাই বা কেন?'

'টাকা নেই যে, কী করব?'

'টাকা তো আমি দেব, তোমার কী? এত টাকা রোজগার করছি কার জন্যে?'

'কোনও ভদ্রলোক বউ-এর পয়সায় হানিমুনে যায়?'

'তোমার বাবা অদ্ভুত ইগো। আমি আর তুমি কি আলাদা?'

আদিত্যর কাছে সত্যিই এর কোনও উত্তর নেই। সে জানে, সমস্যাটা তার অন্ত- সারশূন্য বনেদি ইগোর, একটা অন্ধ বিশ্বাসের যা নারী-পুরুষকে সমান চোখে দ্যাখে না। এদিক থেকে কেয়া তার তুলনায় অনেক আধুনিক। কেয়ার প্রশ্নের উত্তর এড়ানোর জন্য আদিত্য এখন ধীরে ধীরে কেয়ার শরীরের দখল নিয়ে নিচ্ছে।

মিনিট পাঁচেক পরে আদিত্যর ফোনটা বেজে উঠল।

'বিমল বলছি স্যার।'

'হ্যাঁ, বল।'

'কিছু খবর পেয়েছি। রবিবারে ওই বালিগঞ্জের বাড়িটায় গিয়েছিলাম।

'বেশ, বেশ। কী জানতে পারলে?'

'সিকিউরিটি ছেলেটার সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেছে। ছেলেটা আবার আমার শ্বশুরবাড়ির ওদিকে থাকে। ওর নাম ভবেশ। সে যাই হোক, ও বলল, থ্রি বি ফ্ল্যাটে অনিতা চৌধুরির সঙ্গে দেখা করতে সোম থেকে শুক্র, প্রায় প্রত্যেক দুপুরবেলা এক ছোকরা আসে। শনি রবিবার আসে না। আমি যদি সোমবার বেলা দুটোর মধ্যে ওখানে পৌঁছে যেতে পারি তাহলে হয়ত ছেলেটার দেখা পেয়ে যাব। সেই কথা অনুযায়ী আমি আজ দেড়টা নাগাদ ওখানে পৌঁছে গেলাম। ভবেশকে চা খাওয়ালাম আর দুটো বিস্কুট। চা খেতে খেতে ভবেশ বলল, তোমার লোক আজ আগেই এসে গেছে। এখন অনিতা চৌধুরির ফ্ল্যাটে রয়েছে। যখন বেরোবে তখন আমি চিনিয়ে দেব।'

'তুমি বসে রইলে?'

'বসে থাকতে তো হবেই, ভবেশের সঙ্গে বসে বসে খেজুর করলাম। আরও দুবার ওকে চা খাওয়ালাম, কিন্তু ছোকরা আর বেরোয় না। সাড়ে তিনটে বেজে গেল, চারটে বাজতে চলল, ছোকরা আর বেরোয় না। আমার ভয় হচ্ছিল কোনও ভাবে আমার চোখ এড়িয়ে ছোকরা বেরিয়ে যায়নি তো? ভবেশ অভয় দিল। বলল, একদম চিন্তা কোরো না। ও বেরোয়নি আমি জানি। কিন্তু একটা কথা বল। ওই ছোকরাকে তুমি খুঁজছ

কেন? পুলিশও তো ওর খোঁজ করছিল। ব্যাপারটা কী? অনিতা চৌধুরির ফ্ল্যাটেই তো আবার দুদিন আগে একটা খুন হয়েছে।

'আমি বললাম, পুলিশ ওকে কেন খুঁজছে বলতে পারব না। তবে আমি কেন খুঁজছি বলতে পারি। আমি রাত্তিরে তোমার মতো সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি করি। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে দিনেরবেলা ছোটখাটো টিকটিকির কাজও করি। ওই ছোকরা আমার মক্কেলের কাছ থেকে অনেক টাকা ধার করে শোধ দিচ্ছে না। আমার মক্কেল বলেছে, লোকটা সারাদিন কোথায় যায়, কী করে লোকটাকে ফলো করে এটা জানতে। আমি সেটাই করছি।'

'ভবেশ বলল, লোকটা যে এখানে আসে জানলে কী করে?' আমি বললাম, 'আমার মক্কেলই বলে দিয়েছে।

বিমলের এই দীর্ঘ সংলাপের মাঝে, আদিত্য খেয়াল করেনি, কেয়া কখন উঠে গেছে। এবার রান্নাঘর থেকে তার গলা শোনা গেল, 'আর একটু চা খাবে নাকি?'

অনর্থক প্রশ্ন। আদিত্য আজ অবধি চায়ে কখনও না বলেনি। কেয়াও সেটা জানে, তাই আদিত্যর উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে দু-কাপ চা নিয়ে ফিরে এসেছে। আদিত্য চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে টেলিফোনে বিমলকে বলল, 'তারপর?'

'সোয়া চারটে নাগাদ, স্যার, লোকটা বেরোল। খুব বেশি বয়েস নয়। পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। ফরসা, ছোটখাটো, লাল্টু চেহারা। একটু মেয়েলি। বাড়ির গেট থেকে বেরিয়ে ছোকরা হনহন করে বালিগঞ্জ স্টেশনের দিকে হাঁটা লাগাল। আমি পেছন পেছন। স্টেশনের কাছে অনেকগুলো ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল। লোকটা তার একটাতে উঠে পড়ল। আমি ফাঁপরে পড়লাম। লোকটাকে ফলো করতে গেলে আমাকেও একটা ট্যাক্সি নিতে হয়। কিন্তু পকেটে খুব বেশি টাকা নেই। লোকটা কতদূর যাবে কে জানে? বেশি দূরে যেতে হলে আমার পকেটের টাকায় কুলোবে না। আমি তাও জয় মা বলে আর একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়লাম। ভাবলাম মিটারের দিকে নজর রাখব। আমার পকেটের টাকায় যত দূর যাওয়া যায় যাব। তারপর নেমে পড়তে হবে। হয়ত তার আগেই লোকটা তার যাবার জায়গায় পৌঁছে যাবে। আমার ট্যাক্সিটাকে বললাম, সামনের ট্যাক্সিটাকে ফলো করো।

'আমার ভয় ছিল ছোকরা বাইপাস না ধরে। তাহলেই হুহু করে মিটার উঠবে। ভাগ্য ভাল, সেদিকে না গিয়ে সামনের ট্যাক্সিটা বালিগঞ্জ ফাঁড়ি হয়ে, পার্ক সার্কাস-বেগবাগান হয়ে, শেক্সপিয়ার সরণি ধরে এসে রাসেল স্ট্রিটে বাঁক নিল। আমি মিটারের দিকে তাকিয়ে আছি আর ঘামছি। কিছুক্ষণ পরে পার্ক স্ট্রিটের একটা বিখ্যাত বারের সামনে এসে ট্যাক্সিটা থামল। ছোকরা ট্যাক্সিটাকে ছেড়ে দিয়ে বারের ভেতর ঢুকল। আমিও আমার ট্যাক্সিটাকে ছেড়ে দিলাম। মা কালীর দয়ায় ভাড়ার পয়সা কুলিয়ে গেছে।'

'তুমি কি বারের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে?'

'আর কী করব? ভেতরে যাবার পয়সা তো আর নেই, তাছাড়া আমার মতো জামাকাপড় পরে গেলে ওইসব জায়গায় ঢুকতেই দেবে না। আমি বারটার উল্টোদিকে একটা চায়ের দোকানে বসে চা খেলাম। একটু এদিক ওদিক রাস্তায় পায়চারি করলাম। আবার একবার চা খেলাম। এমনি করে ঘণ্টাখানেক কেটে গেল।'

'তারপর?'

'তারপর একসময় ছোকরা বার থেকে বেরোল। সঙ্গে আর একটা লোক। এই সঙ্গের লোকটার ষণ্ডামার্কা চেহারা, বছর চল্লিশ বয়েস, দেখলেই মনে হয় লোকটা ভাল নয়। রাস্তার এপার থেকে আমি ওদের বেশ কয়েকটা ছবি তুললাম। তারপর রাস্তা পেরিয়ে ওদের কাছাকাছি হাঁটতে লাগলাম। যদি আড়ি পেতে ওদের কথা কিছু শোনা যায়। শুনতে পেলাম আমাদের ওই ছোকরা তার সঙ্গের লোকটাকে বলছে, আমাকে এখন এজরা স্ট্রিটের দোকানে গিয়ে বসতে হবে। নতুন কিছু হলে আমি আপনাকে খবর দেব। এইটুকু শুনে ঠিক

করলাম আজ এই পর্যন্ত থাক। আমাকেও তো কাজে যেতে হবে। এখন কাজের জায়গা থেকেই আপনাকে ফোন করছি।'

'খুব ভাল কাজ করেছ।' আদিত্য বলল। 'দুটো জিনিস বলছি। এক, তোমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ডিটেলটা আমার কাছে আছে। আমি ওটাতে এক্ষুনি পাঁচ হাজার টাকা ট্রান্সফার করে দিচ্ছি। আগেই দেওয়া উচিত ছিল। তুমি এখন থেকে পকেটে একটু বেশি করে পয়সা রেখো। পাঁচ হাজারের বেশি দেবার ক্ষমতা এখন আমার নেই।'

'ছি, ছি। একি বলছেন স্যার। আপনি টাকা পরে দিলেও চলবে।'

'নাও, ঢের হয়েছে। আর ভদ্রতা করতে হবে না। তোমার টাকাপয়সার অবস্থা আমি জানি না নাকি? আচ্ছা, আর দু-নম্বর কথা হল, ছবিগুলো এক্ষুনি তুমি আমাকে হোয়াটস অ্যাপ করে দাও।'

'এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি স্যার।'

মোবাইলটা নামিয়ে রেখে আদিত্য ভাবছিল, নিজের গাঁটের পয়সা খরচা করে সে অনিতা চৌধুরির কেসটা নিয়ে লড়ে যাচ্ছে কেন? ইন্টেলেকচুয়াল স্যাটিসফ্যাকশান ছাড়া আর কোনও কারণ সে খুঁজে পেল না। সে নিশ্চিত এই কেসটাতে একটা গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে। তার আকর্ষণ এড়িয়ে যাওয়া আদিত্যর পক্ষে অসম্ভব।

মোবাইলে টুং টাং শব্দ শুনে আদিত্য টের পেল বিমল ছবিগুলো পাঠিয়ে দিয়েছে। দুজন পুরুষের চার-পাঁচটা ছবি। দুজনেই ফরসা। একজন ছোটখাটো, রোগা। এ-ই নিশ্চয় সমীর প্যাটেল। অন্যজন লম্বা, বলিষ্ঠ। মুখে একটা নিষ্ঠুরতা আছে। বিমল ঠিকই বলেছিল, লোকটা মনে হয় ভাল নয়।

লম্বা লোকটার ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আদিত্যর মনে হচ্ছিল লোকটাকে সে যেন আগে কোথাও দেখেছে।

নটা নাগাদ কেয়া খাবার গরম করছিল। এটা আদিত্যর কাছে একটা সংকেত। কেয়া খাবার গরম করছে মানে এবার মোড়ের দোকান থেকে রুটি আনতে হবে। পাঞ্জাবিটা গায়ে গলিয়ে সে বেরিয়ে পড়তে যাচ্ছে, হঠাৎ কী মনে করে বসে পড়ল। মোবাইলটা তুলে খুঁজে খুঁজে সাব ইন্সপেক্টার অচিন্ত্য সাহার নম্বরটা লাগাল।

'বলুন স্যার।' অচিন্ত্য সাহার গলাটা মোটামুটি আন্তরিকই শোনাচ্ছে।

'একটু রাত্তির হয়ে গেল অচিন্ত্যবাবু, এখন কথা বলতে অসুবিধে নেই তো?'

'কোথায় রাত্তির? আমি তো এখনও থানাতেই আছি। বলুন কী ব্যাপার।'

'মণিময় গুপ্তকে মনে আছে? সৈকত চৌধুরির পার্টনার। আপনারা কি ভাল করে তার খোঁজ করেছিলেন?'

'তিনি তো বিদেশে। কোথায় তাও জানা নেই। কী করে খোঁজ নেব?'

'সত্যিই তিনি বিদেশে কিনা যাচাই করে দেখা দরকার। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে মণিময়বাবুর কলকাতার বাড়িতে যাওয়া দরকার। সেখানে গেলে হয়তো তিনি এখন কোথায় আছেন তার একটা হদিশ পাওয়া যেতে পারে। আপনারা কি কখনও মণিময়বাবুর বাড়িতে খোঁজ করেছিলেন?'

'সত্যি বলতে কি, মণিময়বাবুর বাড়িতে আমাদের এখনও যাওয়া হয়নি। আপনি বলাতে এখন মনে হচ্ছে একবার যাওয়া উচিত ছিল।' অচিন্ত্য সাহার গলায় দোষ স্বীকারের সুর। 'আসলে, আপনাকে বলা হয়নি, কিছুদিন ধরে আমরা অ্যানোনিমাস চিঠি পাচ্ছি। চিঠির বক্তব্য, মণিময় গুপ্তর কিছু একটা সাংঘাতিক বিপদ ঘটেছে। আমরা যেন খোঁজ নিয়ে দেখি। সবসুদ্ধু তিনটে চিঠি এসেছে। টাইপ করা চিঠি। কারও নাম নেই।'

'তাহলে তো যাবার যথেষ্ট কারণ আছে। কবে যেতে পারবেন? আপনারা গেলে আমিও সঙ্গে যেতে চাই। যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় তত ভাল।'

'কাল পরশু তো হবে না স্যার। দুটো কোর্ট কেসে হাজিরা দিতে হবে। তার পরের দিন চলুন না। বাড়িটা কোথায় জানেন?'

'বাড়িটা আমি যতদূর জানি লেক মার্কেটের পেছন দিকে কোথাও একটা। আমার কাছে ঠিকানাটা আছে।'

'তাহলে পরশুদিনের পরের দিন সকালেই যাওয়া যাক। আমি ইতিমধ্যে একটা সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে রাখব। বলা যায় না, কাজে লেগে যেতে পারে। ঠিকানাটা পরে বসিয়ে নিলেই হবে। সকাল দশটা নাগাদ আপনি থানায় চলে এলে আমরা একটা জিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারব।'

'খুব ভাল, খুব ভাল। আমি তাহলে পরশুদিনের পরের দিন অর্থাৎ বেস্পতিবার সকাল দশটার মধ্যে গড়িয়াহাট থানায় পৌঁছে যাচ্ছি।'

(৩)

আদিত্য ভাবছিল। এই মুহূর্তে কী কী কাজ তার হাতে আছে? সেই বিরক্তিকর সরকারি রিপোর্টের বাকি অংশটা লেখা শেষ হয়েছে। আজ সকালে সেটা মেল করে দিয়েছে সে। সই করে একটা হার্ড কপিও পরে কুরিয়রে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। ওই কাজটা আপিসে পৌঁছে করতে হবে। তা ছাড়া তার হাতে আর কোনও কাজ নেই। অন্য কোনও কেসও নেই হাতে। তাই আপাতত সৈকত চৌধুরির কেসটা নিয়ে কিছুটা এগোনো যেতে পারে।

আগামী বৃহস্পতিবারের আগে মণিময় গুপ্তর খোঁজে যাওয়া হচ্ছে না। এর মধ্যে হাতে দুটো দিন রয়েছে। কন্ট্রাক্টার অসীম দত্তর সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে। অনিতা চৌধুরির বাবা এবং দাদার সঙ্গেও দেখা করতে পারলে হত। ইনশিয়োরেন্স কোম্পানির ডিটেকটিভ বিপ্লব সমাদ্দারের সঙ্গেও একবার কথা বললে মন্দ হয় না।

কেয়া আজ একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেছে। মেয়েদের বাবা-মায়েদের সঙ্গে মিটিং। পেরেন্ট-টিচার মিট। আগে কেয়াদের ইস্কুলে এসব ছিল না। আজকাল ইংরেজি ইস্কুলের দেখাদেখি কেয়াদের বাংলা ইস্কুলেও চালু হয়েছে। প্রতি তিন মাসে একবার। তবে অ্যানুয়ালের রেজাল্ট বেরোনোর পর ফেল করা ছাত্রীদের বাড়ির লোকেরা এসে প্রোমোশনের জন্যে ধরাধরিটা আলাদা। সেটা তো অনন্তকাল থেকেই চলে আসছে।

সাড়ে দশটা বেজে গেছে। আদিত্যর বেরোনোর তাড়া নেই। সে কফির জল বসিয়ে সিগারেট ধরাল। ল্যাপটপে বুধাদিত্য মুখোপাধ্যায়ের শুদ্ধ সারং লাগাল। তারপর জুত করে কফি-সিগারেট খেতে খেতে ভাবতে লাগল কোন কাজটা আগে করবে? খানিকটা ভাবার পর সে ঠিক করল অসীম দত্তর সঙ্গেই সবার আগে যোগাযোগ করবে।

অসীম দত্তর ফোনটা ল্যান্ডলাইন, সরাসরি নয়, সম্ভবত রিসেপশানের। যান্ত্রিক গলা তাকে অপেক্ষা করতে বলার পর যে শ্রুতিকটূ জগঝম্প বাজনাটা বেজেই চলল সেটা আদিত্যকে বিশেষভাবে কষ্ট দিচ্ছিল কারণ তার মাথার মধ্যে তখনও শুদ্ধ সারং বাজছে। একটু পরে মনে হয় রিসেপশনের মেয়েটির দয়া হল। নকল গলায় মার্কিনি উচ্চারণ অনুকরণ করে সে বলল, 'এইস বিল্ডার্স, মে আই হেল্প ইউ?' 'এইস' কথাটা সে একটু টেনে উচ্চারণ করেছিল যাতে কেউ ইংরেজি অক্ষর 'এস'-এর সঙ্গে গুলিয়ে না ফেলে।

আদিত্য ঠিক করে নিয়েছে কী বলবে। সে যদি বলে সে একজন বেসরকারি গোয়েন্দা, সৈকত চৌধুরি খুনের ব্যাপারে অসীম দত্তর সঙ্গে কথা বলতে চায়, তা হলে খুব সম্ভবত রিসেপশানিস্ট মেয়েটি তাকে ভাগিয়ে দেবে।

তাই সে গম্ভীর পুলিশি গলায় বলল, 'অসীম দত্তকে ফোনটা দিন। বলুন, সৈকত চৌধুরি খুনের কেসটার ইনভেস্টিগেশানের ব্যাপারে আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

কথাগুলো মিথ্যে নয়, তবে মেয়েটিকে যে ধারণা দেওয়া হল আদিত্য পুলিশের লোক, সেটা, বলাই বাহুল্য, অসত্য।

'মিঃ দত্ত তো এখনও অফিসে আসেননি।' মেয়েটি মিনমিন করে বলল। তার আসল গলাটা এবার বেরিয়ে পড়েছে।

'উনি কখন অফিসে আসেন?' আদিত্যর গলায় প্রায় হুঙ্কার।

'সাধারণত বারোটা সাড়ে বারোটার আগে আসেন না।' মেয়েটি কুণ্ঠিতভাবে বলল।

'অসীম দত্তর বাড়ির ফোন নম্বরটা দিন।' আদিত্য আদেশের ভঙ্গিতে বলল।

'ল্যান্ডলাইনটা দিচ্ছি স্যার। মোবাইলটা ওঁকে না জিজ্ঞেস করে দেওয়ার অর্ডার নেই।'

'তাই দিন।'

ফোনটা রেখে দিয়ে আদিত্য দেখল এগারোটা বেজে পাঁচ মিনিট। মনে হয়, অসীম দত্ত এখনও বাড়ি থেকে বেরোয়নি। একবার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে ওকে বাড়িতে পাওয়া যায় কিনা।

অসীম দত্তর বাড়ির ফোনটা ধরলেন এক মহিলা। জানালেন, অসীমবাবু স্নানে ঢুকেছেন, মিনিট পনেরো বাদে ফোন করলে তাঁকে পাওয়া যেতে পারে। মাঝবয়সি, কেজো গলা। মনে হয় না বাড়ির লোক। হয়তো নার্স কিংবা অসীম দত্তর সেক্রেটারি।

এখন অপেক্ষা করতে হবে। আদিত্য আবার কফির জল চাপাল। আবার সিগারেট। গান। এবার কিশোরী আমোনকরের গুণকেলি। বেশিক্ষণ দেরি করাও যাবে না। ভদ্রলোক বেরিয়ে যেতে পারেন। আদিত্য গান বন্ধ করে সতেরো মিনিটের মাথায় আবার ফোন করল। এবার টেলিফোনের ওপার থেকে পুরুষকণ্ঠে শোনা গেল, 'হ্যালো?'

সেই সম্ভাষণে একটা জিজ্ঞাসা ছিল, যেন জানতে চাওয়া হচ্ছে, আপনি কে কথা বলছেন?

আদিত্য বিনীতভাবে বলল, 'আমি কি অসীম দত্তর সঙ্গে কথা বলছি?'

'আমি অসীম দত্ত। আপনি কে বলছেন?' গলার আওয়াজে একটা প্রচ্ছন্ন বিরক্তির ভাব।

'আমি একজন বেসরকারি গোয়েন্দা। অনিতা চৌধুরির অনুরোধে তার স্বামী সৈকত চৌধুরির খুনের কেসটা ইনভেস্টিগেট করছি। আপনি কি আমাকে মিনিট পনেরো সময় দিতে পারেন, কয়েকটা প্রশ্ন করতাম।'

'দেখুন, মশাই, আপনার নামটা আমি জানি না, তবে এটুকু পরিষ্কার করে বলতে চাই যে আমি খুব ব্যস্ত লোক। বেসরকারি গোয়েন্দাদের সময় দেবার মতো অবসর আমার হাতে নেই। তাছাড়া এ-ব্যাপারে পুলিশ তো কখনও কিছু আমাকে জিজ্ঞেস করেনি! আপনি হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হলেন। সরি, আপনাকে আমি সময়-টময় দিতে পারব না।' অসীম দত্তর বিরক্তিটা এখন আর প্রচ্ছন্ন নেই।

অসীম দত্ত বোধহয় ফোনটা রেখেই দিতে যাচ্ছিল, আদিত্য তার আগেই কড়া গলায় বলল, 'শুনুন অসীমবাবু। আমার নাম আদিত্য মজুমদার। আমার সঙ্গে পুলিশের বিশেষ সদ্ভাব আছে। আছে কিনা আপনি খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন। আপনি যদি আমাকে সময় না দেন, আমি পুলিশ নিয়ে আপনার অফিসে উপস্থিত হব। হয়তো দু-একদিন দেরি হবে। তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন পুলিশ নিয়ে আপনার অফিসে আমি যাবই। সেটা কিন্তু আপনার বা আপনার কম্পানির পক্ষে খুব ভাল বিজ্ঞাপন হবে না। এবার আপনিই বলুন কী করবেন।'

'আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন? এই অসীম দত্ত অনেক ঘাটের জল খেয়েছে। আপনার মতো দু-পয়সার বেসরকারি গোয়েন্দা আমার অনেক দেখা আছে। আপনি জাহান্নমে যেতে পারেন। আর হ্যাঁ, আমার সমস্ত টেলিফোন-কনভার্সেশন টেপ করা হয়। এটিও হয়েছে। আমি এটা পুলিশকে পাঠিয়ে দিয়ে বলব আপনি একজন ফ্রড। পুলিশের নাম করে আমাকে হ্যারাস করছেন।' অসীম দত্ত খট করে ফোনটা নামিয়ে রাখল।

অসীম দত্তর কাছ থেকে আদিত্য ঠিক এই রকম প্রতিক্রিয়া আশা করেনি। সে মোবাইলটা টেবিলে রেখে গভীরভাবে ভাবছিল। কোনও সন্দেহ নেই, অসীম দত্ত প্রবল স্নায়ুচাপে রয়েছে। না হলে প্রায় অকারণে অতটা টেনস হয়ে উঠত না। তাছাড়া তার কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে সে তার প্রতিটি টেলিফোন কল

রেকর্ড করে রাখছে। কেন এই সাবধানতা? কোনও সুস্থ স্বাভাবিক লোক তো এটা করবে না! অসীম দত্ত কি তা হলে কোনও কারণে ভয়ে ভয়ে আছে?

দুপুরটা নানারকম টুকিটাকি কাজ করতে করতে কেটে গেল। রিপোর্টটা কুরিয়ার করতে কিছু সময় লাগল। চাঁদনি থেকে ল্যাপটপের জন্য দুটো ছোট স্পিকার কেনার ছিল, সেটাও কেনা হল। আপিসে ফিরে আদিত্য যখন লাঞ্চ খাবার জন্য টিপিন বাক্স খুলেছে, তখন সাড়ে তিনটে বেজে গেছে।

রত্না ফোন করেছিল। আজ কী একটা মুসলিম পরবের জন্য ওদের কলেজ বন্ধ। তাই সারা দুপুরটা কাজ নেই। বলল, অনিতা শর্মার খোঁজ নিয়েছে। ওর বন্ধু অভিজিৎ ঘোষের অনিতা শর্মাকে মনে আছে। সম্ভবত সুন্দরী বলে (এটা অবশ্য রত্নার সংযোজন)। খুব কনজারভেটিভ বাড়ির মেয়ে। বাড়ির গাড়িতে যাতায়াত করত। কয়েকজন ছেলের নজর ছিল ওর ওপরে। তার মধ্যে একজন একটু এগিয়েছিল। তারপর একদিন অনিতার দাদা এসে ছেলেটাকে প্রচণ্ড ধমকেছিল। বোধহয় মারধোরও করেছিল। এই নিয়ে যে সেই সময় কলেজে একটা অশান্তি হয়েছিল, এইটুকুই অভিজিৎ ঘোষের মনে আছে। আর কিছু মনে নেই।

রত্নার পর বিমল ফোন করল। জানতে চায় তাকে আর কিছু করতে হবে কিনা।

আদিত্য বলল, 'এই মুহূর্তে তোমাকে কিছু করতে হবে না। তবে যে ছেলেটাকে তুমি জামির লেন থেকে ফলো করে পার্ক স্ট্রিটে গেলে সেই ছেলেটার নাম সমীর প্যাটেল। নামটা মনে রেখো, পরে কাজে লাগতে পারে।'

কেয়া ফোন করল সোয়া চারটের সময়, কোচিং ক্লাসে ঢোকার আগে যেমন রোজ করে।

মাঝখানে আদিত্যর অফিস বিল্ডিং-এর সিকিউরিটি শ্যামল এসে ইনিয়ে বিনিয়ে গল্প করে গেছে। সকলেই বোধহয় ভাবে আদিত্যর কোনও কাজ নেই তাই তার খানিকটা সময় নষ্ট করা যেতেই পারে। তারপর সেই ফোনটা এল। তখন প্রায় পাঁচটা বাজে।

'আদিত্যবাবু আমি অসীম দত্ত বলছি। আপনার সঙ্গে সকালে খুব খারাপ ব্যবহার করেছি, তাই ক্ষমা চাইছি। আমার মাথার ঠিক ছিল না। আমি সত্যিই খুব স্ট্রেস-এর মধ্যে আছি। আপনি কবে আমার সঙ্গে দেখা করতে চান বলুন। আজ বললে আজই দেখা হতে পারে। আসলে আমাকে আপনার যতটা দরকার তার থেকে অনেক বেশি আমার দরকার আপনাকে।'

আদিত্য খুব তাড়াতাড়ি ভাবছিল। নিশ্চয় সকালে আদিত্য ফোন করার পর অসীম দত্ত তার সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিয়েছে। ফলে তার সুর নরম। কিন্তু অসীম দত্তর শেষ কথাগুলো আদিত্য ঠিক বুঝতে পারল না। তাকে অসীম দত্তর কেন দরকার? সে বলল, 'আপনি যে চাপের মধ্যে রয়েছেন সেটা আমি বুঝতে পারছিলাম। আমি কিছু মনে করিনি। কোথায় গেলে আপনাকে পাব?'

'আমার বাড়িতে আসাই সব থেকে ভাল। আমি একাই থাকি। আমার সেক্রেটারি মহিলা সন্ধে ছটায় চলে যায়। তারপর বাড়িতে শুধু আমি আর আমার পুরোনো চাকর সুবল। সুবল খুব বিশ্বাসী। বাড়িতে আর কেউ থাকবে না। আজ আসতে পারবেন? সন্ধে ছটার পরে?' অসীম দত্তর গলায় অসীম ব্যগ্রতা।

'আপনার বাড়িটা কোথায়?'

'বালিগঞ্জ সারকুলার রোডে, সেন্ট লরেন্স স্কুলের পাশে। আমি ঠিকানাটা বলছি আপনি লিখে নিন।'

ঠিকানাটা লিখতে লিখতে আদিত্য বলল, 'ঠিক আছে। আমি আজই সাড়ে ছটা নাগাদ আপনার বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছি।'

কেয়ার আজ ফিরতে দেরি হবে, আটটা অব্দি টানা কোচিং ক্লাস। তারও যে ফিরতে দেরি হবে এই মর্মে কেয়াকে একটা মেসেজ করে দিয়ে আদিত্য পৌনে ছটা নাগাদ আপিস থেকে বেরিয়ে পড়ল। ভেবেছিল

সাড়ে ছটার আগেই অসীম দত্তর বাড়ি পৌঁছে যাবে। বিবাদী বাগ থেকে দক্ষিণে যাবার একটা মিনিবাস আছে যেটা বালিগঞ্জ সারকুলার রোড দিয়ে যায়। গুমটিতে পৌঁছে আদিত্য দেখে সেই বাসের সামনে আপিসফেরতাদের লম্বা লাইন। হওয়াটাই স্বাভাবিক, একটু আগেই বিবাদী বাগ পাড়ায় আপিস ছুটি হয়েছে। আদিত্যের এটা মাথায় ছিল না। সে বেজার মুখে লাইনের শেষে গিয়ে দাঁড়াল। লাইনের দৈর্ঘ্য দেখে মনে হচ্ছে না তিন-চারটে বাসের আগে তার জায়গা হবে। বাস গুমটিতে চিনেবাদাম বিক্রি হচ্ছে। আদিত্য তাই এক প্যাকেট কিনে খানিকক্ষণ চিবোল। তখনও সে লাইনের মাঝখানে।

একটা লোক ম্যাগাজিন বিক্রি করছে। ম্যাগাজিনগুলো তিন-চার সপ্তাহের পুরোনো, তাই অর্ধেকেরও কম দাম। আদিত্য একটা ইংরেজি মাসিকপত্র কিনে তার পাতা ওল্টাতে লাগল। একটা লেখায় চোখ আটকে গেল তার। লেখকের নাম অর্ণব ব্যানার্জী। এর কথাই তো সায়ন্তন বলছিল। এর বাংলা লেখা আদিত্য পড়েছে। ছেলেটা তা হলে ইংরেজিতেও লেখে। এই ইংরেজি মাসিকপত্রটা সায়ন্তনদের হাউসের। সেখানে অর্ণব লিখবে এটা তো স্বাভাবিক।

আদিত্য মন দিয়ে অর্ণবের লেখাটা পড়ছিল। সম্প্রতি কলকাতা পুলিশ ট্যাংরায় একটা জাল ওষুধের চক্র ধরে ফেলেছে, তাই নিয়ে রিপোর্টিং। মানতেই হবে ছেলেটার লেখার হাত আছে। প্রায় থ্রিলারের মতো আগাগোড়া উত্তেজনা ধরে রেখেছে। বোঝা যায় নিজেও বারবার মাঠে নেমে ইনভেস্টিগেট করেছে। না হলে এতটা ডিটেলে লিখতে পারত না। আদিত্য লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে লেখাটা পড়ে ফেলল। লেখাটা পড়া হয়ে যাবার পর চোখ তুলে দেখল লাইনে তার সামনে আর মাত্র তিন চারটে লোক। তার মানে, পরের বাসটাতে শুধু জায়গা পাবে তাই নয়, বসতেও পারবে। আদিত্যর ভাগ্যটা সত্যিই ভাল যাচ্ছে। রাইটার্সের দিক থেকে একটা ফাঁকা বাস গুমটিতে ঢুকছে।

আদিত্যর দেরি হচ্ছে দেখে অসীম দত্ত ফোন করে ফেলেছিলেন। আদিত্য তখনও বাসে। শেষে যখন আদিত্য তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছল তখন প্রায় সাতটা বাজে।

বাড়িটা দশতলা। অসীম দত্ত তিনতলার একটা ফ্ল্যাটে থাকেন। অন্তত দু-হাজার স্কোয়ার ফিটের বিলাসবহুল ফ্ল্যাট। ঢুকেই আদিত্যর মনে হল গৃহস্বামীর অর্থ আছে এটা পরিষ্কার, কিন্তু তার সঙ্গে খানিকটা রুচিবোধও আছে।

বেল বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে বেশ বলিষ্ঠ চেহারার এক ব্যক্তি দরজা খুলে আদিত্যকে বসিয়েছে। আদিত্য আন্দাজ করল এ-ই সুবল, অসীম দত্তর পুরোনো ভৃত্য। একটু পরেই অসীম দত্ত বসার ঘরে ঢুকলেন। টকটকে গৌরবর্ণ, তীক্ষ্ন নাক, চোখের মণি ঈষৎ কটা, রগের চুলে পাক ধরেছে। দেখে মনে হয় বয়েস ষাট পেরিয়ে গেছে। আদিত্যর মনে হল, ইনি পুরোনো কলকাতার বণিক সম্প্রদায়ের মানুষ, বাঙালিদের এত ফরসা রং একমাত্র ওই সম্প্রদায়ের মধ্যেই সাধারণত দেখা যায়।

'বসুন, বসুন। চা খাবেন তো?' ভদ্রলোকের উচ্চারণে যে পুরোনো উত্তর কলকাতার টান আছে সেটা টেলিফোনে কথা বলার সময়ই আদিত্য খেয়াল করেছিল।

'একটু চা খেতে পারি।' আদিত্যর সত্যিই চা তেষ্টা পাচ্ছিল।

'সুবল, আমাদের চা দাও।' অসীম দত্ত গলা তুলে বললেন।

'আমার কিন্তু দুধ-চিনি ছাড়া শুধু লিকার।' আদিত্য একটু কুণ্ঠিতভাবে বলল।

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। সুবল আলাদা করে লিকার-দুধ-চিনি নিয়ে আসবে। আমরা পছন্দমতো মিশিয়ে নেব। সকালে আপনি যখন ফোন করলেন, কী আর বলব, আপনার নামটাই আমি মিস করে গিয়েছিলাম। অথচ আপনি বললে বিশ্বাস করবেন না, কিছুদিন ধরে আমি আপনার সঙ্গেই যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। বিকেলে বাড়ি ফিরে যখন টেলিফোনে কথাবার্তার রেকর্ডগুলো চালালাম তখনই খেয়াল করলাম আদিত্য

মজুমদার নিজে আমাকে ফোন করেছিলেন। আমি আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার জন্য আবার ক্ষমা চাইছি।'

'আরে ও প্রসঙ্গ তো মিটে গেছে। আপনি এখন বলুন কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলেন।'

অসীম দত্ত উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ঠেলাগাড়িতে চা-জলখাবার নিয়ে সুবল এসে গেছে। একটি প্লেটে পেস্ট্রি, কিছু স্যান্ডউইচ, কাজু। সুবল চা ঢেলে দিল। চমৎকার দার্জিলিং।

'আগে খেয়ে নিন, তারপর বলছি।' অসীম দত্ত নিজের চায়ে দুধ-চিনি মেশালেন।

'আপনি বলতে থাকুন না, আমি খেতে খেতে শুনছি।' আদিত্য স্যান্ডউইচে কামড় বসাল। তার বেশ খিদে পেয়ে গেছে।

'কিছুদিন আগে কেউ আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল। নেহাত কপাল জোরে বেঁচে গেছি। আমার স্থির বিশ্বাস খুনি আবার আমাকে খুন করার চেষ্টা করবে। আদিত্যবাবু, আমার প্রোটেকশনের জন্য আমি আপনাকে নিয়োগ করতে চাই। পুলিশ মহলে আমার চেনা কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সকলেই আপনার নাম রেকমেন্ড করেছে। আপনি আমাকে বাঁচান।' অসীম দত্তর থমথমে গলাটা শেষের দিকে প্রায় কান্নায় ভেঙে পড়ল।

এই রকম একটা প্রস্তাবের জন্য আদিত্য একেবারেই তৈরি ছিল না। সে মুখের স্যান্ডউইচটা কোনওরকমে গলাধঃকরণ করে চায়ের কাপে একটা লম্বা চুমুক দিল। আসলে সে এইভাবে খানিকটা চিন্তা করার সময় তৈরি করে নিচ্ছিল।

চায়ের কাপটা টেবিলে ধীরেসুস্থে নামিয়ে রেখে আদিত্য বলল, 'পুরো ঘটনাটা না শুনলে আমি কিছু বলতে পারছি না। আপনি আগে একেবারে গোড়া থেকে ঘটনাটা বলুন।'

'মাস দেড়েক আগেকার ঘটনা। একটা ছুটির দিন ছিল সেটা। আমার অফিস বন্ধ ছিল। আমি সকালটা ক্লাবে গিয়ে ব্রিজ খেলছিলাম। ক্লাবে আমাদের একটা দল আছে, সাধারণত আমরা ছুটির দিনগুলো সকালে একটু তাস খেলি। বেলা একটা নাগাদ খেলা শেষ হল, আমার বন্ধুরা একে একে বাড়ি চলে গেল। আমার তো বাড়িতে কেউ নেই। আমার স্ত্রী অনেক দিন আগে মারা গেছেন। স্ত্রী মারা যাবার পর আমি একা একাই থাকি। কোথায় ফিরব? তাই ছুটির দিনগুলোতে আমি ক্লাবেই লাঞ্চটা খেয়ে নিই। সেদিনও তাই নিলাম। খাবার পর আরাম কেদারায় বসে খবর কাগজ পড়তে পড়তে ঘুম এসে গেল। খানিকটা ঘুমিয়েও নিলাম।'

'আপনি বললেন, স্ত্রীর মৃত্যুর পরে আপনি একা হয়ে গেছেন। আপনার ছেলেমেয়ে নেই?' আদিত্য প্রশ্ন করল।

'আছে। ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতনি সবই আছে। যখন ছেলেমেয়েরা ছোট ছিল, তারা আমার সঙ্গে থাকত। এখন তো তারা বড় হয়ে গেছে। কেউ আমার সঙ্গে থাকে না। রোজ যে তাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে এমনও নয়।' অসীম দত্ত কিছুটা বিষণ্ণভাবে বললেন।

'ঠিক আছে। আপনি বলুন তারপর কী হল।'

'সময়টা ঠিক মনে নেই, সাড়ে তিনটে চারটে নাগাদ আমি বাড়ি ফিরলাম। ফিরলাম মানে, বাড়ির মেন এন্ট্রান্স, যেখান দিয়ে ঢুকে লিফটে উঠতে হয়, আমার ড্রাইভার সেখানে আমাকে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে পার্কিং করতে চলে গেল। বাড়ির বেসমেন্ট-এ আমাদের পার্কিং। আমি গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির ভিতর ঢুকতে যাব এমন সময় একটু দূর থেকে একটা হালকা শব্দ শুনলাম, যেন একটা গাড়ি ব্যাকফায়ার করছে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বুকের বাঁ দিকে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা অনুভব করে মাটিতে পড়ে গেলাম।

'পড়ে গিয়ে আমি কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। আর কোনও কারণে নয়, স্রেফ শকে। তাছাড়া পড়ে যাবার জন্য হাতেও চোট লেগেছিল। আমাকে পড়ে যেতে দেখে গেটের দুজন সিকিউরিটি ছুটে এল। শব্দটা তারাও শুনেছে। আমাদের বাড়ির ইলেক্ট্রিশিয়ান কাছাকাছি ছিল, সেও ছুটে এল। মুখে জলের

ঝাপটা দিতে কিছুক্ষণ পরে আমার জ্ঞান ফিরে এল। তিনজনে ধরাধরি করে আমাকে একটা চেয়ারে বসাল। আমি দেখলাম আমার বাঁ দিকের বুক পকেটে, যেখানে আমি মোবাইলটা রাখি, সেখানে একটা ছোট বন্দুকের গুলি আটকে আছে। গুলিটা মোবাইল ভেদ করে যেতে পারেনি, তবে মোবাইলটাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। কেউ আমাকে খুন করার জন্য গুলি করেছিল, নেহাত কপাল জোরে আমি বেঁচে গেছি। আমার বন্ধুরা আমাকে বুক পকেটে মোবাইল রাখতে বারণ করত। ওতে নাকি হার্টের ক্ষতি হয়। অথচ ওই বুক পকেটে রাখা মোবাইলই আমাকে বাঁচিয়ে দিল।'

অসীম দত্ত থামলেন। সেই দিনের স্মৃতি যেন তাকে এখনও ভয় দেখাচ্ছে।

আদিত্য বলল, 'আপনার মোবাইলটা কি মেটালের?'

অসীম দত্ত আদিত্যর প্রশ্নটার তাৎপর্য বুঝতে পারলেন। বললেন, 'মোবাইলটা মেটালের নয়। কভারটা মেটালের। আই ফোনের কভার। খুব শক্তপোক্ত। অন্য কোনও মোবাইল হলে বোধহয় গুলিটা মোবাইল ফুঁড়ে বুকে ঢুকে যেত। তাছাড়া পুলিশ গুলিটা দেখে পরে বলেছিল, যে বন্দুকটা থেকে গুলিটা এসেছে সেটা বেশ পুরোনো মডেলের একটা মার্কিনি হ্যান্ডগান। এদের রেঞ্জ খুব বেশি হয় না। বড় জোর একশ মিটার। আমাদের বাড়ির উল্টোদিকে, রাস্তার ওপারে, পুরোনো দোতলা বাড়ি ভেঙে হাইরাইজ উঠছে। গুলিটা সম্ভবত সেখান থেকেই করা হয়েছিল। মাঝে বড় রাস্তা রয়েছে। সেখান থেকে আমাদের বাড়ির এন্ট্রান্সটার দূরত্ব খুব কম নয়। মার্কিনি হ্যান্ডগানটার রেঞ্জ যেহেতু একশ মিটারের মধ্যে, গুলিটা যখন আমার মোবাইলে এসে লেগেছিল তখন তার গতি অনেকটা কমে এসেছিল। গুলিটা মোবাইল ভেদ করে যেতে না পারার সেটা একটা কারণ। কারণ যাই হোক, আমি যে বেঁচে গেছি সেটাই বড় কথা। কিন্তু কতদিন? খুনি আবার চেষ্টা করবে।'

'দেখুন মিঃ দত্ত' আদিত্য থেমে থেমে বলল, 'আমি আপনার উৎকণ্ঠাটা বুঝতে পারছি। কিন্তু আপনাকে চব্বিশ ঘণ্টা প্রোটেকশন দেবার ক্ষমতা আমার নেই।'

আদিত্য আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে অসীম দত্ত বললেন, 'না, না আদিত্যবাবু। আপনাকে সে কাজ করতে বলছি না। আমাকে চব্বিশ ঘণ্টা প্রোটেকশন দেবার জন্য দু-জন প্রাইভেট গার্ড আমি ভাড়া করেছি। দু-জনেই আর্মড, দু-জনেই এক্স-আর্মি। আপনি হয়তো লক্ষ করেননি আমার ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে করিডরের উল্টোদিকে একটা ঘর আছে। এক সময় ওটাকে আমি সার্ভেন্টস কোয়াটার হিসেবে ব্যবহার করতাম। ওখানে বসে একজন চব্বিশ ঘণ্টা আমার ফ্ল্যাটের ওপর নজর রাখছে। দ্বিতীয় জন ফ্ল্যাটের ভেতরে থাকছে। আমার শোবার ঘরের পাশের অ্যান্টিরুমে। যখন বাইরে যাই এরা দু-জনেই আমার সঙ্গে যায়। এর বেশি সাবধান আর কী হব?'

'তাহলে আপনি আমাকে কী করতে বলছেন?'

'হ্যাঁ, সেটাই এবার বলি। প্রথমত, আমি চাই আপনি খুঁজে বার করুন কে আমাকে খুন করতে চাইছে। এই কাজটা আপনার মতো ভাল আর কেউ করতে পারবে না। দেখুন, সিকিউরিটি সঙ্গে নিয়ে কতদিন চলাফেরা করা যায়? সমস্যাটার মূলে গিয়ে তার পাকাপাকি সমাধান করা দরকার। সেটা সম্ভব হবে যদি খুনি ধরা পড়ে।'

'বুঝলাম। দ্বিতীয় আর কোনও কাজ আছে?'

'আছে। আপনি তো জানেন আমার মূল ব্যবসা কন্সট্রাকশান। ইদানীং সেখান থেকে ভেঞ্চার আউট করে আমি হোটেল ব্যবসায় ঢুকেছি। পুরী থেকে কোনারক যাবার রাস্তায়, একেবারে সমুদ্রের ধারে, একটা লাক্সুরিয়াস রিসর্ট বানিয়েছি। এই রবিবার তার ইনগরেশন হবে। আমি নিজে গিয়ে জায়গাটা ইনগরেট করব। ওই দিনটা আবার আমার জন্মদিন। ওই দিন আমার ছেষট্টি বছর পূর্ণ হবে। আমার পরিবারের সদস্যদের ইচ্ছে আমার জন্মদিনটা ওই রিসর্টেই পালন করা হোক। আমার আশঙ্কা, ওই রিসর্টে খুনি আমাকে খুন করার

চেষ্টা করবে। যদিও আমার সঙ্গে সিকিউরিটি থাকবে, তবু ওখানে আমি সেফ নই। আমার পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও অনেক অচেনা লোক থাকবে। আমরা একটা ডিস্কাউন্ট দিচ্ছি বলে সব কটা ঘর বুকড হয়ে গেছে। হাজার হলেও হোটেল বাড়ি তো। কে আসছে কে যাচ্ছে ট্র্যাক রাখা অসম্ভব। আমি ওখানে চার দিন থাকব। আমার ইচ্ছে ওই কটা দিন আপনি আমার সঙ্গে থাকুন।'

আদিত্য ইতস্তত করছিল। তাই দেখে অসীম দত্ত বললেন, 'আপনার কি কোনও অসুবিধে আছে? সামনের শনিবার দুপুরের ফ্লাইটে ভুবনেশ্বর যাবেন, সেখান থেকে গাড়িতে। শনি থেকে মঙ্গল চারটে রাত্তির ওখানে কাটিয়ে বুধবার ফিরে আসবেন। অসুবিধে আছে?'

আদিত্য তবুও ইতস্তত করছিল। শেষে সে ঠিক করল সত্যিটাই বলে দেবে।

'এই মুহূর্তে আমার স্ত্রীকে কলকাতায় রেখে আমার পক্ষে কলকাতার বাইরে যাওয়াটা খুব মুস্কিল।' আদিত্য একটু কাঁচুমাচু হয়ে বলল।

হয়তো এই কথা বলার জন্য কাজটা তার হাত থেকে বেরিয়ে যাবে। এবং তার কাজের যে খুব দরকার তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু বিয়ের পর কেয়াকে কোথাও বেড়াতে না নিয়ে গিয়ে সে নিজেই কলকাতার বাইরে ঘুরে আসবে, তাও একটা রিসর্টে, এটা সম্ভব নয়।

'স্ত্রীকে কলকাতায় রেখে যাবেন কেন? সঙ্গে নিয়ে চলুন।' অসীম দত্ত দরাজ গলায় বললেন। 'আমি গ্যারেন্টি দিচ্ছি ওঁর জায়গাটা ভাল লাগবে। আমাদের সব ঘর বুকড হয়ে গেলেও একটা স্পেশাল হানিমুন সুইট খালি আছে। ওটা আমি যে ঘরে থাকব তার ঠিক পাশে। সেফটির জন্য আমি ওটা খালি রেখেছিলাম। আপনারা থাকলে আমি খুব নিশ্চিন্ত হব।

'আর, বলাই বাহুল্য, রিসর্টে আপনাদের স্টে-টা, মানে ফুড লজিং সব কিছু, পুরোটাই কমপ্লিমেন্টারি।' আসীম দত্ত একটু থেমে বললেন। 'এবার আপনি রাজি তো?'

এরপর আর রাজি না হয়ে উপায় কী? 'ঠিক আছে। আপনার প্রস্তাব মেনে নিলাম।' আদিত্য বলল।

(৪)

'আপনাদের নতুন রিসর্টের নাম কি গোল্ডেন স্যান্ড? ইদানীং খবর কাগজে এদের খুব বিজ্ঞাপন দেখছি।' দ্বিতীয়বার চা এসেছে। আদিত্য চায়ে কাপে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'আপনি একদম ঠিক ধরেছেন। আমাদের রিসর্টের নাম গোল্ডেন স্যান্ড রিসর্ট। ফাইভ স্টার ফেসিলিটি। প্রথম দু-সপ্তাহ আমরা প্রোমোশানাল কারণে বিরাট ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। খুব বিজ্ঞাপনও দিচ্ছি। আশা করছি প্রজেক্টটা দাঁড়িয়ে যাবে।'

'আপনার মূল ব্যবসাটা তো কন্স্ট্রাকশান?'

'হ্যাঁ, ওটা আমার বাপ-দাদার ব্যবসা।'

'হঠাৎ হোটেল ব্যবসায় এলেন কেন?'

'এটা ঠিকই যে আমরা তিন পুরুষের কনট্রাক্টর। সেই সাহেবি আমল থেকে। মূলত আমরা সরকারের কাজ করি। পশ্চিমবঙ্গের রাস্তা, ব্রিজ, সরকারি বাড়ি এসবের একটা বড় অংশ আমাদের করা। বড় বেসরকারি কাজও করি না, তা নয়। কলকাতার দু-একটা নতুন ফাইভ স্টার হোটেল আমাদের কনস্ট্রাকশন। ওই হোটেল বানাতে বানাতে নিজের একটা হোটেল করার আইডিয়াটা মাথায় এল।'

'আচ্ছা, সৈকত চৌধুরির কম্পানির সঙ্গে আপনার কতটা সম্পর্ক আছে?'

'বেশ ভালই সম্পর্ক আছে। আমার বহু কাজের ড্রয়িংগুলো আমি ওদের দিয়ে করাই। সৈকত খুব ট্যালেন্টেড একজন ইঞ্জিনিয়ার। ওকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়েছি। ওর মৃত্যুটা আমার কাছে একটা বিরাট শক। তবে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ওর পার্টনার মণিময় গুপ্তর সঙ্গেই বেশি। মণিময়কে আমি বহুদিন ধরে চিনি।'

'আপনি তো ওদের কোম্পানিকে ধারও দিয়েছেন?'

'আপনি খোঁজ-খবর নিয়ে এসেছেন দেখছি। হ্যাঁ, মণিময় যখন কম্পানি শুরু করল তখন একটা মোটা টাকা ধার দিয়ে ছিলাম। ওরা বাজার থেকে ধার পাচ্ছিল না।'

'আচ্ছা, কে সৈকতকে মারতে পারে আপনার কোনও ধারণা আছে?'

'এ-ব্যাপারে সত্যিই আমার কোনও ধারণা নেই।'

'মানুষ হিসেবে সৈকত চৌধুরিকে আপনি কীভাবে ইভ্যালুয়েট করবেন?'

'ভেরি ট্যালেন্টেড ইঞ্জিনিয়র, ইমোশানাল, কিছুটা ইমপ্র্যাকটিকাল, ব্যবসা ব্যাপারটা খুব একটা বুঝত না, কিন্তু আদ্যোপান্ত সৎ, পরোপকারি। এমন একটা ছেলেকে কে মারতে পারে আমি জানি না।'

সৈকতকে খুন আর আপনাকে খুনের চেষ্টা, এই দুইএর মধ্যে কি কোনও যোগাযোগ থাকতে পারে?'

প্রশ্নটা শুনে অসীম দত্তকে বিভ্রান্ত দেখাল। খানিকটা চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'যোগাযোগ যে থাকতে পারে এটা আমার মাথাতেই কখনও আসেনি। আমার ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনি সকলেই আমার মৃত্যুতে লাভবান হবে। আমার কিছু বিজনেস রাইভালও আছে। আমি মারা গেলে তাদেরও লাভ। এদের কেউ আমার মৃত্যু চাইতেই পারে। কিন্তু এরা তো সৈকত চৌধুরিকে চেনেই না। আমার মনে হয় না দুটো ঘটনার মধ্যে কোনও সম্পর্ক আছে।'

'আমি আপনার ব্যাপারটায় এক্ষুনি আসছি। তার আগে সৈকত চৌধুরির ব্যাপারে একটা শেষ প্রশ্ন। মণিময় গুপ্ত এখন কোথায় আছে, জানেন?'

'আমি যদ্দুর জানি, মণিময় এখন ল্যাটিন অ্যামেরিকায় ঘুরছে। ঠিক কোথায় ঘুরছে আমি জানি না। সম্ভবত কেউই জানে না। মণিময় একটু খেপাটে লোক। ভ্রমণটাই ওর একমাত্র নেশা। ও যখন পাহাড়-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, সভ্য জগতের সঙ্গে ওর কোনও সম্পর্কই থাকে না।'

আদিত্য খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, যেমন হাওয়া দিক পরিবর্তনের আগে থমকে যায়। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'এবার আপনার সমস্যাটাতে আসা যাক। প্রথমে আপনার পরিবারের সদস্যদের দিয়ে শুরু করি। আপনার পরিবারে কে কে আছেন?'

'আমার স্ত্রী চব্বিশ বছর আগে মারা গেছেন। তিন ছেলেমেয়েদের কেউই তখনও দাঁড়ায়নি। তাদের কথা ভেবে আমি আর বিয়ে করিনি। এখন আমার পরিবার বলতে রয়েছে আমার এক মেয়ে, দুই ছেলে, এক জামাই, দুই বউমা, আর নাতি-নাতনি।'

'তাঁরা কী করেন, কোথায় থাকেন, একটু ডিটেলে বলবেন?'

'হ্যাঁ। আমার বড় ছেলে সবার বড়। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। আগে আমার কোম্পানিতেই ছিল। কিছুদিন হল নিজের কোম্পানি শুরু করেছে। ওর বউ কিছু করে না, হাউস ওয়াইফ। একটাই ছেলে ব্যাঙ্গালোরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। আমার বড় ছেলেরা থাকে রাজারহাট নিউ টাউনে।

'সন্তানদের মধ্যে আমার মেয়ে দ্বিতীয়। তার স্বামী মিলিটারিতে ছিল, এখন রিটায়ার করেছে। ওরা এয়ারপোর্টের কাছে ভি আই পি রোডের ওপরে একটা গেস্ট হাউস চালায়। ওখানেই থাকে। ওদের একমাত্র মেয়ে দিল্লিতে চাকরি করে।

'আমার ছোট ছেলে ভাইবোনদের মধ্যে সব থেকে ছোট। লেখাপড়ায় সব থেকে ভাল। বড় ছেলেকে যেমন পয়সা দিয়ে পড়াতে হয়েছে, ছোট ছেলেকে তা নয়। ও নিজের মেরিটে আইআইটি এবং পরে আইআইএম-এ পড়েছে। এখন একটা মাল্টিন্যাশানালে চাকরি করে। আপাতত বম্বেতে পোস্টেড। আলিপুরেও একটা ফ্ল্যাট আছে। একটা বিয়ে করেছিল। বনিবনা হয়নি। বউমা স্বামীকে ছেড়ে কলকাতায় চলে এসেছে। বাপের বাড়িতে থাকে। তবে ডিভোর্সটা এখনও হয়নি। ভাগ্যিস ছেলেপুলে নেই। আমার ছোট ছেলে কিন্তু একটু ডিফিকাল্ট চরিত্রের। আমার সঙ্গেই খুব একটা বনে না। কারোর সঙ্গেই বনে না। বউমার

সঙ্গে কী করে বনবে? আমার ছোট বউমাকে আমি খুব পছন্দ করি। আমার মনে হয়, বউমার সত্যিই কোনও দোষ নেই। আমার ছোট ছেলের সঙ্গে বসবাস করা প্রায় অসম্ভব।

'তা এই আমার পরিবার। এরা সকলেই আমার জন্মদিন উপলক্ষে গোল্ডেন স্যান্ডে আসছে। আমার নাতি-নাতনিরাও আসছে। ছোট বউমাকেও আসতে বলেছি,অফিশিয়ালি সে তো এখনও আমাদের পরিবারের সদস্য। ওখানে একটা ফ্যামেলি গেট টুগেদার হবে। পুরোটাই আমার নাতি আর নাতনির আইডিয়া।'

'আপনার অবর্তমানে আপনার সম্পত্তি কীভাবে ভাগ হবে?'

'মূল সম্পত্তি মেয়ে এবং ছেলেদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ হবে। নাতি এবং নাতনিও আলাদা করে কিছু পাবে। আর ছোট বউমার জন্যেও কিছু টাকা রেখেছি। মেয়েটা খুব দুঃখী।

'তবে ছোট ছেলে যদি আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেই যায়, তাহলে ঠিক করেছি তার অংশটা পুরোটাই ছোট বউমাকে দিয়ে দেব। সেটা আমি আমার ছোট ছেলেকে বলেও দিয়েছি।'

'আপনার কি মনে হয় এরা কেউ সম্পত্তির লোভে আপনাকে খুন করতে পারে?'

অসীম দত্ত অনেকক্ষণ প্রশ্নটার উত্তর দিলেন না। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, 'এ-ব্যাপারে আগ বাড়িয়ে আমি কিছুই বলব না। ওটা বার করা আপনার কাজ।'

'ঠিক আছে। ফেয়ার এনাফ। আপনি শুধু বলুন, গোল্ডেন রিসর্টে আমি আমার নিজের পরিচয়েই যাব তো? সেটা হলেই আমার ইনভেস্টিগেশনে সুবিধে হবে। আপনি আমাকে ইনট্রোডিউস না করে দিলে আমি কোন পরিচয়ে আপনার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলব?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনি নিজের পরিচয়েই যাবেন। আমিই আপনাকে সকলের সঙ্গে ইনট্রোডিউস করিয়ে দেব। সকলেই জানে আমার ওপর একটা মার্ডার অ্যাটেম্পট হয়েছে। আর একবার হবার সম্ভাবনাও প্রবল। অতএব আমি তো ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেট করাতেই পারি।'

'আর একটা প্রশ্ন। আপনি বলছিলেন আপনার দু-একজন বিজনেস রাইভাল আছে যারা আপনার মৃত্যুতে উপকৃত হতে পারে। তারা কারা?'

'দেখুন ব্যবসা করতে গেলে কিছু রাইভালরি তো থাকবেই। তবে তার জন্যে আমাকে একেবারে খুন করে ফেলবে, এটা মনে হয় একটু ফার ফেচেড। আমি তখন বলার ঝোঁকে বলে ফেললাম, কিন্তু ওটা আপতত বাদ দিন।'

'তবু নামগুলো যদি বলেন, আমি নোট করে রাখব। কে জানে কখন কাজে লেগে যায়।'

'ঠিক আছে। আপনি যখন ইনসিস্ট করছেন। মুখার্জী অ্যাসোসিয়েটস আর মুনশাইন বিল্ডার্স আপনি এই দুটো নাম নোট করে রাখুন। সল্ট লেক সেক্টর ওয়ানে দুজনেরই অফিস। ঠিকানাটা আপনাকে বার করে নিতে হবে।'

'আর একটা কথা। আপনার কেসটা পুলিশ থেকে কে ইনভেস্টিগেট করছে জানেন?'

'যতদূর মনে পড়ছে বালিগঞ্জ থানার একজন সাব-ইন্সপেক্টার, পদবিটা সম্ভবত মাজি। নামটা মনে পড়ছে না।'

'ওতেই হবে। বাকিটা আমি বার করে নেব।'

আদিত্য ঘড়ির দিকে তাকাল। পৌনে নটা। সে অসীম দত্তর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আজ তাহলে এই অবধি থাক। আমি এখন উঠি। পরে যোগাযোগ করব।'

'দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান। আপনার ইমেল অ্যাড্রেস এবং ব্যাঙ্ক ডিটেলটা আমার লাগবে। আর আপনার গিন্নির নাম। ও হ্যাঁ, আপনাদের বয়েসটাও লাগবে। আমার সেক্রেটারি আপনাদের এয়ার টিকিট দুটো মেল করে দেবে। আর অ্যাডভান্স হিসেবে কিছু টাকা আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে দিতে বলছি। পরে আপনার বিল থেকে ওটা অ্যাডজাস্টেড হবে।'

'ঠিক আছে। আমি আপনাকে আমার ইমেল আই ডি এবং ব্যাঙ্ক ডিটেলটা বাড়ি ফিরে টেক্সট করে দিচ্ছি। আজ তাহলে চলি?'

'আসুন। আর হ্যাঁ, একটা কথা। যদি সমস্ত সাবধানতা সত্ত্বেও আমি খুন হয়ে যাই, আমার মতে যার সম্ভাবনা যথেষ্টই রয়েছে, তাহলে আপনার ওপর নির্দেশ রইল খুনিকে আপনি অবশ্যই খুঁজে বার করবেন। না হলে আমি মরেও শান্তি পাব না।'

আদিত্য বাইরে এসে দেখল ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। তার সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। এই ফেব্রুয়ারির শেষে বৃষ্টি হওয়াটা স্বাভাবিক নয়। হাওয়া আপিস নিশ্চয় বলবে বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ। মোবাইলটা সাইলেন্ট মোডে ছিল। কেয়া অনেকগুলো ফোন করেছে। আদিত্যর দেরি দেখে নিশ্চয় চিন্তা করছে। এই জিনিসটার সঙ্গে আদিত্য এখনও ধাতস্থ হয়নি। কিছুদিন আগেও সে মুক্ত বিহঙ্গের মতো চলাফেরা করত। আদিত্য কেয়াকে ফোন করে জানাল সে সদ্য ক্লায়েন্টের বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। বাড়ি ফিরতে আরও ঘন্টা খানেক।

বালিগঞ্জ সারকুলার রোড ধরে আদিত্য ফাঁড়ির দিকে হাঁটছিল। রাস্তায় বাস, ট্যাক্সি কিচ্ছু নেই। সঙ্গে ছাতাও নেই। বৃষ্টির বেগ আস্তে আস্তে বাড়ছে। ফাঁড়ি যখন পৌঁছল তখন সে বেশ ভিজে গেছে। দমকা হাওয়ায় ঈষৎ কাঁপুনি লাগছিল। ফাঁড়ির মোড়ে কয়েকটা খালি ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ট্যাক্সিতে উঠে আদিত্য অসীম দত্তর শেষ কথাগুলো ভাবছিল। অসীম দত্ত মনে করছে সব প্রিকশান সত্ত্বেও সে খুন হয়ে যেতে পারে? কেন? সে কি তাহলে সব কথা খুলে বলছে না? খুনি কি তাহলে তার খুব কাছের কেউ?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

(১)

বালিগঞ্জ থানা আদৌ বালিগঞ্জে নয়, বেলতলা রোডে, বেলতলা মোটর ভিকিলস আপিসের গায়ে। বেলতলা রোডের একদিকের মুড়োটা শরৎ বোস রোড থেকে বেরিয়েছে। সেই মুড়ো ধরে কয়েক মিনিট হাঁটলেই থানা। জায়গাটা বালিগঞ্জের চাইতে ভবানীপুরের কাছাকাছি।

আগের দিন অসীম দত্তর বাড়ি পৌঁছতে বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল, তাই আজ আদিত্য হাতে সময় রেখে বেরিয়েছে। শরৎ বোস রোড দিয়ে একটাই মিনি যায়, কোনও কারণে আজ সেটা বন্ধ। তাই গতকাল যে রুটের মিনিবাসটা ধরে অসীম দত্তর বাড়ি গিয়েছিল, বিবাদী বাগ থেকে আজও সেটাই ধরল আদিত্য। আপিস যাত্রীদের উল্টো পথ বলে বাসে মোটেই ভিড় নেই। বালিগঞ্জ সারকুলার রোডে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের উল্টোদিকে নেমে, রাস্তা পেরিয়ে, কলেজের পাশ দিয়ে ঢুকে, বালিগঞ্জ গভরমেন্ট ইস্কুলের ধার ঘেঁষে সে যখন বালিগঞ্জ থানার সামনে পৌঁছল তখনও হাতে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় রয়েছে। তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট বেলা এগারোটায়।

মোটর ভিকিলস আপিসের সামনে বেশ ভিড়। কেউ লাইসেন্স রিনিউ করতে এসেছে, কেউ এসেছে নতুন লাইসেন্স নিতে। কারও গাড়ি পুলিশ আটকে রেখেছে, জরিমানা দিয়ে ছাড়াতে হবে, আবার কেউ কেউ মোটর বাইকের ড্রাইভিং টেস্ট দেবার জন্য অপেক্ষা করছে। আদিত্য আড়ি পেতে লোকজনের কথাবার্তা শুনছিল। সবার ওপরে অবশ্য দালালদের ভিড়। এখানে তাদেরই রাজত্ব। দালালদের টপকে কিছুই হবার উপায় নেই। আদিত্য রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকানে বসে রাস্তা দেখতে দেখতে চা খাবে ভেবেছিল। কিন্তু এখানে শান্তিতে বসে চা খাবার জো আছে! তিন মিনিটের মধ্যে চার-পাঁচজন দালাল এসে তাকে জিজ্ঞেস করে গেল তার কী চাই— লাইসেন্স রিনিউয়াল নাকি ট্যাক্স টোকেন রিনিউয়াল নাকি অন্য কিছু? কয়েক চুমুকে ভাঁড়ের চা-টা শেষ করে আদিত্য উঠে দাঁড়াল। এখানে বসে বসে উত্যক্ত হবার থেকে থানার ভেতরে গিয়ে অপেক্ষা করা ভাল। এগারোটা বাজতে এখনও মিনিট কুড়ি বাকি।

বালিগঞ্জ থানার ইন্সপেক্টার মাজির পুরো নাম সুভদ্র মাজি। সে থানাতেই ছিল। বলতে গেলে আদিত্যর জন্যই অপেক্ষা করছিল। তার সঙ্গে দুএকটা কথা বলেই আদিত্যর মনে হল সুভদ্র সার্থকনামা পুরুষ। বস্তুত, ওরকম ভদ্র, মার্জিত পুলিশ আদিত্য খুব বেশি দেখেনি। এটা ঠিক যে, আদিত্য মজুমদারকে যেন সাধ্যমতো সাহায্য করা হয় এই মর্মে লালবাজার থেকে একটা ফোন বালিগঞ্জ থানায় গিয়েছিল। তাই বালিগঞ্জ থানার থেকে আদিত্য কোনও বৈরিতা আশঙ্কা করছিল না। কিন্তু সুভদ্র মাজি যেরকম মার্জিতভাবে আদিত্যকে আপ্যায়ন করল তাতে আদিত্যর মনে হল পুলিশ নয় সে কোনও সাহিত্যের অধ্যাপকের সঙ্গে কথা বলছে।

'লালবাজার থেকে ইন্সপেক্টার সিকদার ফোন করেছিলেন। বললেন, আপনি অসীম দত্তর কেসটা তদন্ত করছেন। আপনাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে বললেন।' সুভদ্র মাজি জানাল।

'আমি একটু আগে আগে এসে পড়েছি। আপনার অসুবিধে হবে না তো?' আদিত্য বিনীতভাবে বলল।

'না, না। অসুবিধে কীসের? আমি তো আপনার জন্যেই বসে আছি। সিকদার সাহেব ফোন না করলেও কোনও অসুবিধে ছিল না। আপনি এসে শুধু নিজের পরিচয়টা দিলেই হত। কলকাতা পুলিশ মহলে আপনার কথা জানে না, এমন কেউ নেই।'

আদিত্য লজ্জা পাচ্ছিল। আবার একই সঙ্গে এসব কথা শুনলে তার বুকের মাঝখানে ছেলেমানুষের মতো একটা অনুভূতি হয়। সেই অনুভূতিকে আনন্দই বলতে হবে। সে জীবনে যা যা করতে চেয়েছিল কোনওটাই হয়নি। লেখাপড়া, গানবাজনা কোনওটাই নয়। এ-নিয়ে তার দুঃখও কম নেই। কিন্তু গোয়েন্দাগিরি, সে যেটা করার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি, পেটের দায়ে তাকে যেটা করতে হচ্ছে, সেটাও যদি ভাল করে হয়, মন্দ কী?

আদিত্যকে অন্যমনস্ক দেখে সুভদ্র মাজি খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'আদিত্যবাবু আমি আপনাকে বিব্রত করতে চাইনি। আপনি বসুন। একটু চা আনতে বলি।'

চায়ে আদিত্যর কখনোই আপত্তি নেই। বিশেষ করে আগের চা-টা মোটেই জুত করে খেতে পারেনি। সে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

কেটলিতে চা এসেছে, সঙ্গে ভাঁড়, দিশি বিস্কুট। আদিত্য চায়ের ভাঁড়ে চুমুক লাগিয়ে বলল, 'অসীম দত্তর কেসটা কিছু বুঝতে পারলেন?'

'বুঝতে পেরেছি বললে মিথ্যাভাষণ হবে। যতদূর মনে হচ্ছে অসীমবাবুর কোনও নিকট আত্মীয়ই এর পেছনে আছে। কিন্তু কে সেটা এখনও ধরতে পারিনি। এদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। এদের সম্বন্ধে যতটা জানতে পেরেছি ফাইলে নোট করে রেখেছি। আপনি যদি অসীম দত্তর ফাইলটা দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন আমি কতটা জানতে পেরেছি। অবশ্য ওই ফাইলে চরিত্রগুলির সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত কিছু ইম্প্রেশনও নোট করা আছে। আপনি চাইলে ওটুকু অনায়াসে বাদ দিয়ে দিতে পারেন।'

'বাদ দেব কেন? আপনার ধারণাগুলো তো আমি জানতেই চাই। ফাইলটা পেলে আমার খুব উপকার হবে।' আদিত্য কৃতজ্ঞস্বরে বলল। 'আর যদি দুটো সাদা পাতা পাওয়া যায় খুব ভাল হয়। একটু নোট নিতে পারি। আর একটা বসে লেখার জায়গা। খুব বেশি চেয়ে ফেলছি বোধহয়?'

'মোটেই না, মোটেই না। আপনি এখানে একটু বসুন, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। বড়বাবু আমার ওপর নির্দেশ দিয়ে গেছেন, আপনার যা যা দরকার সব কিছুর ব্যবস্থা করে দিতে। বড়বাবু বেরিয়েছেন, ফিরতে দেরি হতে পারে। তাই এই নির্দেশ। আপনার সঙ্গে দেখা করা হল না বলে ক্ষমাও চেয়ে গেছেন।'

'বড়বাবুকে আমার নমস্কার জানাবেন। বলবেন, আর একদিন এসে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে যাব। আপনি ব্যবস্থা করুন, আমি দু-মিনিটের মধ্যে বাইরে থেকে একটা সিগারেট খেয়ে আসছি।'

'আপনাকে কষ্ট করে বাইরে যেতে হবে না। থানার ভেতরে একটা বারান্দা আছে। একজোড়া চেয়ার-টেবিলও আছে সেখানে। আমি ওখানেই আপনার কাজ করার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আপনি ওখানে ধূমপানও করতে পারেন।'

ফাইলটা ইংরেজিতে। আদিত্য পড়ছিল আর কাগজে ইংরেজিতেই নোট নিচ্ছিল। তার বাংলা করলে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়ায় :

গত জানুয়ারি মাসের তিন তারিখ বিকেল তিনটে চল্লিশ মিনিটে ২৭/১/এফ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে অবস্থিত 'আবাসিকা' নামক বহুতলের ৩০১ নম্বর ফ্ল্যাটের মালিক (তিনতলার দক্ষিণ দিকের ফ্ল্যাট) অসীম দত্ত বাড়িতে ঢোকার সময় বাড়ির মূল ফটকের সামনে গুলিবিদ্ধ হন। বুক-পকেটে রাখা মোবাইল ভেদ করে গুলিটি তাঁর শরীরে প্রবেশ করতে পারেনি। তাই তিনি প্রাণে বেঁচে যান। গুলিটি .৩২ ক্যালিবারের স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন রিভলভার থেকে ছোঁড়া হয়েছিল। রিভলভারটি আনুমানিক ১৯৫২/৫৩ সালে তৈরি। সাধারণত অল্প দূরত্বে এই অস্ত্র বেশ কার্যকরী। কিন্তু এই ধরনের রিভলভারের রেঞ্জ খুব বেশি হবার কথা নয়। তাই দূর থেকে ছোঁড়া হয়েছিল বলেই হয়তো গুলিটি তার গতিবেগ হারায় এবং সেই কারণে অসীম দত্তর বুক-পকেটে রাখা মোবাইল ভেদ করে সেটি আর এগোতে পারেনি।

প্রাথমিক তদন্তে মনে হয়, অসীম দত্তর নিকট আত্মীয়দের কেউ এই হত্যার চেষ্টা করেছিল। অসীম দত্ত এবং তাঁর নিকট আত্মীয়দের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

অসীম দত্ত— কনস্ট্রাকশন এবং সিভিল ওয়ার্ক-এর ব্যবসা। বয়েস ছেষট্টি। বিপত্নীক। চব্বিশ বছর আগে স্ত্রী মারা গেছেন। একা থাকেন। তাঁর কম্পানি অনেক বাড়ি, রাস্তা, ব্রিজ, ফ্লাইওভার ইত্যাদি বানিয়েছে। সম্প্রতি অসীম দত্ত পুরী এবং কোনারকের মাঝে একটা লাক্সারি রিসর্টও বানিয়েছেন। রিসর্টটি তাঁর কোম্পানিই চালাবে। খুব শিগগির রিসর্টটি উদ্বোধন করা হবে। স্থাবর অস্থাবর মিলে অসীম দত্তর মোট সম্পত্তি আনুমানিক ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা।

অনিকেত দত্ত —অসীম দত্তর জ্যেষ্ঠ সন্তান। বয়েস তেতাল্লিশ। জয়পুরের এক অখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে বাবার ফার্মে যোগ দেয়। তেরো বছর সেখানে কাজ করার পর বাবার ফার্ম ছেড়ে নিজের ফার্ম খোলে। কেন বাবার ফার্ম ছাড়ল সে ব্যাপারে নানা লোক নানারকম কথা বলছে। অনিকেত নিজে বলছে, বাবার ছত্রছায়ায় না থেকে সে নিজের চেষ্টায় কিছু একটা করে দেখাতে চেয়েছিল। অসীম দত্ত নিজে এই বিষয়ে কিছু না বললেও তাঁর কোম্পানির একাধিক সিনিয়ার অফিসার বলছে, অনিকেত দত্ত বারবার কোম্পানির টাকা-পয়সা নিয়ে গণ্ডগোল করত। শেষে অতিষ্ঠ হয়ে অসীম দত্ত ছেলেকে তাঁর কোম্পানি ছেড়ে চলে যেতে বলেন। অনিকেতের নিজের কোম্পানি খোলার জন্য টাকাও দেন।

অনিকেত দত্তর কোম্পানি খুব ভাল চলে না। মাঝেমাঝেই তাকে বাবার কাছে এসে হাত পাততে হয়।

অনিকেত দত্ত নার্ভাস স্বভাবের মানুষ। তাড়াতাড়ি কথা বলে। সামান্য তোতলা। তাকে দেখে মনে হয় আত্মবিশ্বাসের অভাব আছে।

ছন্দা দত্ত— অসীম দত্তর পুত্রবধূ, অনিকেত দত্তর স্ত্রী। বয়েস আটত্রিশ। সুন্দরী, কিন্তু বাপের বাড়ির জোর নেই। সম্ভবত অসীম দত্ত গরিব ঘর থেকে সুন্দরী দেখে মেয়ে এনেছিলেন। ছন্দা দত্ত পুরোদস্তুর গৃহবধূ, নিজে কোনও আয় করে না। নিজস্ব কোনও মতামতও নেই। খুবই নিরীহ প্রকৃতির মানুষ, স্বামীর একান্তই অনুগত। সম্ভবত স্বামীর অসাফল্যের আঁচ তার চরিত্রেও লেগেছে। নিজের তৈরি খোলসের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রেখেছে।

অসীম দত্ত পুত্রবধূকে পছন্দ করেন। পুত্রবধূরও শ্বশুরের ওপর টান আছে।

শুভ্র দত্ত— অনিকেত দত্তর ছেলে, বয়েস কুড়ি। বাবা-মার একমাত্র সন্তান, মধ্যমেধা, টাকা দিয়ে ব্যাঙ্গালোরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। ছোটবেলায় দাদুর খুব নেওটা ছিল। ইস্কুলে পড়ার সময় দাদুর সঙ্গে নিয়মিত মোহনবাগানের খেলা দেখতে যেত, ইডেনে ক্রিকেট খেলা দেখতে যেত। এখনও কলকাতায় এলে দাদুর সঙ্গে অনেকটা সময় কাটায়।

শ্বেতা মল্লিক— অসীম দত্তর মেয়ে। তিন ছেলেমেয়ের মধ্যে দ্বিতীয়। বয়েস একচল্লিশ। সাহেব পাড়ার এক মিশনারি ইস্কুল থেকে স্কুল লিভিং পাশ করার পর আর লেখাপড়া হয়নি। স্কুল লিভিং পাশ করার আগেই বিয়ে। স্বামী মিলিটারি অফিসার, কোনও একটা পার্টিতে শ্বেতার সঙ্গে আলাপ। শ্বেতা মল্লিকের এক মেয়ে। সে দিল্লির একটা কলেজ থেকে পাস করে দিল্লিরই একটা ইংরেজি কাগজে সাংবাদিকতা করে। শ্বেতা এক সময় শাড়ির ব্যবসা করত। সেটা উঠে যাবার পর এখন স্বামীর সঙ্গে যৌথভাবে এয়ারপোর্টের কাছে একটা যাত্রীনিবাস চালায়। ইনভেস্টমেন্টটা কিছুটা শ্বেতার নিজের, কিংবা বলা যায় তার বাবার, আর বাকিটা শ্বেতার স্বামী, ব্রিগেডিয়ার জয়ন্ত মল্লিকের। শ্বেতার স্বামীই যাত্রীনিবাসটা দেখাশোনা করে। কিন্তু যাত্রীনিবাসের কর্মচারীদের ইম্প্রেশন শ্বেতাই তার স্বামীকে চালায়। তার সঙ্গে কথা বলে ইন্সপেক্টার মাজিরও মনে হয়েছে শ্বেতার প্রবল ব্যক্তিত্ব। কিংবা অন্যভাবে বললে, বেশ জাঁদরেল মহিলা।

স্বামীর সঙ্গে শ্বেতা মল্লিক ভারতের নানা জায়গায় ঘুরেছে। সেই সময়ের তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি।

শ্বেতার দাদা অনিকেত দত্ত এবং অসীম দত্তর সেক্রেটারি চন্দ্রিমা সেন দুজনেই বলছে শ্বেতা তার বাবার কাছে মাঝে মাঝেই টাকা চাইতে আসত। বস্তুত, সে তার বাবাকে টাকার জন্য প্রবল চাপ দিত। কেন তার অত টাকার দরকার পড়ত সেটা কেউই বলতে পারেনি। অসীম দত্ত নিজে এ-ব্যাপারে নীরব।

ব্রিগেডিয়ার জয়ন্ত মল্লিক— অসীম দত্তর জামাই, শ্বেতা মল্লিকের স্বামী। বয়েস চুয়ান্ন। খুবই সফল এবং দক্ষ মিলিটারি অফিসার। একাধিক অ্যাওয়ার্ড পাওয়া। খোলামেলা মানুষ। হাসিখুশি। আবার রেগে গেলে হুঁস থাকে না। একবার ফোর্ট উইলিয়মে এক ঝাড়ুদারের ওপর রেগে গিয়ে তাকে এত জোরে চড় মেরেছিল যে সে প্রায় মারাই যাচ্ছিল। ব্যাপারটা ধামাচাপা দিয়ে দেওয়া হয়। এত রাগী লোক, কিন্তু স্ত্রীর সামনে জুজু।

রিটায়ার করার পর স্ত্রীর সঙ্গে যাত্রীনিবাস চালায়। যুদ্ধের কৌশল যেমন ভাল বুঝত, ব্যবসা ব্যাপারটা তেমনি কম বোঝে।

জয়ন্ত মল্লিকের একটা বিরাট অন্ধকার দিক হল সে প্রচণ্ড মদ্যপ এবং জুয়াড়ি। নিয়মিত রেসের মাঠে যায়। বাজারে তার অনেক ধার।

স্বামীর ধার মেটানোর জন্যেই কি শ্বেতা তার বাবাকে টাকার জন্য চাপ দেয়?

স্বাতী মল্লিক — জয়ন্ত মল্লিক, শ্বেতা মল্লিকের একমাত্র সন্তান। বয়েস তেইশ। দিল্লিতে চাকরি করে। সাংবাদিক। কর্মক্ষেত্রে সুনাম হয়েছে। এখনও বিয়ে করেনি। শোনা গেছে কার সঙ্গে যেন 'লিভ টুগেদার' করে।

স্বাতী মল্লিকের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা যায়নি। তার সম্বন্ধে আর কিছু জানাও যায়নি।

মূলত শুভ্র আর স্বাতী, দুই নাতি-নাতনি মিলে গোল্ডেন স্যান্ড রিসর্টে দাদুর ছেষট্টি বছরের জন্মদিন উদযাপন করার একটা প্ল্যান করেছে।

অনির্বাণ দত্ত— অসীম দত্তর কনিষ্ঠ সন্তান। বয়েস পঁয়ত্রিশ। ভাইবোনদের মধ্যে সব থেকে উজ্জ্বল, সব থেকে মেধাবী। বম্বে আই আই টি থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে বি টেক। পরে আমেদাবাদ আই আই এম থেকে ম্যানেজমেন্ট করেছে। কয়েকটা কোম্পানিতে চাকরি করার পর এখন একটা বিদেশি ব্যাঙ্কের পশ্চিমাঞ্চলের কর্ণধার। বম্বেতে অফিস। আলিপুরেও একটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট কিনেছে।

অনির্বাণকে যারা চেনে তারা সকলেই বলে অনির্বাণ মেধাবী কিন্তু অত্যন্ত উদ্ধত এবং দুর্মুখ। বিশেষ করে তার অধস্তনদের জীবন সে দুর্বিষহ করে তুলেছে। তার পরিবারের লোকেরা, অর্থাৎ তার বাবা এবং দাদা-দিদিরা, সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছে অনির্বাণের মতো অহঙ্কারী, অসভ্য, দুর্বিনীত এবং সবার ওপরে খারাপ ধরনের মানুষ তাদের পরিবারে আর কেউ নেই। অনির্বাণ মনে করে তার আশেপাশে যারা রয়েছে তারা প্রত্যেকেই তার তুলনায় নিকৃষ্ট এবং কথা বলার অযোগ্য।

পাঁচ বছর আগে অনির্বাণ বিয়ে করেছিল। সম্বন্ধ করা বিয়ে। অসীম দত্তই তার ইস্কুলের বন্ধুর মেয়ের সঙ্গে ছোট ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়েটা জমেনি। এখনও ডিভোর্স হয়নি বটে তবে অনির্বাণের স্ত্রী তাকে মুম্বাইতে রেখে কলকাতায় বাপের বাড়িতে ফিরে এসেছে। ছেলেমেয়ে হয়নি। বিয়েটা সম্ভবত এই কারণে ভেঙে গেছে যে অনির্বাণের মতো মানুষের সঙ্গে কারও বসবাস করা সম্ভব নয়। তবু অনির্বাণের স্ত্রী প্রায় দু-বছর চেষ্টা করেছিল। তারপর আর পারেনি। যাতে খোরপোষ দিতে না হয়, অনির্বাণ স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যাভিচারিতার মামলা করবে বলে শাসিয়েছে। অনির্বাণের স্ত্রীর মামলা লড়ার মতো আর্থিক সামর্থ্য নেই, অসীম দত্তই তার একমাত্র ভরসা।

অসীম দত্ত অনির্বাণের স্ত্রী দীপশিখার প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল। তিনি বলছেন,অনির্বাণ স্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করলে তিনি দীপশিখাকে মামলার সময় আর্থিক সাহায্য করবেন।

দীপশিখা মজুমদার দত্ত— অসীম দত্তর ভূতপূর্ব পুত্রবধূ। বয়েস একত্রিশ। স্বামীকে ছেড়ে আসার পর বাপের বাড়িতে থাকে। একটা বেসরকারি স্কুলে পড়ায়। দীপশিখার বাবা, অসীম দত্তর বাল্যবন্ধু, খুবই অসুস্থ।

তার চিকিৎসার জন্য যে বিপুল খরচ হয়, দীপশিখার একার পক্ষে সেটা বহন করা ক্রমশই অসম্ভব হয়ে উঠছে। অনুমান, অসীম দত্ত দীপশিখার পরিবারকে নিয়মিত আর্থিক সাহায্য করেন।

নোট নিতে নিতে আদিত্য সুভদ্র মাজির তারিফ করছিল। সে নিজে গিয়ে তদন্ত করলে এর থেকে বেশি কিছু জানতে পারত বলে মনে হয় না।

আদিত্য থানা থেকে বেরিয়ে আসার আগে সুভদ্র মাজি বলল, 'আপনার ই-মেলটা দেবেন? তাহলে ভবিষ্যতে আরও কিছু তথ্য জানতে পারলে আপনাকে মেল করে দিতে পারি। তাছাড়া আপনার ফোন নাম্বারটা তো রইলই।'

(২)

থানা থেকে বেরিয়ে আদিত্য ভাবল শরৎ বোস রোডে বাসের জন্য অপেক্ষা না করে বরং চক্রবেড়িয়ার ভেতর দিয়ে জগুবাবুর বাজারে পৌঁছে যেতে পারলে ওখান থেকে মেট্রো পেয়ে যাবে। শীত যাই যাই করেও পুরোটা যায়নি। রোদ্দুর এখনও নরম। তার ওপর কাল বৃষ্টি হবার পর মাঝে মাঝে একটা জোলো হাওয়া দিচ্ছে। হাঁটার পক্ষে অতি উত্তম সময়। শুধু বৃষ্টি না নামলেই হল। আদিত্যর সঙ্গে আজও ছাতা নেই।

পুরোনো ভবানীপুর দিয়ে হাঁটতে আদিত্যর ভাল লাগে। বড় বড় প্রাসাদের মতো বাড়ি, তাদের অনেকেই যত্নের অভাবে এখন ভেঙে পড়ছে। মাঝে মধ্যে পুরোনো বাড়ি-ভাঙা দৃষ্টিকটু হাইরাইজ, আদিত্যর মনে হয়, না থাকলেই ভাল হত। দু-একটা বাড়ি ভেঙে প্রোমোটারি চলছে। নতুন শহর এসে পুরোনো শহরটাকে অচিরেই গ্রাস করে ফেলবে।

আদিত্যর যতদূর মনে পড়ছে, চক্রবেড়িয়ার মোড়ে একটা পাঞ্জাবি ধাবা ছিল। সেখানে পৌঁছে দ্যাখে, সেটা এখনও রয়েছে।

চা খাবার উদ্দেশ্যে ধাবার ভেতরে ঢুকেছিল আদিত্য। দেখল সেখানে মধ্যাহ্নভোজন শুরু হয়ে গেছে। খাবারের গন্ধে আদিত্যর নিজেরই খিদে পেয়ে গেল। সে ঠিক করল, দুপুরের খাওয়াটা এখানেই সেরে নেবে।

কাঁচা পেঁয়াজ, কাঁচা লংকা সহ তড়কা রুটি। শেষে টক দই। আদিত্য তৃপ্তি করেই খেল। এবার চা-সিগারেট। ধাবার ভিতরে সিগারেট খাওয়া বারণ। তবে বাইরে বসার জায়গা আছে, সেখানে বসে চা সিগারেট খাওয়া চলবে। সিগারেট ধরিয়ে আদিত্য মোবাইলে বিমলের নম্বরটা লাগাল।

'কোথায় রয়েছ এখন? একটু দরকার ছিল।' বিমলের গলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে আদিত্য বলল।

'বাড়িতেই আছি স্যার। আপনার বাড়ি চলে যেতে পারি। যাব?'

'আমার বাড়িতে আসার দরকার নেই। আমি বাড়িতে নেই। ফোনে বলে দিচ্ছি কী করতে হবে।'

'বলুন স্যার।'

'তোমাকে আরও কয়েকবার জামির লেনের ওই বাড়িটাতে যেতে হবে। খোঁজ নিতে হবে অনিতা চৌধুরির বন্ধু কবে অনিতার সঙ্গে দেখা করতে আসে। সম্ভবত কোনও নির্দিষ্ট দিনে আসে না। তাই তোমাকে ওখানে থেকে তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। তার দেখা পেলে, তার পিছু নিয়ে দেখবে সে কোথায় যায়। সে যখন বাড়ি যাবে তার পেছন পেছন সেই বাড়ি অব্দি পৌঁছবে। বাড়িতে কে আছে খোঁজখবর নেবে। আর মাঝে মাঝে আমাকে রিপোর্ট করবে।'

'ঠিক আছে স্যার।'

'আর হ্যাঁ, শোনো। যে কাজটা বললাম সেটা অনেক কাজ। এর জন্যে আরও কিছু টাকা তোমার অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে দেব। আগের টাকাটা পেয়েছিলে তো?'

আদিত্য মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে অসীম দত্তর দেওয়া অ্যাডভান্স এর একটা অংশ দিয়ে আপাতত সৈকত চৌধুরির কেসটার খরচ চালাবে। যাকে বলে ক্রস সাবসিডাইজেশন। অসীম দত্তর কেসটা হাতে না এলে বোধহয় সৈকত চৌধুরির কেসটা ছেড়েই দিতে হত।

বিল মিটিয়ে আদিত্য উঠে পড়তে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার ফোনটা বেজে উঠল।

'আমি প্রদীপ চক্রবর্তী বলছি। অনিতা চৌধুরির পড়শি। মনে আছে? সেদিন আপনি আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন?' ওপার থেকে শোনা গেল।

'অবশ্যই মনে আছে। বলুন কী ব্যাপার।' প্রদীপ চক্রবর্তীর কাছ থেকে ফোন পেয়ে আদিত্য একটু অবাকই হয়েছে।

'কিছু কথা আপনাকে বলার ছিল যেগুলো সেদিন বলা হয়নি। আসলে সেদিন আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না কথাগুলো আপনাকে বলা ঠিক হবে কিনা। আপনি চলে যাবার পর অনেক ভাবলাম। আমার স্ত্রীর সঙ্গেও পরামর্শ করলাম। মনে হল, কথাগুলো আপনাকে জানানো দরকার। আমার স্ত্রীও তাই বলল। তারপর অনিতার কাছ থেকে আপনার ফোন নম্বর নিয়ে আপনাকে ফোন করছি।'

'বুঝতে পারছি। তা কবে দেখা হলে আপনার সুবিধে হবে?'

'আগামীকাল হতে পারে কি? আসলে, পরশু মানে শুক্রবার থেকে কয়েকদিন আমরা একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ব। তার আগে হলে ভাল হয়। মাঝে তো একটাই দিন। বেস্পতিবার।'

আদিত্যর মনে পড়ে গেল আগামীকাল, অর্থাৎ বেস্পতিবার, সকালে অচিন্ত্য সাহার সঙ্গে মণিময় গুপ্তর বাড়িতে যাওয়ার কথা। ওখানে কতক্ষণ লাগবে কে জানে! বেস্পতিবার অন্য কোনও কাজ না রাখাই ভাল।

সে বলল, 'বেস্পতিবারটা একটু অসুবিধে আছে। আর আপনারা তো শুক্রবার থেকে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন বলছেন। সেক্ষেত্রে আজই করতে হবে। আমি এখন ভবানীপুর অঞ্চলে রয়েছি। আপনাদের অসুবিধে না হলে আধঘণ্টার মধ্যে আপনাদের বাড়ি পৌঁছে যেতে পারি।'

'আপনি যদি আজই আসেন তাহলে তো খুবই ভাল হয়। এখন এলে আমাদের কোনও অসুবিধেই নেই। আসলে রাখি, মানে আমার স্ত্রী, এত অসুস্থ থাকে যে ওকে একা বাড়িতে রেখে বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে পারি না। নাহলে আমিই আপনার কাছে চলে যেতাম।'

'তাহলে ওই কথাই রইল। আমি আধঘণ্টার মধ্যে আপনাদের বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছি।'

'একটা জিনিস। এই ব্যাপারটা আমি কিন্তু অনিতাকে কিছু বলিনি। আমার কথাগুলো শুনলেই আপনি বুঝতে পারবেন কেন বলিনি। অনিতার কাছ থেকে আপনার ফোন নম্বরটা নেবার সময় বলেছি আমার এক বন্ধুর নম্বরটা দরকার।'

'আপনাদের বাড়িতে ঢোকার সময় অনিতা যদি আমাকে দেখতে পায়?'

'অনিতা বাড়িতে নেই। সন্ধের আগে ফিরবে না।'

আদিত্যর আশঙ্কা সত্যি প্রমাণ করে বৃষ্টি নামল। ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে আদিত্য দোকান থেকে বেরিয়ে পড়তে যাচ্ছিল। আবার দোকানে ঢুকে পড়তে হল। বেশ জোরে বৃষ্টি পড়ছে। পুরোনো বাড়ির ওপর বৃষ্টি পড়লে তাদের খুব রহস্যময় দেখায়। একটা ষাঁড় রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে নির্বিকারভাবে ভিজে যাচ্ছে। হয়তো ভিজতে ওর ভালোই লাগছে। দুটো কাক ছাদের কার্নিশে বসে ঠোঁট দিয়ে পালক পরিষ্কার করছে। উল্টোদিকের বাড়িতে বেশ শব্দ করে একটা জানালা বন্ধ হল। তারপর আর কোনও শব্দ নেই। শুধু বৃষ্টির ঝুপঝুপ শব্দ। আদিত্যর সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু দোকানের ভেতরে সিগারেট খেতে দেয় না।

মিনিট দশেক পরে যখন বৃষ্টির বেগ কমল তখন রাস্তার ধারে একটু একটু জল জমতে শুরু করেছে। আদিত্য আর অপেক্ষা না করে জোরে হাঁটা লাগাল। বৃষ্টি এখনও পুরো থামেনি। নেতাজি ভবন স্টেশনে

পৌঁছতে পৌঁছতে আদিত্য বেশ ভিজে গেছে। স্টেশনে ঢোকার আগে আদিত্য রাস্তার ধারের একটা দোকান থেকে একটা ফোল্ডিং ছাতা কিনে ফেলল। বলা যায় না, আবার যে কোনও সময় বৃষ্টি নামতে পারে।

'আপনাকে কষ্ট দিলাম বলে ক্ষমা চাইছি। আসলে সেদিন অনিতার সামনে কথাগুলো বলা যেত না।' প্রদীপ চক্রবর্তী চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে বললেন।

রাখি চক্রবর্তী এ-ঘরে নেই। তিনি পাশের ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছেন। গতকাল একটা কেমোথেরাপি নেবার পর এখন দু-একদিন তাঁর শরীরটা খারাপ থাকবে। প্রদীপ চক্রবর্তী নিজেই চা করে এনেছেন।

আদিত্য কিছু বলল না, উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে রইল।

'আসলে সেদিন একটা দরকারি কথা বলা হয়নি যেটা অনিতার সামনে বলা যেত না।'

আদিত্য এখনও উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে।

'কথাটা সৈকতের লাইফ ইনশিয়োরেন্স করা নিয়ে। আপনি নিশ্চয় জানেন, মারা যাবার কিছুদিন আগে সৈকত পাঁচ কোটি টাকার একটা লাইফ ইনশিয়োরেন্স করেছিল। সৈকত এত টাকার ইনশিয়োরেন্স করতে গেল কেন? আর ইনশিয়োরেন্স করার কিছুদিনের মধ্যেই যখন সৈকত খুন হল, তখন অনিবার্যভাবে প্রশ্ন উঠবে, এর পেছনে কি কোনও ফাউল প্লে আছে?'

'এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমিও ভেবেছি। এখনও কোনও উত্তর পাইনি। আপনার কাছে যদি কোনও উত্তর থাকে সেটা জানতে পারলে আমার খুবই উপকার হবে।' আদিত্য এতক্ষণ পরে মুখ খুলল।

'উত্তর আমার কাছে নেই। হয়তো আমি যেটুকু জানি সেটা বললে উত্তর পাওয়া দূরে থাক ব্যাপারটা আরও ঘেঁটে যাবে। তবু মনে হল, আপনাকে সবটা খুলে বলা দরকার।'

'বলুন, বলুন। আমি তো শুনতেই এসেছি।'

'দেখুন, পলিসি করার কয়েকদিন আগে সৈকত আমার কাছে এসে বলেছিল তার কিছু কথা বলার আছে। ব্যাপারটা গোপনীয়। সে আমার পরামর্শ চায়। সৈকতের সঙ্গে সেদিন কী কথা হয়েছিল সেটা এখানে বিশদে বলার দরকার নেই। মোদ্দা কথাটা হল, সৈকত মনে করছিল কেউ তাকে প্রাণে মেরে ফেলতে চায়। দু-দুবার তার ওপর খুনের চেষ্টা হয়েছে। একবার একটা গাড়ি তাকে প্রায় চাপা দিয়ে দিচ্ছিল। আর একবার একটা ছাতের ওপর থেকে কেউ তার মাথায় ভারী লোহা-লক্কড় ফেলার চেষ্টা করেছিল, সে অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে। তার মনে হচ্ছিল, শিগগির আবার একটা চেষ্টা হতে পারে। তাই সে একটা খুব মোটা টাকার লাইফ ইনশিয়োরেন্স করতে চায়। যাতে তার কিছু হয়ে গেলে অনিতার কোনও টাকা-পয়সার অসুবিধে না হয়।'

'কারা তাকে মারতে চায় সে ব্যাপারে কি সৈকতের কোনও ধারণা ছিল?'

সৈকত একেবারে নিশ্চিত ছিল না। তবে তার পার্টনার মণিময় গুপ্তর ওপর তার একটা সন্দেহ ছিল। ডিটেলে সে আমাকে ব্যাপারটা বলেনি, কিন্তু যা আভাস দিয়েছিল তাতে মনে হয় সৈকত মনে করত মণিময় তাকে কোনওভাবে ঠকিয়েছিল। এবং সেটা সৈকত ধরেও ফেলেছিল। ব্যাপারটা জানাজানি হবার আগেই হয়তো তাই মণিময় বা তার লোক সৈকতকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল।'

'সৈকত যে মণিময়কে সন্দেহ করত সেটা অনিতাও আমাকে বলেছে। তাহলে তার সামনে এইসব কথা বলতে আপনার অসুবিধে কেন?' আদিত্য সন্দেহের গলায় জিজ্ঞেস করল।

'আমি তো পুরোটা এখনও বলিনি। সৈকত মণিময় গুপ্তকে যেমন সন্দেহ করত তেমনি ইদানীং অনিতাকেও কিছুটা সন্দেহ করতে শুরু করেছিল। ব্যাপারটা বেশ জটিল। আমি আমার মতো করে যেটুকু বুঝতে পেরেছি, বলছি। কোনও কারণে, কী কারণে আমার জানা নেই, কিছুদিন যাবত সৈকত বেশ ডিপ্রেসড থাকত।'

'কবে থেকে ডিপ্রেসড থাকত?'

'একেবারে সঠিক তো বলতে পারব না, মোটামুটিভাবে খুন হবার সাত-আট মাস আগে থেকে সৈকতের ব্যবহারে একটা পরিবর্তন আমরা লক্ষ করেছিলাম। এটা নিয়ে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অনেকবার কথাও হয়েছিল। সৈকত অনেক চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল, বলা যায় নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল।'

'তারপর?' আদিত্য ব্যগ্র হয়ে শুনছিল।

'আমার ধারণা, সৈকত নিজেকে গুটিয়ে নেবার ফলে অনিতার সঙ্গে তার সম্পর্কটাতেও ধীরে ধীরে চিড় ধরছিল। ঠিক এই সময় অনিতার এক পুরোনো বন্ধু সমীর প্যাটেল অনিতার সঙ্গে যোগাযোগ করে। সে নিজে থেকে যোগাযোগ করে, নাকি অনিতাই তার সঙ্গে যোগাযোগ করে, আমি বলতে পারব না। হয়তো সৈকত মানসিকভাবে দূরে সরে যাবার ফলে অনিতাই অন্য কারও অবলম্বন খুঁজছিল। যাই হোক, গত সাত-আট মাসে ওদের সম্পর্কটা মনে হয় অনেকটাই গভীর হয়েছে। সমীর এখনও নিয়মিত এখানে অনিতার সঙ্গে দেখা করতে আসে।'

'সৈকত কি আশঙ্কা করত অনিতা আর তার বন্ধু সমীর মিলে তাকে খুন করতে পারে?'

'সৈকত সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দিত না। এটা নিয়ে ওর সঙ্গে আমার কয়েকবার কথা হয়েছে। সৈকত খোঁজ নিয়ে জেনেছিল এই সমীর প্যাটেল ছেলেটা বিশেষ কিছু করে না। সেক্ষেত্রে সৈকতের অবর্তমানে সে যদি অনিতাকে বিয়ে করতে পারে, তাহলে তো তার একসঙ্গে রাজত্ব এবং রাজকন্যা দুটোই পাওয়া হয়ে যাবে। কোম্পানির অর্ধেক মালিকানা তো সৈকতেরই ছিল, যার একমাত্র ওয়ারিশ অনিতা। এমন হতে পারে, সমীর একাই সৈকতকে খুন করার প্ল্যান করেছিল। তার প্ল্যান সম্বন্ধে অনিতাকে কিছু বলেনি।'

'আচ্ছা, একটা জিনিস বলুন তো। সৈকত যদি তার বউকে সন্দেহই করবে তাহলে সে ইনশিয়োরেন্স পলিসির বেনিফিশিয়ারি করতে গেল কেন?'

'এই প্রশ্নটা তো আমার মনেও এসেছিল। প্রশ্নটা আমি সৈকতকে করেও ছিলাম। সৈকত একটা অদ্ভুত উত্তর দিয়েছিল। সৈকত বলেছিল, ইনশিয়োরেন্সের টাকা পাওয়া অত সহজ নয়, বিশেষ করে টাকার অঙ্কটা যখন পাঁচ কোটি। যদি তার কিছু হয়ে যায়, ইনশিয়োরেন্স কোম্পানির ডিটেকটিভ সত্যিটা টেনে বার করবেই। যদি দেখা যায়, অনিতা নির্দোষ, সৈকত তাকে মিথ্যে মিথ্যে সন্দেহ করছে, তাহলে ন্যায়সংগত ভাবেই অনিতা টাকাটা পাবে। আর যদি তা না হয়, তা হলে অনিতাকে তার কৃতকর্মের জন্যে শাস্তি পেতে হবে। সৈকত বলেছিল, আসল সত্যিটা যাতে তার মৃত্যুর পরে ঠিকমতো প্রকাশ পায়, সেই জন্যেই সে পলিসিটা কিনছে।'

'ভারি অদ্ভুত যুক্তি তো। খুন যে সে হবেই এটা তো সৈকত নিশ্চিতভাবে জানত না। হয়ত যে ঘটনাগুলো থেকে সৈকতের মনে হয়েছিল তাকে খুন করার চেষ্টা করা হচ্ছে, সেগুলো বিশুদ্ধ দুর্ঘটনা। কাকতালীয়। আমি ধরে নিচ্ছি পাঁচ কোটি টাকার পলিসির প্রিমিয়ামটাও অনেক হবে। নেহাত একটা সন্দেহের বশে সৈকত এতগুলো টাকা প্রিমিয়াম দিয়ে যেত?'

'স্বীকার করছি, এই প্রশ্নের উত্তরটা আমার জানা নেই।' প্রদীপ চক্রবর্তী আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বললেন।

'আচ্ছা, অনিতা কি সৈকতের ইনশিয়োরেন্সের ব্যাপারটা জানত? মানে, সৈকত খুন হবার আগে কি অনিতা জানত তার স্বামী পাঁচ কোটি টাকার একটা ইনশিয়োরেন্স করেছে যার নমিনি সে নিজে?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'অনিতা আমাকে বলেছে সৈকত মারা যাবার আগে সে ইনশিয়োরেন্সের ব্যাপারটা কিছুই জানত না।'

'অনিতা আমাকেও তাই বলেছে।' আদিত্য মৃদু স্বরে বলল।

প্রদীপ চক্রবর্তী খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'কিন্তু সৈকত আমাকে বলেছিল সে পলিসির ব্যাপারটা অনিতাকে জানিয়ে দিয়েছে। সেক্ষত্রে প্রশ্ন হচ্ছে অনিতা আমাদের মিথ্যে কথা বলল কেন?'

আদিত্য ঘড়ির দিকে তাকাল। প্রায় চারটে বাজে। সন্ধেবেলা কেয়াকে নিয়ে একটা জায়গায় যেতে হবে। তার মানে এক্ষুনি উঠে পড়া দরকার। সে বলল, 'প্রদীপবাবু আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার সঙ্গে কথা বলে অনেকগুলো নতুন দিক খুলে গেল। আজ উঠি। একটু তাড়া আছে।'

প্রদীপ চক্রবর্তী বললেন, 'রবিবার আমরা কয়েকদিনের জন্যে কলকাতার বাইরে যাচ্ছি, তাই জোরাজোরি করে আপনাকে আসতে বললাম। আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব স্বস্তি লাগছে।'

'কোথাও বেড়াতে যাচ্ছেন?' আদিত্য হালকাভাবে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ। বেড়াতেই যাচ্ছি। কোথাও তো যাওয়া হয় না। ভাবলাম, কটা দিন সমুদ্রের ধারে ঘুরে এলে রাখির ভাল লাগবে। ওর পরের কেমোটা মাসখানেক বাকি। তার অনেক আগেই চলে আসব।'

'কোথায় যাচ্ছেন?' আদিত্য কিছুটা কৌতূহলী।

'খুব দূরে কোথাও নয়। বাঙালিরা যেখানে যায়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম যেখানে যাচ্ছে। সেই পুরী।'

'পুরী?' আদিত্যর কৌতূহল বাড়ছে।

'ঠিক পুরী নয়। পুরী আর কোনারকের মাঝামাঝি একটা কোথাও সমুদ্রের ধারে একখানা নতুন রিসর্ট হয়েছে। সেখানে দিন চারেকের জন্য যাচ্ছি।'

'গোল্ডেন স্যান্ড রিসর্ট?'

'হ্যাঁ। ওখানেই তো যাচ্ছি। আপনি এটার নাম জানলেন কী করে? অবশ্য মাস দুয়েক ধরে খবর কাগজে এটার খুব বিজ্ঞাপন দিচ্ছে।'

'আপনি কি কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে ঠিক করলেন এখানে যাবেন?'

'ঠিক তা নয়। অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম রাখিকে নিয়ে কটা দিন কলকাতার বাইরে ঘুরে আসব। তারপর একদিন কাগজে এই বিজ্ঞাপনটা দেখলাম। ফোন করে খবর নিলাম। ওরা দুজনের জন্যে চারদিনের প্যাকেজের যে দামটা বলল, আমি দেখলাম সেটা দেওয়া আমার ক্ষমতার বাইরে। কথায় কথায় সেটা সৈকতকে বলেছিলাম। সৈকত বলল, আরে এ তো সেই অসীম দত্তর হোটেল। অসীম দত্ত আমার খুব চেনা লোক। দেখি, আপনাদের একটা ডিসকাউন্ট জোগাড় করে দিতে পারি কিনা।

'পেলেন ডিসকাউন্ট?'

'না পেলে আর যাচ্ছি কী করে?

'ওখানে গিয়ে হয়তো দু-একজন চেনাও বেরিয়ে পড়তে পারে।'

'হ্যাঁ, তা পারে। কলকাতা থেকেই তো বেশিরভাগ লোক যাবে। তার মধ্যে দু-একটা চেনা বেরিয়ে যাওয়া আশ্চর্য কী? তবে আমরা খুব বেশি লোককে তো চিনি না।'

আদিত্য আর কিছু ভেঙে বলল না। বিয়ের পরে সে এই প্রথম বউ নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছে, চেনা লোকের থেকে যতটা লুকিয়ে থাকা যায় ততই ভাল। তবে সত্যিই তারা লুকিয়ে থাকতে পারবে কি?

(৩)

রাত্তিরেও বৃষ্টি হয়েছিল। তার ফলে শীতটা আবার জাঁকিয়ে পড়েছে। আদিত্য একটা হাফ সোয়েটার চাপিয়ে বেরোতে যাচ্ছিল, কেয়ার জোরাজোরিতে একটা পুলওভার পরতেই হল। পুলওভারটা রীতিমতো সৌখিন, সোজা-উল্টো দু'দিকে পরা যায়। বলাই বাহুল্য এটা কেয়াই কিনে দিয়েছে। অত সৌখিন পুলওভার পরে তদন্তে যাবার ব্যাপারে আদিত্যর সংকোচ ছিল। কিন্তু ওটা ছাড়া যে ফুলহাতা সোয়েটারটা আদিত্যর আছে সেটা এতটাই পুরোনো এবং বিবর্ণ হয়ে গেছে যে কেয়া কিছুতেই ওটা পরতে দিল না।

মণিময় গুপ্তর বাড়ি লেক রোডে। রাস্তাটা লেক মার্কেটের গা দিয়ে বেরিয়েছে বটে কিন্তু ওই অঞ্চলে থেমে থাকেনি। প্রথমে খানিকটা সোজা গিয়ে, শরৎ বসু রোড পার হয়ে বাঁক নিতে নিতে বিবেকানন্দ পার্কের পাশ দিয়ে সাদার্ন এভিনিউতে গিয়ে পড়েছে। অচিন্ত্য সাহার ভ্যান দেশপ্রিয় পার্কের উল্টো দিক দিয়ে শরৎ বসু রোডে ঢোকার পর একটু এগোতেই লেক রোডের মোড়টা পেয়ে গেল। সেখান থেকে বাঁ দিকে গেলেও লেক রোড, ডান দিকে গেলেও। বাঁ দিকে বিবেকানন্দ পার্ক, ডান দিকে লেক মার্কেট। যখন তারা দাঁড়িয়ে ভাবছে কোন দিকে যাবে, একটি অল্পবয়সি ছেলে সাহায্যের জন্যে নিজের থেকেই এগিয়ে এসেছে। ঠিকানাটা দেখে সে বলল আদিত্যদের বাঁ দিকেই যেতে হবে। বাঁদিকের রাস্তাটা ডানদিকের তুলনায় অনেক অভিজাত। মিনিট তিনেক গিয়েই রাস্তার ডানদিকে বাড়িটা পাওয়া গেল।

দোতলা বাড়ি। সদ্য রং হয়েছে। একতলায় একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি কফিশপ। দু-চারজন হাল ফেশানের যুবক-যুবতী কফি খাচ্ছে। কফিশপের পাশ দিয়ে গেট, গাড়ি ঢোকার রাস্তা, বাড়ির পেছনে যাবার পথ। একতলার পেছন দিকে একটা ফ্ল্যাট আছে, কোলাপসিবল গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকলে তার বন্ধ দরজায় ধাক্কা খেতে হবে। বন্ধ দরজার সামনে দিয়ে দোতলার সিঁড়ি উঠে গেছে। কোলাপসিবল গেট দিয়ে ঢোকার মুখে দেয়ালে দুটি নেমপ্লেট। তার একটিতে লেখা এস সুব্রমনিয়ম, গ্রাউন্ড ফ্লোর, অন্যটিতে মণিময় গুপ্ত, ফার্স্ট ফ্লোর। অর্থাৎ পুরো দোতলা জুড়ে একটাই ফ্ল্যাট এবং সেটিতে মণিময় গুপ্ত থাকেন।

ড্রাইভওয়ে দিয়ে পুলিশের গাড়ি ঢুকতে দেখে দারোয়ান এগিয়ে এসেছিল।

'কাউকে খুঁজছেন স্যার?' দরোয়ান হাত কচলাতে কচলাতে বলল।

'মণিময় গুপ্ত তো দোতলায় থাকেন?' অচিন্ত্য সাহার গলায় পুলিশি ধমক।

'থাকেন স্যার। কিন্তু এখন তো নেই। জানুয়ারির গোড়া থেকে উনি দেশের বাইরে আছেন।'

'কোথায় গেছেন কিছু বলে গেছেন?' আদিত্য স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞেস করল।

'না স্যার। বলে তো জাননি। উনি মাঝে মাঝেই এরকম চলে যান। কোথায় যাচ্ছেন কিছু বলে যান না। শুধু বলেন দেশের বাইরে যাচ্ছেন, দেড়-দুমাস বাদে ফিরবেন। দুমাস তো প্রায় হতে চলল। এবার মনে হয় ফিরে আসবেন।'

'ওঁর কোনও ঠিকানা বা ফোন নম্বর দিয়ে গেছেন, যেখানে ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে?' অচিন্ত্যর গলায় কড়া ভাবটা এখনও যায়নি।

'না স্যার।'

'মণিময় গুপ্তর বাড়ির চাবি তোমার কাছে আছে? আমরা বাড়িটা সার্চ করব।' অচিন্ত্য তীক্ষ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল।

'চাবি তো আছে, কিন্তু সাহেবকে জিজ্ঞেস না করে কীভাবে দেব? আমার চাকরি চলে যাবে।'

'শোনো, আমরা গড়িয়াহাট থানা থেকে একটা খুনের মামলার তদন্ত করতে এসেছি। আমাদের সঙ্গে সার্চ ওয়ারেন্ট আছে। দরকার হলে আমরা নিজেরাই দরজা খুলে নিতে পারি। কিন্তু তুমি যদি চাবিটা দিয়ে দাও তাহলে আমাদের কাজটা সহজ হয়ে যায়। আর যদি না দাও তাহলে ধরে নেব তুমি পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করছ না। পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা না করার মানে জান? আমরা তোমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে লক আপ-এও পুরে দিতে পারি।' অচিন্ত্য সাহা ঠান্ডা গলায় বলল।

দরোয়ান লোকটা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝে উঠতে পারছে না কী করবে। এক দিকে চাকরি যাবার ভয়, অন্য দিকে জেলে যাবার। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় ভয়টা প্রথমটাকে হারিয়ে দিল।

লোকটা বলল, 'একটু দাঁড়ান স্যার। পাম্পের ঘরে চাবিটা আছে। আমি নিয়ে আসছি।'

পাম্পের ঘর গ্যারেজের পাশে। পাশাপাশি দুটো গ্যারেজ। একটাতে একটা হন্ডা সিটি দাঁড় করানো আছে। অন্য গ্যারেজটা ফাঁকা। আদিত্য আন্দাজ করল ফাঁকা গ্যারেজটা গ্রাউন্ড ফ্লোরের সুব্রমনিয়মের। তিনি নিশ্চয়

গাড়ি নিয়ে কাজে বেরিয়ে গেছেন। হন্ডা সিটিটা মণিময়ের। অনেক দিনের জন্যে বিদেশ গেলে লোকে গাড়ি গ্যারেজে রেখে ট্যাক্সি করে এয়ারপোর্ট যায়।

মণিময় গুপ্তর ফ্ল্যাটটা রীতিমতো বড়, সৈকত চৌধুরির ফ্ল্যাটের প্রায় দ্বিগুণ হবে। আদিত্য ভাবছিল, সৈকত আর মণিময়ের তো একই রকম রোজগার, তাহলে দুজনের জীবনযাত্রায় এত তফাত হয় কী করে? সে অচিন্ত্য সাহাকে বলল, 'ফ্ল্যাটটা ভাল করে খুঁজলে হয়তো মণিময় কোথায় গেছে তার কিছু হদিশ পাওয়া যাবে।'

সদর দরজা দিয়ে ঢুকেই একটা মস্ত বসার ঘর। এক কোণে পার্টিশানের আড়ালে খাবার টেবিল। তার পাশে একটা রেফ্রিজারেটারও আছে। আদিত্য রেফ্রিজারেটারের দরজা খুলে দেখল সেটা প্রায় ফাঁকা, আলোও জ্বলছে না। তার মানে বাড়ির মালিক রেফ্রিজারেটার খালি করে, তার সুইচ অফ করে দিয়ে চলে গেছে। অর্থাৎ অনেক দিনের জন্যে সে বাইরে থাকার প্ল্যান করেছে। সোফা এবং সেন্টার টেবিলের ওপরে হালকা ধুলো, খাবার টেবিল-চেয়ারের ওপরেও। একটা অস্বস্তিকর ভ্যাপসা গন্ধ হাওয়ায় ভাসছে। দরজা জানলা অনেক দিন ধরে বন্ধ থাকলে ঘরে যেমন গন্ধ হয়। আদিত্য দরজা জানলাগুলো খুলে দিল। দরজা খুললে বারান্দা। আদিত্য বারান্দায় গিয়ে দেখল নীচে ফুটপাতের ওপর ছাতার তলায় কফিশপের খদ্দেররা কফি খাচ্ছে।

বসার ঘর ছাড়াও ফ্ল্যাটে তিনটে শোবার ঘর আছে। তিনটেই তালাবন্ধ। সৌভাগ্যবশত, যে চাবির গোছাটা দারোয়ান দিয়েছিল তাতে তিনটে শোবার ঘরের চাবিই খুঁজে পাওয়া গেল। দুটো শোবার ঘর খুব একটা ব্যবহৃত নয়। হয়তো অতিথি এলে সেখানে তাদের থাকতে দেওয়া হতো। তৃতীয়টা মাস্টার বেডরুম। অন্য দুটোর থেকে অনেকটা বড়। পরিষ্কার বোঝা যায়, এটা মণিময় গুপ্তর শোবার ঘর।

বিছানার ওপর দু-একটা জামাকাপড় ছড়িয়ে আছে। মেঝেতে একটা চেন-খোলা ব্যাগ। সম্ভবত চলে যাবার আগে জিনিসপত্র প্যাক করার সময় ব্যাগটা নামানো হয়েছিল। এই জামাকাপড়গুলোও। শেষ মুহূর্তে এগুলো আর নেওয়া হয়নি। ঘরে দুটো লোহার আলমারি। তাদের চাবি একটা ড্রয়ারের মধ্যে পাওয়া গেল। ভিতরে কিছু কাগজপত্র, মণিময় গুপ্তর নানা পরীক্ষার সার্টিফিকেট, কয়েকটা ড্রয়িং, দুটো পুরোনো অ্যালবাম ছাড়াও কয়েকটা দামি হাতঘড়ি, হ্যাঙারে ঝোলানো স্যুট, টাই এইসব রয়েছে। কিন্তু এমন কিছু নেই যা থেকে মণিময় গুপ্তর বর্তমান ঠিকানাটা পাওয়া যেতে পারে।

শোবার ঘরের সাইড টেবিলে একটা ডেস্কটপ কম্পিউটার আছে। অচিন্ত্য সাহা সেটা চালু করার চেষ্টা করতে গিয়ে হোঁচট খেল। কম্পিউটারটা পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড।

আদিত্য বলল, 'দরকার হলে কাউকে দিয়ে এটাকে খুলিয়ে দেখতে হবে ভিতরে কী আছে। তবে এক্ষুনি সেটার দরকার হবে বলে মনে হয় না।'

অচিন্ত্য সাহা ঘাড় নাড়ল। তারপর দেয়ালের সঙ্গে লাগানো ক্লজেটের পাল্লা খুলে বলল, 'দেখুন, অনেকগুলো হ্যাঙার খালি। মনে হয় এগুলোতে যে জামা-প্যান্ট ঝোলানো ছিল, সেগুলো মণিময় গুপ্ত সঙ্গে নিয়েছে।'

এবার আদিত্য ঘাড় নাড়ল। বসার ঘর, মাস্টার বেডরুম তন্নতন্ন করে খুঁজেও কাজের কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। আদিত্য বলল, 'চলুন, গেস্ট রুম দুটো আর একবার দেখি। যদি কিছু পাওয়া যায়।' তার গলায় হতাশা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'তার আগে একটু চা খেলে হত।' অচিন্ত্য সাহা বলল।

'চা? খেলে তো খুবই ভাল হত, কিন্তু এখানে চা কোথায় পাবেন?' আদিত্যর গলায় সংশয়।

'রান্নাঘরে দেখলেন না? তাকে টি-ব্যাগের বাক্স আছে। আর স্টোভের ওপর একটা কেটলিও বসানো আছে। আশা করছি তাঁর টি-ব্যাগের বাক্স থেকে দুটো টি-ব্যাগ নিলে মণিময় গুপ্ত কিছু মনে করবেন না।'

উদ্যোগ নিয়ে অচিন্ত্য সাহাই চা বানাল। রান্নাঘরের শেলফ থেকে দুটো কাপও জোগাড় হল। খাবার টেবিলে বসে চা খেতে খেতে অচিন্ত্য সাহা বলল, 'আপনার কি মনে হয় মণিময় গুপ্তর সঙ্গে সৈকত চৌধুরি খুন হবার সত্যিই কোনও সম্পর্ক আছে? আমার তো স্যার এখনও মনে হয় ওই বউটাই তার ভালবাসার লোকের সঙ্গে মিলে সৈকতকে সরিয়েছে। মোটিভটা ওরই সব থেকে জোরাল।'

'অনিতা চৌধুরির মোটিভটা যে খুব স্ট্রং সেটা মানছি। কিন্তু গুপ্ত অ্যান্ড চৌধুরি কোম্পানির স্টাফেদের কথায় মনে হচ্ছে দুই পার্টনারের মধ্যে কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছিল। কী নিয়ে গণ্ডগোল হয়েছিল আমি এখনও জানতে পারিনি। অনিতা চৌধুরিকেও তার স্বামী বলেছিল তার পার্টনার তাকে ঠকিয়েছে। কীভাবে ঠকিয়েছে সেটা অনিতা বলতে পারেনি। আমার মনে হয়, একটু খোঁজখবর করলেই বেরিয়ে পড়বে কী নিয়ে দুই পার্টনারের মধ্যে অশান্তি। কিন্তু তার আগে জানা দরকার মণিময় গুপ্ত কোথায় ঘাপটি মেরে বসে আছে।'

'কিন্তু সৈকতকে মেরে মণিময় গুপ্তর কী লাভ? সৈকত মারা গেলে কম্পানিতে তার অংশটা তো অনিতা চৌধুরির হাতে চলে যাবে।'

'না, না, সেটা নয়। হয়ত মণিময় গুপ্ত কোম্পানির হয়ে এমন একটা ট্রানজাকশান করেছিল যেটা বেআইনি আর সেটা সৈকত জানতে পেরেছিল। কিম্বা হয়তো মণিময় গুপ্ত সৈকতকে তার প্রাপ্য থেকে কোনওভাবে বঞ্চিত করেছিল যেটা সৈকত বুঝতে পেরে যায়। আপনি তো সৈকত চৌধুরির বাড়ি গেছেন। সে কীভাবে থাকত আপনি দেখেছেন। তার পাশে যদি এই ফ্ল্যাটটাকে রাখেন তাহলে বুঝতে পারবেন দুজনের লাইফস্টাইলে কতটা পার্থক্য ছিল। এতটা পার্থক্য হল কী করে? মণিময়ের কি তাহলে বেআইনি ইনকাম আছে?'

কথা বলতে বলতে আদিত্য লক্ষ করল অচিন্ত্য সাহার চায়ের কাপটা খালি হয়ে গেছে। সে নিজের কাপের তলানিটা এক ঢোঁকে গিলে নিয়ে বলল, 'চলুন, ওঠা যাক। গেস্ট রুম দুটো আর একবার খুঁজে আসি।'

মাস্টার বেডরুমের তুলনায় গেস্ট রুম দুটো নিরাভরণ। দুটোতে প্রায় একই রকমের আসবাব। খাট, লেখার টেবিল, চেয়ার, একটা আরাম কেদারা, দেয়ালে লাগানো আয়না, ক্লজেট। তবে একটা ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন বাথরুম আছে, আর একটাতে নেই। যে ঘরটাতে সংলগ্ন বাথরুম নেই, আদিত্য লক্ষ করল, সেই ঘরের লেখার টেবিলের ড্রয়ারটা তালাবন্ধ। চাবির গোছার কোনও চাবি দিয়ে ড্রয়ারটা খুলল না। এদিক-ওদিক খুঁজেও ড্রয়ারের কোনও চাবি পাওয়া গেল না।

'এটা খোলার কোনও ব্যবস্থা করা যায়?' আদিত্য অচিন্ত্য সাহার দিকে তাকিয়ে বলল।

'খোলা খুব দরকার?' অচিন্ত্য সাহা যেন কী একটা বলতে গিয়ে ইতস্তত করছে।

'আমার মন বলছে এর ভিতরে দরকারি কিছু আছে। না হলে এটা তালাবন্ধ থাকত না। আর থাকলেও চাবিটা যত্ন করে লুকিয়ে রাখা হত না।'

'তাহলে তো খুলতেই হবে।'

অচিন্ত্য সাহা পকেট থেকে একটা বহুফলাযুক্ত ছুরি বার করল। তারপর মিনিট পাঁচেক ড্রয়ার এবং টেবিল-টপের মধ্যবর্তী অতি সংকীর্ণ ফাঁকটা দিয়ে নানা মাপের ফলা ঢুকিয়ে কসরত করতে করতে হঠাৎ খট করে ড্রয়ারটা খুলে ফেলল।

ড্রয়ারের ভিতরে একটা আই প্যাড। আর একটা খাম। খামের ভিতর মেয়েলি ছাঁদে লেখা একটা চিঠি। লেখিকা লিখছে, গতকাল রাত্তিরের প্রবল ঝড়বৃষ্টির পর মনে হচ্ছে তোমার মোবাইল টাওয়ার এবং ইমেল কানেকশন দুটোই গেছে। তোমাকে মোবাইলে ধরতে পারছি না, ইমেল করে উত্তর পাচ্ছি না। তাই এই চিঠিটা কুরিয়ার করে পাঠাচ্ছি। আশা করছি, পৌঁছবে। বলার কথা হলো, শান্তনু আরও তিনদিন কলকাতায় থাকছে। ফলে আমি চারদিনের আগে নরেন্দ্রপুর যেতে পারছি না। Love and million kisses মালা।

ভাগ্যক্রমে আইপ্যাডটা পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড নয়। আদিত্য আই প্যাডটা খুলেছে। ফোটোজ-এ ক্লিক করতে গোটা কুড়ি ছবি বেরিয়ে পড়ল। সবই একজন মহিলার। চল্লিশ পেরিয়েছে। সুন্দরী। কিছু ছবি একজন পুরুষের সঙ্গে। তার মধ্যে দু-চারটে ঘনিষ্ঠ হয়ে তোলা সেলফি। আদিত্য আন্দাজ করল পুরুষটি মণিময় গুপ্ত। আদিত্য ছবিগুলো অচিন্ত্য সাহাকে দেখাল।

'এই মণিময় গুপ্ত তো স্যার বিয়ে-সাদি করেনি। কিন্তু এসব দেখে মনে হচ্ছে লোকটা ডুবে ডুবে জল খেত।' বেশ কিছুক্ষণ নীরবতার পর অচিন্ত্য সাহার গলা শোনা গেল।

'হুঁ, তাই তো মনে হচ্ছে।' আদিত্য ছবিগুলো দেখতে দেখতে অন্যমনস্কভাবে বলল।

'আই প্যাডটা তো মালিকের অনুমতি ছাড়া আপনি নিতে পারবেন না। তার থেকে আমি ছবিগুলো নিজেকে হোয়াটসঅ্যাপ করে দিচ্ছি। দরকার মতো আপনি আমার কাছ থেকে নিয়ে নেবেন।' আদিত্য বলল।

আই প্যাডটায় ইন্টারনেট কানেকশান আছে। তাই হোয়াটসঅ্যাপ করা গেল। তবে ইমেলে পাসওয়ার্ড দিয়ে ঢুকতে হয়। ওটাতে ঢোকা গেল না।

'কুরিয়ারে পাঠানো চিঠিটা দেখুন।' আদিত্য অচিন্ত্য সাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 'প্রাপকের নাম যদিও মণিময় গুপ্ত, ঠিকানা লেখা আছে ২৪ রাজপুর রোড, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা ৭০০১০৩।'

'তার মানে নরেন্দ্রপুরে মণিময় গুপ্তর আর একটা বাড়ি আছে?' অচিন্ত্য সাহার গলায় আবিষ্কারের উত্তেজনা।

'একদম ঠিক ধরেছেন। এবং সেখানে গিয়ে খোঁজ-খবর করলে হয়তো মণিময় গুপ্তর হদিশ মিলতে পারে।'

'সেখানে কবে যাবেন?'

'আপনার যদি অসুবিধে না হয় তাহলে আজই, এক্ষুনি যেতে পারি। আমি পরশু একটা কাজে কিছুদিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছি। তার আগে এদিকের কাজগুলো যতটা সেরে ফেলা যায় তত ভাল।'

'আমার কোনও অসুবিধে নেই। আমি থানাতে বলেই এসেছি ফিরতে দেরি হবে। আমরা এখান থেকেই রওনা হয়ে যেতে পারি। কিন্তু এই চিঠির লেখিকা সম্বন্ধে কী যেন বলবেন বলছিলেন?'

'দেখুন, আমি যেটা বলছি সেটা আন্দাজে বলছি। আমার মনে হচ্ছে, এই মহিলার সঙ্গে মণিময় গুপ্তর একটা নিষিদ্ধ প্রেম আছে, যেটা সবার সামনে প্রকাশ করা যায় না। হয়তো ভদ্রমহিলা বিবাহিত। হয়ত নরেন্দ্রপুরের বাড়িটা ওদের গোপন মিলনের জায়গা।' আদিত্য সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল।

'আমরা তো ছবিগুলো দেখিয়ে নীচের ওই দরোয়ানটিকে জিজ্ঞেস করতে পারি সে এই মহিলাকে মণিময় গুপ্তর ফ্ল্যাটে কখনও আসতে দেখেছে কিনা।'

'অবশ্যই জিজ্ঞেস করতে পারি। তবে আমার স্থির বিশ্বাস দরোয়ান বলবে সে এই মহিলাকে কখনও দ্যাখেনি।'

আদিত্যর অনুমানই ঠিক হল। আদিত্যর হোয়াটসঅ্যাপ থেকে তিন-চারটে ছবি অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার পর দরোয়ান জানাল সে এই মহিলাকে কখনও এই বাড়িতে ঢুকতে দ্যাখেনি। তবে সে জোর দিয়ে বলল পুরুষ মানুষটি অবশ্যই মণিময় গুপ্ত।

'তবে রাত্তিরে আটটার পরে কেউ এলে আমি বলতে পারব না। আমার ডিউটি সকাল আটটা থেকে রাত্তির আটটা অবধি।' দরোয়ান সাবধানী গলায় বলল।

'রাত্তিরের দরোয়ান কত দূরে থাকে?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'অনেক দূরে স্যার। লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনে হোগলা বলে একটা স্টেশন আছে। গোচরণের পরের স্টেশন। সেই হোগলায় নেমে সাইকেলে আরও আধঘণ্টা যেতে হয়।'

'তোমার বাড়ি কোথায়?' অচিন্ত্য সাহার গলায় সেই পুরোনো ধমক।

'আমার বাড়ি এই কাছেই। পূর্ণ দাস রোডের একটা বস্তিতে।'

'আমার মনে হয়, রাত্তিরের দরোয়ানের সঙ্গে কথা বলার জন্যে আর একদিন আসতে হবে। ছবিগুলো আমি আপনাকে পাঠিয়ে দেব। আপনি যদি একবার সময় করে এসে রাত্তিরের দরোয়ানকে দেখাতে পারেন, ভাল হয়। সাউথ ক্যালকাটাটা আমার পক্ষে একটু দূর হয়ে যায়।' আদিত্য অচিন্ত্য সাহার দিকে তাকিয়ে বলল।

'সে আমি চলে আসব। গড়িয়াহাট থানা থেকে এটুকু আসতে আর কী এমন কষ্ট। তাহলে এখন কি আমরা নরেন্দ্রপুর রওনা দেব?'

(৪)

মেঘ কেটে গিয়ে রোদ্দুর উঁকি মারছে। অচিন্ত্য সাহার ভ্যান বাইপাসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে খোলা জানলা দিয়ে হাওয়ারা দৌড়ে এল। হাওয়াদের দাঁত আছে। তারা আদিত্যর মুখে চোখে গলায় কামড়ে ধরছিল। তবু আদিত্যর ভালই লাগছিল। যেন আদরের কামড়। তাই পেছনের সিটে একা বসে দু'দিকের জানলাই সে খোলা রেখেছে। অচিন্ত্য সাহা সামনে, ড্রাইভারের পাশে।

রাস্তার ধারে কোথাও কোথাও চাষি দম্পতি তাদের খেতের সবজি চুবড়ি করে বেচতে বসেছে। ফুলকপি, বাঁধাকপি, সিম, মুলো, টমেটো। আদিত্য রান্না করতে পারে না, কিন্তু টাটকা সবজি দেখলেই তার কিনতে ইচ্ছে করে। কী বিচিত্র রং, কী অপূর্ব রূপ। সবজিগুলোর গায়ে যেন এখনও ভোরের শিশির লেগে রয়েছে। সে একবার ভাবল অচিন্ত্য সাহাকে গাড়িটা থামাতে বলে কিছু সবজি কিনবে। তারপর ভাবল, থাক গে যাক, অচিন্ত্য সাহা কী মনে করবে, দরকার নেই। সে সামনে তাকিয়ে দেখল অচিন্ত্য সাহা নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

গাড়ি কামাল গাজির মোড় পেরিয়ে গেল। রাস্তা খানিকটা সরু হয়ে এসেছে। একটু পরেই রাজপুর এসে পড়বে। এখানে কোথাও একটা পাখিরালয় আছে। আদিত্য সেটার কথা শুনেছে কিন্তু কখনও আসা হয়নি। আচিন্ত্য সাহার ঘুম ভেঙে গেছে। সে বাঁ হাত দিয়ে মুখের গড়িয়ে পড়া লালা মুছতে মুছতে বাইরে তাকাচ্ছে। এবার বোধহয় কাউকে ঠিকানাটা জিজ্ঞেস করতে হবে।

বাড়িটা বড় রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা ভেতরে। লোকালয় ছাড়িয়েই বলা যায়। বসতি শেষ হয়ে একটা বড় ফলের বাগান— আমগাছ, লিচুগাছ, কাঁঠাল গাছ। তারপর ধানখেত শুরু হয়েছে। বাড়িটা ফলের বাগান পেরিয়ে ধানখেত শুরু হবার ঠিক আগে। পাঁচিল ঘেরা মস্ত জায়গা, তার মধ্যে বাড়ি। পাঁচিলটা খুব উঁচু নয়। পুলিশের ভ্যান থেকে ভিতরটা খানিকটা দেখা যায়। বাড়িতে ঢোকার মুখে লোহার গেট, তালাবন্ধ। গেটের সামনে দুটো ছেলে বসে গল্প করছিল। পুলিশের গাড়ি দেখে উঠে দাঁড়াল।

'এই, এটা মণিময় গুপ্তর বাড়ি?' অচিন্ত্য সাহা জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে ধমক লাগাল।

ছেলে দুটো পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। মনে হয়, পুলিশ দেখে খানিকটা ঘাবড়ে গেছে। শেষে একজন সাহস করে বলল, 'আমরা বাড়ির মালিককে চিনি না। আমরা শুধু এখানে বসে গল্প করছি। শিবুকাকা এই বাড়িটা দেখাশোনা করে। উনি বলতে পারবে।'

'শিবু থাকে কোথায়?' অচিন্ত্যর হুংকার।

'ওই তো আমবাগানটা পেরিয়ে। এখান থেকে তিন চার মিনিট। শিবুকাকার নাম শিবপদ।' এবার অন্য ছেলেটা মুখ খুলেছে।

'শিবুকাকাকে ডেকে নিয়ে আসতে পারবি? বলবি, পুলিশ এসেছে। বাড়ির মালিককে খুঁজছে। গেটের আর বাড়ির চাবিগুলো যেন নিয়ে আসে। আমরা বাড়ির ভেতরে ঢুকব।' আদিত্য নরম গলায় বলল।

'আমরা দুজনেই যাব?' এবার প্রথম ছেলেটার গলা। একা-একা পুলিশের কাছে বসে থাকতে সে মোটেই রাজি নয়।

'যা, দুজনেই যা। তবে তাড়াতাড়ি আসবি। আর শিবপদকে যদি বাড়িতে না পাস, এসে বলে যাবি।' অচিন্ত্য সাহা কিছু বলার আগেই আদিত্য দরাজ গলায় বলল।

মিনিট দশেক হয়ে গেল আদিত্য আর অচিন্ত্য সাহা বসে আছে, কেউ আর আসে না। ছেলে দুটো কি তাহলে কেটে পড়ল? আদিত্য একটা সিগারেট শেষ করে আর একটা ধরাবে কিনা ভাবছে এমন সময় দেখল আমবাগানের দিক থেকে একটা লোক লুঙ্গির কষি আঁটতে আঁটতে ছেলে দুটোর সঙ্গে এদিকে এগিয়ে আসছে। এ-ই নিশ্চয় শিবপদ।

'তুমি শিবপদ?' লোকটা কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে অচিন্ত্য সাহা অবস্থার দখল নিয়ে নিয়েছে।

'শিবুকাকা চান করতে ঢুকেছিল। তাই আসতে দেরি হয়ে গেল। আমরা বাড়ির বাইরেই বসেছিলুম। কোত্থাও যাইনি।' শিবপদ কিছু বলার আগেই প্রথম ছেলেটা বলল।

'আমিই শিবপদ।' ছেলেটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে লুঙ্গি পরা লোকটা বলল। 'কী ব্যাপার দাদাবাবু?' তার গলায় রীতিমতো উদ্বেগ।

'তুমি এই বাড়ির কেয়ারটেকার?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমিই এই বাড়িটা দেখাশোনা করি।'

'বাড়ির মালিক কোথায়?'

'উনি তো নেই। বাড়ি বন্ধ পড়ে আছে।'

'মালিকের নাম কী?'

'মালিকের নাম ঠিকানা এই কাগজটায় লেখা আছে। আমি নাম মনে রাখতে পারি না। তাই মালিককে বলেছি এই কাগজে নাম-ঠিকানা লিখে রাখতে। যদি কখনও দরকার হয়।' শিবপদ তার ফতুয়ার পকেট থেকে একটা দুমড়োনো কাগজ বার করে অচিন্ত্য সাহার হাতে দিল।

অচিন্ত্য সেটাতে চোখ বুলিয়ে আদিত্যর হাতে দিতে আদিত্য দেখল সেখানে মণিময় গুপ্তর নাম আর তার লেক রোডের বাড়ির ঠিকানা লেখা আছে।

'মালিক এখানে শেষ কবে এসেছিল?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'ঠিক বলতে পারব না। মাসখানেক হবে। মাস দেড়েকও হতে পারে। আমার ঠিক মনে থাকে না।'

'যাবার আগে মালিক তোমাকে বলে গিয়েছিল কোথায় যাচ্ছে?' অচিন্ত্য সাহা জিজ্ঞেস করল।

'না দাদাবাবু। মালিক কোথায় যাচ্ছে আমাকে কখনোই বলে না। কেনই বা বলবে? মালিক কখনও চাকরকে বলে যায় কোথায় যাচ্ছে? তবে...'

এইটুকু বলে শিবপদ চুপ করে কীযেন ভাবতে লাগল। আদিত্য বলল, 'তবে কী?'

'একটা জিনিস আমার বেশ অদ্ভুত লেগেছিল। সব সময় মালিক যাবার আগে আমাকে জানিয়ে যায়। বলে, বাড়িটার ওপর নজর রাখিস, আমি যাচ্ছি। আমি তখন মেন গেটে তালা লাগিয়ে দিই। এবার কিন্তু কিছু না বলেই মালিক চলে গেছে।'

'তারপর?' আদিত্য উদগ্রীব হয়ে শিবপদর কথা শুনছে।

'আগের দিনও মালিকের সঙ্গে কথা হয়েছে। পরের দিন সকালে পৌঁছে দেখি মেন গেট খোলা কিন্তু বাড়িতে ঢোকার দরজাটা বন্ধ। আমি মালিককে ফোন করলাম, কিন্তু ফোনটা বাজল না। আমি অনেকবার বেল বাজালাম, বাড়িতে ঢোকার দরজায় ধাক্কা মারলাম। কোনও সাড়াশব্দ নেই। তখন আমার কাছে বাড়িতে ঢোকার যে চাবিটা থাকে সেটা দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম। ঢুকে দেখি কেউ কোত্থাও নেই, বাড়ি ফাঁকা। তার মানে আমাকে না জানিয়েই মালিক চলে গেছে। হয়তো তাড়া ছিল। কিন্তু আমাকে একবার ফোন করে দিলেই তো আমি চলে আসতাম। সেই যে মালিক গেল, তারপর থেকে আর তার কোনও ফোন পাইনি, আমিও তাকে ফোনে ধরতে পারিনি। মালিককে ফোন করলে কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।'

'তুমি পুলিশকে খবর দাওনি কেন?' অচিন্ত্য গর্জন করে উঠল।

'পুলিশকে?' শিবপদ যেন ঠিক উত্তরটা দিতে ইতস্তত করছে।

'হ্যাঁ, পুলিশকে। কাউকে কিছু না বলে তোমার মালিক হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল, ফোনেও তাকে ধরা যাচ্ছে না, এই অবস্থায় পুলিশে একটা খবর দেওয়া তোমার উচিত ছিল না কি?' আদিত্যর গলা খানিকটা মৃদু।

'দাদাবাবু, আপনারা যখন জানতে চাইছেন তখন সত্যি কথাটা বলতেই হবে। সত্যি কথাটা হল আমার মালিক কোনও ব্যাপারেই পুলিশকে জড়াতে চাইত না। গত বছর এই বাড়িতে একটা বড় রকমের চুরি হয়েছিল। মালিকের একটা দামি ক্যামেরা, গান শোনার যন্ত্র, রান্নাঘরে খাবার গরম করার বাক্স আরও যেন কী কী, সবটা মনে পড়ছে না, চুরি হয়ে গেল। চোরেরা পাঁচিল টপকে এসে সদর দরজার তালা ভেঙে বাড়িতে ঢুকেছিল। পরদিন সকালে ব্যাপারটা আমার চোখে পড়ল। আমি মালিককে টেলিফোন করলুম। মালিক এসে সব দেখে-টেখে যা যা খোয়া গেছে তার একটা লিস্টি করল। তাতেই তো বুঝতে পারলাম কী কী চুরি গেছে। লিস্টি তৈরি হবার পর আমি মালিককে বললাম তাহলে এবার পুলিশে খবর দেওয়া যাক। শুনে মালিক তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। বলল, পুলিশের নাম যেন তার সামনে কখনও না করি। আমিও ঘাবড়ে গিয়ে চেপে গেলাম। তাই এবার যখন মালিক হঠাৎ উধাও হয়ে গেল তখন পুলিশের কাছে যাবার কথাটা আমার মাথায় এলেও সেটা করিনি। পুলিশের কাছে গেলে মালিক ফিরে এসে ভীষণ রাগ করত। তাছাড়া...' বলে শিবপদ চুপ করে গেল।

পাঁচিলের ভেতরে অনেকটা জমি। বাগান, পুকুর, ফলের গাছ, ব্যাডমিন্টন কোর্ট। মাঝখানে বাড়ি। কথা বলতে বলতে ওরা তিনজন প্রায় বাড়ির সদর দরজার কাছে চলে এসেছে। ছেলে দুটোও পেছন পেছন আসছে।

'এই, তোদের এখানে কী দরকার? যা, ভাগ।' শিবপদ পেছন ফিরে ছেলে দুটোকে ধমক লাগাল।

ধমক খেয়ে ছেলেগুলো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে গিয়ে আবার আদিত্যদের পেছন পেছন আসতে লাগল। গ্রামের মানুষদের অদম্য কৌতূহল। আদিত্যর মনে হচ্ছে শিবপদ কী যেন বলতে গিয়েও বলল না। সে শিবপদর দিকে ফিরে বলল, 'তুমি কী একটা বলতে চাইছিলে না?'

'না, না। আর কিছু বলতে চাইনি তো।' শিবপদ রক্ষণাত্মক স্বরে বলল।

'শোনো শিবপদ। তুমি যদি কোনও দরকারি কথা লুকিয়ে রাখ, পুলিশ সেসব কথা ঠিক টেনে বার করবে। তখন কিন্তু তোমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।' আদিত্য ভয় দেখানোর গলায় বলল।

'ওকে তুলে নিয়ে গেলেই তো হয়। দু-একটা কোঁতকা দিলে পেটের সব কথা হুড়হুড় করে বেরিয়ে পড়বে।' আচিন্ত্য সাহা আরও সরাসরি পদ্ধতিতে বিশ্বাসী।

কোঁতকার কথা শুনে শিবপদ ভয় পেয়েছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'ঠিক আছে। বলছি। আমি পুলিশের কাছে আরও যাইনি তার কারণ মেমসাহেব আমাকে পুলিশের কাছে যেতে বারণ করেছিল।'

'মেমসাহেব! কোন মেমসাহেব?' অচিন্ত্য সাহা অবাক।

'ওই যিনি মালিকের সঙ্গে থাকত। মালিক এখানে এলে সাধারণত টানা এক-দেড় মাস থেকে যেত। তখন মেমসাহেব এসে মালিকের সঙ্গে থেকে যেত। মালিক চলে যাবার পরের দিনও মেমসাহেব এসেছিল। এসে শুনল মালিক নেই। শুনে অবাক হয়ে গেল। ওর কথা শুনে মনে হল মালিকই ওকে আসতে বলেছিল। এটা তো তাজ্জব ব্যাপার। মেমসাহেবকে আসতে বলে মালিক নিজেই হাওয়া হয়ে গেল? আমি তখন মেমসাহেবকে বললাম পুলিশে একটা খবর দিই। মেমসাহেব আঁতকে উঠে বলল, না, না। পুলিশকে কিছু জানাবার দরকার নেই। ওরা এসে আরও ঝামেলা পাকাবে। আমিও তাই আর পুলিশকে কিছু বলিনি।'

'তারপরে আর মেমসাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল? মানে উনি আর এখানে এসেছিলেন?'

'উনি আর এখানে আসেনি। কিন্তু সাহেব ফিরেছে কিনা জানতে চেয়ে মাঝে মাঝে আমাকে ফোন করে।'

'তোমার কাছে ওনার ফোন নম্বরটা আছে? নম্বরটা আমাদের লাগবে।'

'আজ সকালেই তো ফোন করেছিল। মোবাইলে নম্বরটা তোলা আছে। আমি ইংরিজি পড়তে পারিনা। মোবাইল দেখে আপনাদের লিখে নিতে হবে।'

শিবপদ ফতুয়ার পকেট থেকে চাবি বার করে সদর দরজাটা খুলতে যাচ্ছিল। ভারী সেগুন কাঠের দরজায় দামি ইয়েল লক বসানো। মনে হয়, বাড়িতে একবার চুরি হয়ে যাবার পর গৃহকর্তা অধিকতর সাবধান হয়েছেন।

আদিত্য হঠাৎ পকেট থেকে মোবাইলটা বার করে মণিময় গুপ্তর বাড়িতে পাওয়া কয়েকটা ছবি শিবপদকে দেখাল। বলল, 'ইনিই কি তোমাদের মেমসাহেব?'

শিবপদ ছবিগুলো দেখছে তো দেখছেই। তারপর একসময় সে বলল, 'হ্যাঁ, ইনিই তো আমাদের মেমসাহেব।'

বাড়ির ভেতরে ঠিক সেইরকম একটা ভ্যাপসা গন্ধ যেমনটা মণিময় গুপ্তর লেক রোডের বাড়িতে পাওয়া গিয়েছিল। বোঝা যায়, বাড়িতে অনেকদিন কেউ বাস করেনি। ঢুকেই বসার ঘর, সেটা পেরিয়ে বাড়ির অন্দরমহলে যেতে হয়। বসার ঘরে একপ্রস্ত সোফা সেট, দুটো আরাম কেদারা, বইএর র‍্যাকে কিছু বিলিতি বেস্টসেলার, একটা ডিভান। ভেতরে আরও তিনটে ঘর আছে। একটা শোবার ঘর, ডবল খাট, দেয়ালের সঙ্গে লাগানো মস্ত আয়না, একধারে লেখার চেয়ার-টেবিল। আর একটা ঘরে খাবার ব্যবস্থা, খাবার টেবিল-চেয়ার, বড় একটা রেফ্রিজারেটার। তৃতীয়টা রান্নাঘর।

'একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করেছেন?' আদিত্য খাবার ঘরে ঢুকে বলল, 'লেক রোডের বাড়িটার রেফ্রিজারেটারটা বন্ধ ছিল, কিন্তু এই রেফ্রিজারেটারটা চলছে। মানে, লেক রোড থেকে বাড়ির মালিক যখন বেরিয়েছে তখন সে জানত অনেকদিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছে। তাই সে রেফ্রিজারেটারটা বন্ধ করে দিয়েছিল। এখানে যখন রেফ্রিজারেটারটা চলছে তখন ধরে নিতে হবে মালিক হয় খুব তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গিয়েছিল, আর নয়তো...' আদিত্য কথাটা শেষ না করে শিবপদর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি বাড়িতে ঢুকে রেফ্রিজারেটারটা চালিয়ে দাওনি তো?'

'না, না দাদাবাবু। আমি এসব জিনিসে কখনও হাতই দিই না। আমি তো জানিই না কী করে রেফ্রিজারেটার চালাতে, বন্ধ করতে হয়।' শিবপদ প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

ঘরগুলো থেকে তেমন কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। তবে শোবার ঘরে লেখার টেবিলের একদম নীচের ড্রয়ারটা তালাবন্ধ রয়েছে। এখনও চাবির হদিশ পাওয়া যায়নি। এই ড্রয়ারটার মধ্যে কিছু থাকলেও থাকতে পারে। এই ড্রয়ারের চাবিটা লেক রোডের বাড়ির ড্রয়ারটার থেকে অনেক বেশি পোক্ত। আদিত্য অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে অচিন্ত্য সাহার দিকে তাকাতে সে দুদিকে ঘাড় নাড়ল। অর্থাৎ ছুরি দিয়ে এই ড্রয়ারটা খোলা যাবে না। ওপরের ড্রয়ার দুটো অবশ্য টানতেই খুলে গেছে। তাতে নানান টুকিটাকি জিনিসের সঙ্গে রয়েছে হাজার তিরিশেক টাকা।

বসার ঘরের এক কোনায় গোটানো ব্যাডমিন্টন নেট, কয়েকটা ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট ইত্যাদির সঙ্গে নানা আকারের গোটা চারেক ছিপ রাখা ছিল। আদিত্য ভাবছে, মণিময় গুপ্তর তাহলে ব্যাডমিন্টন খেলার মতো মাছ ধরাতেও উৎসাহ আছে। বাড়িতে ঢোকার আগে আদিত্য এই বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই বেশ বড় একটা পুকুর লক্ষ করেছে। মণিময় কি সেখানেই মাছ ধরে?

'তোমার মালিকের কি মাছ ধরার নেশা আছে নাকি?' আদিত্য শিবপদর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'নেশা বলে নেশা! যখন মেমসাহেব থাকে না, মালিক তো সারাদিন ছিপ নিয়েই বসে থাকে।'

'ছিপ নিয়ে কোথায় বসে?'

'কোথায় আবার? বাড়ি থেকে বেরুলেই তো পুকুর। মালিকের নিজের পুকুর। সেখানেই মালিক মাছ ধরে।'

'কী মাছ পাওয়া যায় পুকুরে?'

'ছোট ছোট রুই-কাতলা-মিরগেল তো আছেই। তাছাড়া তেলাপিয়া, বেলে, পুঁটি প্রচুর পাওয়া যায়। দু-চারটে শোল মাছও আছে। তবে তাদের ধরা খুব শক্ত।'

'বড় মাছ নেই? বড় রুই-কাতলা বা বোয়াল?'

'আছে বইকি। সব আছে। কিন্তু সেসব মাছ ছিপ দিয়ে ধরা যায় না। বড় জাল ফেলতে হয়। জাল ফেলার আলাদা লোক আছে। বছরে এক-দুবার তারা আসে। মালিক শহরে চলে যাবার ঠিক আগে পুকুরে জাল ফেলিয়ে, বড় মাছ ধরিয়ে, কাটিয়ে-কুটিয়ে, সেই মাছ সঙ্গে নিয়ে চলে যায়।'

কিছুক্ষণ হল অচিন্ত্য সাহাকে দেখা যাচ্ছে না। লোকটা গেল কোথায়? আদিত্য এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাকে দেখতে পেল না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল নাকি? আদিত্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে সে বাড়ির বাইরে গিয়ে অচিন্ত্য সাহাকে খুঁজবে কিনা এমন সময় অন্তরীক্ষ থেকে উত্তেজিত গলা শোনা গেল, 'আদিত্যবাবু এদিকে আসুন। দেখুন কী পেয়েছি।' গলাটা নিঃসন্দেহে অচিন্ত্য সাহার।

আদিত্য বুঝতে পারছে না কোনদিকে যাবে। না বুঝতে পেরে সে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। আবার সেই গলাটা শোনা গেল, 'আদিত্যবাবু আমি এ-ঘরে।'

আদিত্য এবার নিশ্চিত গলার আওয়াজটা খাবার ঘরের ভিতর থেকে আসছে। কিন্তু খাবার ঘরের ভেতরে ঢুকেও সে অচিন্ত্য সাহাকে দেখতে পেল না।

'আমি এ-দিকে।' আবার অচিন্ত্য সাহার গলা।

খাবার ঘরের সংলগ্ন একটা টয়লেট আছে। মনে মনে গলার আওয়াজ অনুসরণ করে আদিত্য দেখল অচিন্ত্য সাহা টয়লেটের ভিতরে কমোডের ওপর দাঁড়িয়ে গিজারের পেছন থেকে একটা কিছু টেনে নামানোর চেষ্টা করছে। আদিত্যকে দেখতে পেয়ে সে বলল, 'গিজারের পেছনে একটা বড় প্লাস্টিকের প্যাকেট আটকানো রয়েছে। বেশ ভারী। আমি একা নামাতে পারছি না। একটু হেল্প করবেন?'

কিছুক্ষণের মধ্যে দুজনের যৌথ প্রচেষ্টায় প্লাস্টিকের প্যাকেটটা নামানো হল। ভেতরে অনেকগুলো দু-হাজার টাকার নোটের বান্ডিল, গুনে দেখা গেল সব সুদ্ধু সাতাশিটা। এক-একটা বান্ডিলে একশোটা করে নোট, অর্থাৎ দু-লক্ষ করে টাকা। তার মানে সাতাশিটা বান্ডিল মিলিয়ে মোট এক কোটি চুয়াত্তর লক্ষ টাকা প্লাস্টিকের প্যাকেটটাতে রয়েছে। এছাড়াও প্যাকেটের মধ্যে রয়েছে ফাইল করা কিছু কাগজপত্র আর এক গোছা চাবি। তাদের মধ্যে একটা চাবি দিয়ে শোবার ঘরের ড্রয়ারটা খোলা গেল। ড্রয়ারের ভেতরে আটাত্তর বান্ডিল পাঁচশো টাকার নোট ঠাসা রয়েছে। অর্থাৎ আরও ঊনচল্লিশ লক্ষ টাকা।

'এবার তাহলে ফিরে যাওয়া যাক, কী বলেন? অনেক কিছুই তো পাওয়া গেল।' অচিন্ত্য সাহার গলায় তৃপ্তির সুর।

'সত্যিই অনেক কিছু পাওয়া গেল। এবং সব কৃতিত্ব আপনার।'

'আরে না, না, স্যার। আপনি মণিময় গুপ্তর চিঠি থেকে এখানকার ঠিকানাটা বার করে এখানে আসার কথা না বললে কিছুই পাওয়া যেত না।'

'সব থেকে দরকারি জিনিসটা কিন্তু এখনও অজানা রয়ে গেল।' আদিত্য অন্যমনস্কভাবে বলল।

আদিত্যর কথায় অচিন্ত্য সাহা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ঠিক ধরতে পারছে না আদিত্য কোন জিনিসটার কথা বলছে।

'চলুন, বাইরেটা একবার খুঁজে দেখা যাক। হয়তো সেই জিনিসটার কোনও হদিশ পাওয়া যেতে পারে।'

'আপনি কোন জিনিসটার কথা বলছেন?'

'আমি বলছি মণিময় গুপ্তর বর্তমান ঠিকানার কথা। জানতে হবে না লোকটা এই মুহূর্তে কোথায় রয়েছে?'

'বাইরের মাঠে কি তার কোনও হদিশ পাওয়া যাবে?' অচিন্ত্য সাহার গলায় সংশয়।

'দেখতে তো ক্ষতি নেই। চলুনই না একবার।'

বাড়ির সদর দরজাটা টেনে দিয়ে ওরা তিনজন বাইরে বেরোল। ইয়েল লক তালাবন্ধ হয়ে গেছে। শিবপদকে ওরা সাক্ষী হিসেবে সঙ্গে রেখে দিয়েছে। ওর সামনেই টাকাগুলো গোনা হয়েছে। অত টাকা দেখে শিবপদ সেই যে চুপ করে গেছে আর তার গলা থেকে শব্দ শোনা যায়নি। সেই ছেলে দুটো বাইরেই দাঁড়িয়েছিল। আবার ওদের পেছন পেছন আসছে।

শীতের বেলা এক্ষুনি পড়ে আসবে। এখনই সূর্যের তেজ কমে এসেছে। একটা মেঘ মাঠের ওপর ছায়া ফেলতে ফেলতে সরে গেল। ব্যাডমিন্টন কোর্টে এখনও একটা নেট লাগানো আছে। রোদে-জলে সেটা বেশ মলিন। ব্যাডমিন্টন কোর্ট পেরিয়ে পুকুর। আদিত্য অন্যদের নিয়ে ব্যাডমিন্টন কোর্ট পেরিয়ে পুকুর পাড়ে গিয়ে দাঁড়াল।

'তোমার মালিক ঠিক কোনখানে বসে মাছ ধরত, দেখাতে পারবে?' আদিত্য শিবপদর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

অচিন্ত্য সাহার মুখটা কিছুটা হতভম্ব দেখাচ্ছে। সে বুঝতে পারছে না আদিত্য কী করার চেষ্টা করছে।

'মালিক ঠিক এইখানে গাছের ছায়ায় বসে মাছ ধরত।' শিবপদ জায়গাটা আঙুল দিয়ে দেখাল।

পুকুরের ধারে একটা মস্ত বটগাছ ডালপালা মেলে দিয়েছে। তার কিছু ডালপালা ডাঙার ওপর বিস্তৃত, কিছু জলের ওপর। এখানে মাটি প্রায় জলের ওপর নেমে এসেছে। মাছ ধরার আদর্শ জায়গা বটে। আদিত্য গাছের নীচের মাটিটা নিচু হয়ে পরীক্ষা করছে। মাটির ওপর ঘাস, আগাছা, পিঁপড়ের ঢিপি। খুব ভাল করে নজর করলে বোঝা যাবে একটা জায়গায় কিছু আগাছা উপড়ে গেছে, ঘাস থেঁতলে গেছে। আরও ভাল করে দেখলে থেঁতলে যাওয়া ঘাসের ওপর একটা হালকা লাল রং চোখে পড়বে। রংটা বৃষ্টির জলে ধুয়ে ফিকে হয়ে এসেছে।

কিছুক্ষণ পরে মাটি থেকে মুখ তুলে আদিত্য বলল, 'অচিন্ত্যবাবু, পুকুরে ডুবুরি নামাবার ব্যবস্থা করতে হবে। আমার ধারণা, মণিময় গুপ্ত যখন এখানে বসে মাছ ধরছিল, তখন তাকে হত্যা করা হয়। হত্যা করে তার লাশটা পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়। সম্ভবত লাশের গলায় ভারী কিছু বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, যাতে সেটা ভেসে না ওঠে। এতদিনে নিশ্চয় মণিময় গুপ্তর শরীরের অনেকটাই মাছেরা খেয়ে নিয়েছে। বিশেষ করে এই পুকুরে যখন বোয়াল মাছ আছে। কিন্তু কঙ্কালটা তো পাওয়া যাবে। প্রমাণ করা শক্ত হবে না সেটা মণিময় গুপ্তরই কঙ্কাল। আমার আরও ধারণা এই পুকুরে মণিময় গুপ্তর মোবাইলটাও পাওয়া যাবে।'

অচিন্ত্য সাহা একেবারে হতবাক হয়ে গেছে। কয়েক মিনিট বাদে সম্বিত ফিরে পেয়ে সে বলল, 'এসব কি আপনার ধারণা নাকি অনুমান?'

আদিত্য দৃঢ় গলায় বলল, 'আমি একটু ভুল বলেছিলাম। এটা আমার নিছক ধারণা নয়, অনুমানও নয়। আমি একশভাগ নিশ্চিত যে ঠিক এইরকমই হয়েছে।'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

(১)

এত বয়েস হয়ে গেল আদিত্যর এখনও ভাল করে সমুদ্র দেখা হল না। খুব ছোটবেলায় সে একবার পুরী গিয়েছিল। মা তখনও বেঁচে। সেই ভ্রমণের স্মৃতি তার প্রায় নেই বললেই চলে। শুধু টুকরো টুকরো কিছু ছবি মনে আছে। তারা যে বাড়িটায় থাকত তার সদর দরজাটা ছিল সবুজ রঙের, দরজা দিয়ে বেরলেই বালি। আর একটা ছবি—রাস্তায় খুব ভিড়, বাবা-মা আগে আগে হাঁটছে, তাদের পুরোনো লোক জহরদাদা, যার কোলে-পিঠে চড়ে আদিত্য বড় হয়েছে, তাকে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে। আদিত্যর হাতে একটা রাঙা লাঠি, সেটা উঁচিয়ে ধরে সে মাঝে মাঝে জহরদাদাকে বলছে, হ্যাট হ্যাট, যেন সে একজন রাজপুত্তুর, লাঠিটাই যার তরোয়াল, আর জহরদাদা যার ঘোড়া। আরও দু-একটা ছবি মনে আছে, যেমন, পুরী যাবার পথে কোনও একটা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বসে একটা লোক ডিম সেদ্ধ বিক্রি করছিল। কিন্তু, কী আশ্চর্য, পুরীর সমুদ্রের কোনও স্মৃতি আদিত্যর নেই। অথচ বাবার কাছে অনেকবার গল্প শুনেছে, পুরীতে বাবার কোলে উঠে সমুদ্রে স্নান করার সময় সে ঢেউএর ধাক্কায় ছিটকে গিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্যে সমুদ্রের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল। সেসব কথা আদিত্যর কিচ্ছু মনে নেই।

কয়েক বছর আগে একবার নিজের কাজে আদিত্য কয়েক দিনের জন্যে মুম্বাই গিয়েছিল। তখন এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল এবং হোটেল থেকে এয়ারপোর্ট যাতায়াতের পথে চলমান গাড়ি থেকে আদিত্য কিছুক্ষণের জন্যে সমুদ্র দেখতে পেয়েছিল। সমুদ্রের ওপরে যে বিরাট লম্বা ব্রিজটা হয়েছে তার ওপর দিয়ে পারাপার করার সময়ও দেখা দিয়েছিল আরব সাগর। কিন্তু ওইটুকু সময় সমুদ্র দেখতে পেয়ে তার আশ মেটেনি। তাই গোল্ডেন স্যান্ড রিসর্টে চারদিন কাটাতে পারবে ভেবে আদিত্য বেশ উত্তেজিত বোধ করছে। তার ওপর, সঙ্গে কেয়া থাকবে সেটা একটা মস্ত লাভ।

কেয়া আগে দুবার পুরী গেছে। একবার ইস্কুলে পড়ার সময় বাড়ির সঙ্গে, আর একবার সাত-আট বছর আগে হস্টেলের বন্ধুদের সঙ্গে। তার ওপর আদিত্য তো একটা কাজ নিয়ে যাচ্ছে। সেই কাজে সে নিশ্চয় ব্যস্ত থাকবে। তাই এই চারদিনের ভ্রমণ নিয়ে কেয়ার ততটা উত্তেজনা নেই। তবে একেবারে যে নেই তাও নয়। সে আর আদিত্য এক সঙ্গে চারদিন সমুদ্রের ধারে কাটাবে এটাই বা কম কী।

আসলে কেয়া চেয়েছিল আরও বেশিদিনের জন্যে, আরও দূরে কোথাও মধুচন্দ্রিমা যাপন করবে। সিমলা-কুলু-মানালি বা গোয়া, কেরালা কিংবা রাজস্থান। আদিত্য তাকে বুঝিয়েছে মধুচন্দ্রিমা যাপনের সময় বেশি দৌড়দৌড়ি না করাই ভাল। অতএব কেরালা বা রাজস্থান বাদ। সিমলা-কুলু-মানালিতে গেলেও ঠিক এক জায়গায় বসে থাকা যাবে না। অতএব ঠিক হয়েছে এবার পুজোর ঠিক পরে তারা গোয়া যাবে। কেয়া বলেছে, ওটাই হবে তাদের আসল হানিমুন। আদিত্য মেনে নিয়েছে।

এখন আদিত্য আর কেয়া ভুবনেশ্বর এয়ারপোর্টে বসে আছে। যে গাড়িটা করে তাদের রিসর্টে যাবার কথা তার ড্রাইভার ফোন করেছিল। রাস্তায় গাড়িটা খারাপ হয়ে গেছে। ড্রাইভার রিসর্টে খবর দিয়েছে। আর একটা গাড়ি এসে আদিত্যদের নিয়ে যাবে। তারা যেন এয়ারপোর্টেই অপেক্ষা করে। নতুন গাড়ির ড্রাইভার এসে তাদের ফোন করবে।

আদিত্যর ভীষণ বিরক্ত লাগছিল। সকালে উঠতে তার এমনিতেই গায়ে জ্বর আসে, তার ওপর ঘুম থেকে উঠে তৈরি হয়ে কোথাও বেরতে হলে তো কথাই নেই। সকাল ছটা পনেরো মিনিটে ইন্ডিগোর একটা ফ্লাইট

ছিল। সেটা ধরতে গেলে অন্তত ভোর চারটেতে উঠতে হত। আদিত্য ওটা প্রথমেই নাকচ করে দিয়েছে। পরের ফ্লাইট এয়ার ইন্ডিয়ার। সকাল নটা দশে। সাতটায় চেক ইন করতে হলে ছটায় তৈরি হয়ে বাড়ি থেকে বেরতে হবে। সেটাও বেশ কঠিন কাজ। সেই কঠিন কাজটা সম্পন্ন করে আদিত্য আর কেয়া এয়ারপোর্টে পৌঁছে দ্যাখে প্লেন এক ঘণ্টা লেট। খবর নিয়ে বেরলে এত তাড়াহুড়ো করতে হত না।

আদিত্যরা মনিটারের দিকে চোখ রেখে বসে আছে তো বসেই আছে। লেটের বহর ক্রমশ বাড়ছে। এক ঘণ্টা থেকে বেড়ে হল দেড় ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা থেকে দু ঘণ্টা। শেষে প্লেন ছাড়ল পৌনে বারোটায়। রিসর্টের ড্রাইভারের সঙ্গে ইতিমধ্যে কয়েকবার কথা হয়েছে। শেষবার সে বলেছিল রিসর্ট থেকে এয়ারপোর্টে পৌঁছতে তার আড়াই ঘণ্টা লাগবে। তাই সে রওনা দিয়ে দিচ্ছে। দরকার হলে এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করবে। তারপর ভুবনেশ্বর পৌঁছে এই গাড়ি খারাপ হয়ে যাবার দুঃসংবাদ! আদিত্য ভাবছিল, এর থেকে রাত্তিরের ট্রেন ধরে চলে এলে ঢের ভাল হতো।

কেয়ার খুব খিদে পেয়ে গেছে। তাকে দোষ দেওয়া যায় না। কেয়ার সব ভাল, শুধু শারীরিক কষ্ট সে মোটে সহ্য করতে পারে না। এবং খিদে পাওয়ার মতো শারীরিক কষ্ট আর কী আছে? অথচ ভুবনেশ্বর এয়ারপোর্টে দুপুরে খাবার তেমন জুৎসই জায়গা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কেয়া রেগে টং হয়ে আছে। আদিত্য দুটো চিকেন স্যান্ডউইচ আর দু-কাপ কফি নিয়ে এসে দেখল কেয়ার পাশের জায়গাটা, যেখানে সে এতক্ষণ বসেছিল, বেদখল হয়ে গেছে।

'তুমি বললে না এখানে তোমার স্বামী বসেছিল। সে খাবার আনতে গেছে, এখনি ফিরে আসবে?' আদিত্য একটু রেগেই গেছে।

'আমি কিচ্ছু বলিনি। আমার কথা বলতে ভাল লাগছে না। আমাকে এখানে আনলে কেন?'

সব দোষ যেন আদিত্যর। যেন কেয়া নিজে থেকে আসতে চায়নি, আদিত্য তাকে জোর করে নিয়ে এসেছে। খিদে পেলে কেয়ার সমস্ত যুক্তি গুলিয়ে যায়।

একটু পরে স্যান্ডউইচটা খেয়ে কেয়া খানিকটা কথা বলার অবস্থায় ফিরে এসেছে। কিন্তু তার পেট এখনও ভরেনি, ফলে মেজাজ চড়া। সে আদিত্যকে বলল, 'ওই দিকে তো একটা জায়গা খালি আছে। গিয়ে বোসো না। আমার সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

আদিত্য কথার উত্তর না দিয়ে পকেট থেকে মোবাইল বার করে অসীম দত্তর নম্বরটা ডায়াল করল। সে সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে যাচ্ছে। ফোনটা ধরল একজন পুরুষ। বলল সে অসীম দত্তর সেক্রেটারি।

'স্যার একটু ব্যস্ত আছেন। একটু পরে ফোন করুন।' সেক্রেটারির গলায় বিরক্তির আভাস।

'চন্দ্রিমা সেন নেই? উনিই তো অসীম দত্তর সেক্রেটারি।' আদিত্যর গলায় সন্দেহ।

'শুনুন, চন্দ্রিমা ম্যাডাম আসতে পারেননি। অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আপনার যা বলার আমাকে বলতে পারেন। আর একটু তাড়াতাড়ি বলুন। আমারও কাজ আছে।' লোকটা রুক্ষভাবে বলল।

'আপনি অসীমবাবুকে জানিয়ে দেবেন আদিত্য মজুমদার ফোন করেছিল। আমরা ভুবনেশ্বর এয়ারপোর্টে স্ট্র্যান্ডেড হয়ে আছি। আপনাদের রিসর্ট থেকে গাড়ি আসার কথা ছিল। আসেনি। আপনি অসীমবাবুকে বলবেন আর কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়ি এসে না পৌঁছলে আমরা নেক্সট অ্যাভেলেবল ফ্লাইটটা ধরে কলকাতা ফিরে যাব।' লোকটা কিছু বলার আগেই আদিত্য ফোনটা কেটে দিয়েছে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে অসীম দত্তর ফোন।

'আদিত্যবাবু, আই অ্যাম রিয়ালি সরি। আমি জানতামই না আপনাদের কাছে গাড়ি পৌঁছয়নি। আমি ভাবছিলাম আপনারা এখানে পৌঁছে বিশ্রাম করছেন। আসলে কাল সকালেই তো রিসর্টের ইনগরেশন। এই শেষ মুহূর্তে এত রকম কাজ! আমি খোঁজ নিতে পারিনি আপনারা এলেন কিনা। প্লিজ কনভে মাই সিন্সিয়ারেস্ট অ্যাপলজি টু ম্যাডাম।'

আদিত্য চুপ করে আছে।

'এখন খোঁজ নিয়ে জানলাম আপনাদের জন্যে যে গাড়িটা পাঠানো হয়েছিল সেটা মাঝপথে খারাপ হয়ে গেছে। এটা খুব আনইউজুয়াল। যাইহোক, আর একটা গাড়ি অনেকক্ষণ রওনা হয়ে গেছে। আর আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে। প্লিজ বেয়ার উইথ আস। প্লিজ।'

এতবার প্লিজ বললে তো রাগ করে থাকা যায় না। আদিত্য কয়েকবার 'ঠিক আছে', 'ঠিক আছে' বলে ফোনটা কেটে দিল।

কেয়ার পাশের জায়গাটা আবার খালি হয়েছে।

রিসর্টটা চমৎকার। দূর থেকে দেখলে মনে হবে যেন একেবারে সমুদ্রের ভেতরে বাড়িগুলো তৈরি হয়েছে। আরও কাছে গেলে বালির ভেতর দিয়ে রিসর্টে পৌঁছনোর রাস্তাটা চোখে পড়ে। দূর থেকে রিসর্টটা দেখে আদিত্যর মনটা ভাল হয়ে গেল। কেয়ারও। এয়ারপোর্টে বসে কেয়া সেই যে মুখে কুলুপ এঁটেছিল, সারাক্ষণ গাড়িতে বসেও আর মুখ খোলেনি। এই এতক্ষণ পরে তার মুখে কথা ফুটল।

'কী সুন্দর! না গো?' কেয়ার গলায় মুগ্ধতা।

একটু আগে ঝাউবনের ফাঁক দিয়ে সমুদ্রটা একবার উঁকি দিয়েছিল। এক ঝলক দেখা দিয়েই হারিয়ে গিয়েছিল আবার। তারপর কিছুক্ষণ আর তার দেখা নেই। গাড়ি হঠাৎ একটা বাঁক নিতেই সব আড়াল সরিয়ে ফেলে সমুদ্র ওদের সামনে নিজেকে উজাড় করে মেলে দিয়েছে। দিগন্তব্যাপী জল বিকেলের রোদ্দুরে চিকচিক করছে। আদিত্য অন্তরাত্মা পর্যন্ত তন্ময় হয়ে আছে।

রিসর্টের ঘরগুলো একতলা, বাংলো প্যাটার্নের। একটা গোল জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। সামনে, একটু এগোলেই পুরী-কোনারক মেরিন ড্রাইভ। পেছনে বালি, জনহীন সমুদ্র-সৈকত, সমুদ্র। বেয়ারা আদিত্যদের যে ঘরটায় নিয়ে গিয়ে তুলল সেটা বেশ বড়, পঞ্চভুজাকার। একদিকে দুটি আরাম কেদারা, চায়ের টেবিল, চা-কফি বানানোর সরঞ্জাম রাখা ক্যাবিনেট, একটা ছোট রেফ্রিজারেটার। অন্যদিকে বিছানা, বিছানার সামনে দেয়াল জুড়ে পেল্লায় টেলিভিশন, লেখার টেবিল-চেয়ার। ঘরের তিনদিকের জানলা দিয়ে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। কেয়ার মুখ দেখে বোঝা যায় ঘরটা তার খুব পছন্দ হয়েছে।

'এখন খাবার কিছু পাওয়া যাবে? আমাদের লাঞ্চ খাওয়া হয়নি।' আদিত্য বেয়ারাটিকে জিজ্ঞেস করল। সে একটু আগে জেনে নিয়েছে বেয়ারাটির বাড়ি মেদিনীপুর।

'নিশ্চয় যাবে সাহেব। আপনি টু-থ্রি-টু-থ্রি ডায়াল করুন।' বেয়ারা বিছানার পাশে রাখা ইন্টারকমটার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করল। 'ওটা রুম সার্ভিসের নম্বর। ওরা বলতে পারবে এখন কী পাওয়া যাবে।' দরজা বন্ধ করে দিয়ে বেয়ারা চলে গেল।

বিছানার পাশে সাইড টেবিলে একটা মেনু রাখা আছে। আদিত্য কেয়াকে মেনুটা দেখিয়ে বলল, 'বল, কী অর্ডার দেব?'

'তুমি যা ভাল বোঝ অর্ডার দাও। আমি বাথরুমে গিয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে নিচ্ছি।' এখানে সমুদ্রের ধারে তেমন শীত নেই। কেয়ার মেজাজ একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেছে।

কেয়া বাথরুমে ঢুকে যাওয়ার পর আদিত্য মেনুতে চোখ রাখল। সাড়ে চারটে বেজে গেছে। এই অবেলায় খুব বেশি খাওয়া ঠিক হবে না। আবার খিদে পেয়েছে এটাও সত্যি। সে অনেক ভেবেচিন্তে দু-প্লেট ফিস অ্যান্ড চিপস অর্ডার দিল। সঙ্গে এক পট দার্জিলিং চা। মনে হচ্ছে আপাতত এতেই চলে যাবে।

খাবারের অর্ডার দিয়ে রিসিভারটা নামিয়ে রাখার মিনিট খানেকের মধ্যে ইন্টারকমটা আবার বেজে উঠল। অসীম দত্ত।

'আপনারা পৌঁছে গেছেন খবর পেয়েছি। পথে কোনও অসুবিধে হয়নি তো?'

'না, না। কোনও অসুবিধে হয়নি।'

'ওই গাড়িটা কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা আপনাদেরই জন্যে। যখন খুশি ড্রাইভারকে ডেকে নেবেন। ও আশেপাশেই আছে।'

'ড্রাইভার সেটা আমাদের বলেছে। আর যে ঘরটা আমাদের দিয়েছেন সেটা সুপার্ব।'

'ঘর পছন্দ হয়েছে?'

'খুব পছন্দ হয়েছে।'

'বাঃ, বাঃ। আচ্ছা, আমি একটা বিশেষ কারণে ফোন করলাম। আজ রাত্তিরে রিসর্টের ব্যাঙ্কোয়েট হলে আমার পরিবারের সদস্যরা আমার জন্মদিন পালন করবে। প্রথমে বোধহয় কেক-টেক কাটা হবে। তারপর, আগে থেকে সাবধান করে দিচ্ছি, একটু গান-টানও হতে পারে। শেষে ডিনার। আমি বলেছি, আমার দুজন গেস্ট আসবেন। বুঝতেই পারছেন, আপনারাই সেই গেস্ট। ওরা রাজি হয়েছে। তবে যদি জানত গোয়েন্দা আদিত্য মজুমদার আর তার স্ত্রী আমার গেস্ট, তাহলে কী বলত জানি না। যাই হোক, সাড়ে সাতটায় সস্ত্রীক ব্যাঙ্কোয়েট হলে চলে আসবেন। রাত্তিরে ডিনার খেয়ে ফিরবেন। ওখানে আমার পরিবারের সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। ঠিক আছে? রাখছি তাহলে?'

'চলো এবার সমুদ্রের ধার থেকে ঘুরে আসি।' কেয়া বাথরুম থেকে বেরিয়েছে। স্নান করেছে। চুলে, মুখে বিন্দু বিন্দু জল। আদুড় গায়ে আলগা করে শাড়ি জড়ানো। কেয়ার শরীরটা আদিত্যকে হঠাৎ ভীষণ টানছে।

আদিত্য মুখে বলল, 'খাবার অর্ডার দিয়ে দিয়েছি। খেয়ে বেরই? তার আগে অবশ্য আমি একটু গায়ে জল দিয়ে আসব।'

ঘণ্টা খানেক পরে তারা বাইরে এসে দেখল চারদিকে অন্ধকার নেমেছে। শুধু অনেক দূরে, দিগন্ত যেখানে সমুদ্রের সঙ্গে মিশে আছে সেখানে, মেঘ আর ডুবন্ত সূর্যের সঙ্গে মিলে আকাশ বিচিত্র সব আলোর কেরামতি দেখাচ্ছে। সি বিচের ধারে অনেকগুলো চেয়ার পাতা রয়েছে। আদিত্য আর কেয়া সেখানে বসে কিছুক্ষণ আকাশের কেরামতি দেখল। তাদের মতো আরও অনেকে বসে আছে। সব মিলিয়ে জনা কুড়ি তো হবেই। সকলেই রিসর্টের। আস্তে আস্তে আকাশেও অন্ধকার নেমে এসেছে। একটা দুটো তারা ফুটতে শুরু করেছে। আদিত্য ঘড়ির দিকে তাকাল। সাড়ে সাতটা বাজতে এখনও দেরি আছে। আর এক কাপ চা খেলে হত। কয়েকজন বেয়ারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। বললে নিশ্চয় চা দিয়ে যাবে। কেয়া বলে দিল সে আর চা খাবে না।

একটু পরে চা খাওয়া হয়ে গেলে আদিত্য বলল, 'চল, একবার সমুদ্রের ধারে হেঁটে আসি।'

সমুদ্র-সৈকত প্রায় জনমানবহীন। এখান থেকে পুরী প্রায় তিরিশ কিলোমিটার, অন্য দিকে দশ কিলোমিটার গেলে কোনারক। ওসব জায়গার ভিড় এখনও এত দূর এসে পৌঁছয়নি। সমুদ্রের ধারে হাঁটতে অসম্ভব ভাল লাগছে। হাওয়ায় কেয়ার চুল উড়ছে, শাড়ির আঁচল উড়ছে। সমুদ্র-সৈকতের কাঁকড়ারা অপ্রস্তুত হয়ে এদিক ওদিক পালিয়ে যাচ্ছে। তারা মানুষের পায়ের শব্দ খুব বেশি শোনে না।

আরও অনেকক্ষণ সমুদ্রের ধারে থাকতে পারলে ভাল হত, কিন্তু সাতটা বেজে গেছে। সাড়ে সাতটায় ব্যাঙ্কোয়েট হলে পৌঁছবার আগে কেয়া বলেছে একবার শাড়িটা বদলাবে। মনে হয় একটু সাজবেও। একটা ফর্মাল ডিনার তো বটে। আদিত্য এই জামা-প্যান্টটা পরেই নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যাবার মতলব করছিল, কিন্তু কেয়া থাকতে সেটা হবার নয়। এইসব নিয়ে কথা বলতে বলতে ওরা রিসর্টের সীমানায় প্রায় পৌঁছে গেছে, যেখানে একটু আগে ওরা চেয়ারে বসেছিল, হঠাৎ আদিত্যর চোখে পড়ল, এক বয়স্ক দম্পতী রিসর্টের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে এসে দুটো ফাঁকা চেয়ার দখল করে বসল। দুজনেই আদিত্যর চেনা। আদিত্য ভাবছে লুকিয়ে পড়বে নাকি এগিয়ে গিয়ে কথা বলবে। ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। প্রদীপ চক্রবর্তী।

'আরে, আদিত্যবাবু, আপনি এখানে?'প্রদীপ চক্রবর্তীর গলায় অকৃত্রিম বিস্ময়।

'আপনাকে বললাম না, দেখবেন, ঠিক চেনা কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। ঠিক সেটাই তো হল।' আদিত্য মৃদু মৃদু হাসছে। 'আলাপ করিয়ে দিই আমার স্ত্রী কেয়া। আর ইনি প্রদীপ চক্রবর্তী আর তাঁর স্ত্রী রাখি চক্রবর্তী।'

'আপনার সঙ্গে আমার যখন এখানে আসা নিয়ে কথা হল তখন আপনি জানতেন এখানে আসছেন?' প্রদীপের বিস্ময়ের ঘোর এখনও কাটেনি।

'জানতাম। আপনাকে কিছু বলিনি কারণ ভাবলাম আপনাকে একটা সারপ্রাইজ দেওয়া যাবে।' আদিত্য এখনও মিটিমিটি হাসছে। 'কেয়া আপনার মতোই একটা স্কুলে ফিজিক্স পড়ায়।' আদিত্য রাখি চক্রবর্তীর দিকে তাকিয়ে বলল।

'বসুন না। আমার উঠে দাঁড়াতে অনেকটা সময় লেগে যায়।' রাখি চক্রবর্তী কেয়ার দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ গলায় বললেন।

'আপনি উঠবেন না। আমি বসছি।' কেয়া রাখি চক্রবর্তীর সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ল।

বিকেলের তুলনায় জায়গাটা অনেকটাই ফাঁকা। সম্ভবত এই কারণে যে এখন আকাশের সেই ম্যাজিক আর নেই। অন্ধকার এসে আকাশ, সমুদ্র সব কিছু গ্রাস করে নিয়েছে। এখানে বসে থাকলে মাঝে মাঝে ঢেউএর ওপর ফসফরাস জ্বলে ওঠা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। তবু কেউ কেউ এখনও বসে আছে। হয়তো সমুদ্র থেকে হঠাৎ দৌড়ে আসা এক ঝলক হাওয়ার আশায়। কিংবা অন্ধকারটাকেই দেখবে বলে।

'আপনি কোন স্কুলে পড়ান?' কেয়া রাখির সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করছে। কেয়ার পছন্দে সাদা-কালো অতি প্রবল। আদিত্যর মনে হল রাখিকে দেখেই তার পছন্দ হয়ে গেছে।

'পড়াই না, পড়াতাম। কয়েক বছর হল রিটায়ার করেছি। হেমলতা গার্লস স্কুল। বেলেঘাটায়। জানেন স্কুলটার কথা?'

'খুব জানি। কয়েকবার আমাদের মেয়েদের ওখানে হায়ার সেকেন্ডারির সিট পড়েছিল। আমি পড়াই বিডন স্ট্রিটের রামমোহন শীল মেমরিয়াল স্কুলে।'

'ও আচ্ছা, আচ্ছা।' রাখি চক্রবর্তী স্কুলটার কথা শুনেছেন।

আলাপ ক্রমশ জমে উঠছে দেখে আদিত্য বলল, 'ম্যাডাম, আমাদের একটা নেমন্তন্ন আছে। ব্যাঙ্কোয়েট হলে সাড়ে সাতটায় পৌঁছতে হবে। আমরা আজ একটু এগোচ্ছি। কাল নিশ্চয় দেখা হবে। তখন ভাল করে গল্প করব। আজ আসি?' তারপর প্রদীপ চক্রবর্তীর দিকে ফিরে বলল, 'আসছি প্রদীপবাবু।'

'আপনারা কি এই হোটেল মালিকের আত্মীয় নাকি?' প্রদীপের গলায় এখনও বিস্ময়। 'বেয়ারার কাছে শুনলাম, ব্যাঙ্কোয়েট হলে সাড়ে সাতটা থেকে নাকি এই হোটেলের মালিক অসীম দত্তর আত্মীয়স্বজন তার জন্মদিন পালন করবে।'

'আমরা আত্মীয় নই, অসীম দত্তর বিশেষ অতিথি।' প্রদীপ চক্রবর্তীর দিকে তাকিয়ে আদিত্য রহস্যময়ভাবে হাসল। তারপর আর কিছু না বলে কেয়াকে নিয়ে পা চালাল ঘরের দিকে।

প্রদীপ চক্রবর্তী তাদের গমনপথের দিকে কিছুটা বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে আছে।

যখন আদিত্যরা নিজেদের ঘরে ফিরল তখনও সাড়ে সাতটা বাজতে মিনিট পনেরো বাকি।

(২)

'উই হ্যাভ অ্যাসেম্বল্ড হিয়ার টু সেলিব্রেট দ্য সিক্সটি সিক্সথ বারথ অ্যানিভারসারি অফ আওয়ার ডিয়ার দাদু...'

আদিত্যরা ব্যাঙ্কোয়েট হলে ঢুকে দেখল কর্ডলেস মাইক্রোফোন হাতে একটি অল্পবয়সী মেয়ে কথা বলছে। মাজা রং, পরনে জিনস ও টি শার্ট। বেশ লম্বা।

'তোর দাদু হতে পারি, তা বলে আমি সবার দাদু নাকি?' ধুতি এবং সিল্কের পাঞ্জাবি পরা অসীম দত্ত এক পাশ থেকে বললেন।

'বাংলায় বল, বাংলায় বল। এখানে সবাই বাঙালি।' মেয়েটিরই বয়সি একটি ছেলে সামনে থেকে বলে উঠল। ছেলেটিও বেশ লম্বা তবে গায়ের রং মেয়েটির মতো মাজা নয়, একেবারে টকটকে ফরসা। অসীম দত্তর মতো।

'তাহলে তুই বল।' মেয়েটি ছেলেটির হাতে মাইক্রোফোনটা ধরিয়ে দিল।

ব্যাঙ্কোয়েট হলে আট-নজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একদিকে ছোট ছোট টেবিল ঘিরে চারটে করে চেয়ার, আপাতত সব কটাই ফাঁকা। মনে হয় ডিনার শুরু হলে সেগুলোর সদ্ব্যবহার হবে। এই চেয়ার-টেবিলগুলোর পেছনে টানা লম্বা আর একটা টেবিল যার ওপর অনেকগুলো ছোট ছোট উনুন। উনুনগুলো এখন জ্বলছে না। মনে হয়, পরে খাদ্যবস্তু এসে পৌঁছলে ওগুলো খাবার গরম রাখার কাজে ব্যবহার করা হবে। লম্বা টেবিলের পেছনে বেয়ারাদের দাঁড়াবার জায়গা। আদিত্য আগে খেয়াল করেনি, এতক্ষণে লক্ষ করল, যেখান থেকে মেয়েটি কথা বলছিল তার ডানদিকে একটা ছোট টেবিলে ঢাকা দেওয়া একটা গোলাকৃতি বস্তু রাখা আছে। তার পাশে স্বচ্ছ, ফিতে লাগানো বাহারি প্লাস্টিকের ছুরি। অনুমান করতে কষ্ট হয় না, ঢাকা দেওয়া বস্তুটা অসীম দত্তর বার্থডে কেক যেটা অচিরেই ওই ছুরি দিয়ে উনি কাটবেন।

একজন ফটোগ্রাফার ঘুরে ঘুরে সকলের ছবি তুলছে। আদিত্যদেরও কয়েকটা ছবি তুলল।

অসীম দত্ত আদিত্যদের দেখতে পেয়েছেন। হাত নেড়ে সামনে আসতে বলছেন। কেয়াকে নিয়ে সামনে এগিয়ে গেল আদিত্য।

'আজ বিখ্যাত শিল্পপতি অসীম দত্ত ছেষট্টি বছর পূর্ণ করলেন। সেই উপলক্ষে আমরা, ওঁর নিকটজনেরা, এখানে মিলিত হয়েছি।' ছেলেটি মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে বলতে শুরু করেছে। 'এই দিনটা আমাদের কাছে ভীষণ আনন্দের একটা দিন। এই জায়গাটা, যেখানে আমরা মিলিত হতে পেরেছি, সেটাও খুব উল্লেখযোগ্য। কারণ এই রিসর্ট অসীম দত্তেরই...' এইটুকু বলে ছেলেটি নিচুগলায় মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল, 'এই ব্রেনচাইল্ডের বাংলা কী রে?'

'তুই ভেবে বল। আমি অত বাংলা জানি না।' মেয়েটি ফিসফিস করে বলল। 'ব্রেনচাইল্ডই বল না। কেউ তোকে বকবে না। আর তাড়াতাড়ি শেষ কর। না হলে লোকে বোর হয়ে যাবে।'

'এই রিসর্টটা অসীম দত্তেরই মস্তিষ্কপ্রসূত।' ছেলেটা ব্রেনচাইল্ডের একটা বাংলা খুঁজে পেয়েছে।

ছেলেটা আরও অনেক কিছু বলছিল। আদিত্য আর শুনছে না। সে আর কেয়া সামনের দিকে একটু ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। এখান থেকে ঘরের অন্যদের দেখা যায়। আদিত্য মানুষগুলোকে চেনার চেষ্টা করছিল। নামগুলো, চরিত্রগুলো সবই তার জানা। এবার দাঁড়িয়ে থাকা এক-একজনের সঙ্গে এক-একটা নাম মিলিয়ে দিতে হবে। আদিত্যর মনে হল অসীম দত্তর বড় ছেলে অনিকেত আর তার স্ত্রী ছন্দা সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। এরা দুজনেই খুব ফরসা, তাই ছেলেটাও অত ফরসা। যে মাইক্রোফোনে কথা বলছে সেই যে অনিকেত-ছন্দার ছেলে শুভ্র তাতে সন্দেহ নেই। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, জিনস, টি শার্ট পরা লম্বা মেয়েটা তার পিসতুতো বোন স্বাতী। স্বাতী তার বাবার কাছ থেকে হাইটটা পেয়েছে। স্বাতীর বাবা, অসীম দত্তর জামাই জয়ন্ত মল্লিক ছ'ফুট দু-তিন ইঞ্চি লম্বা, বউকে নিয়ে একটু পেছনের দিকে দাঁড়িয়ে থাকলেও সবার ওপরে তার মাথাটা জেগে রয়েছে। তার স্ত্রী শ্বেতা মল্লিকও মেয়েদের আন্দাজে বেশ লম্বা, তবে যতটা না লম্বা তার চেয়ে বেশি চওড়া। ইন্সপেক্টার মাজি শ্বেতা মল্লিককে জাঁদরেল বলেছে। খুব একটা ভুল করেনি। জয়ন্ত মল্লিক এবং অনিকেত দত্ত দুজনেই স্যুট-টাই পরেছে। জয়ন্ত মল্লিকের স্যুটটা আবার থ্রি-পিস। একেবারে

পেছন দিকে অন্য সকলের সঙ্গে একটু দূরত্ব রেখে এক মধ্য তিরিশের যুবক চাপা পাজামা ও কুর্তা পরে মুখে একরাশ বিরক্তি নিয়ে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন অন্যদের থেকে সে অনেকটাই আলাদা। এই ব্যক্তি অনির্বাণ দত্ত না হয়ে যায় না। আদিত্য তার ভূতপূর্ব স্ত্রীকেও ঘরের মাঝখানে আবিষ্কার করল। অনেকের মধ্যে সে মিশে আছে। ময়লা রং, অসম্ভব লাবণ্যময় মুখশ্রী, যেন নিজেকে ভিড়ের ভিতর লুকিয়ে রাখতে চায়। আদিত্য ভাবছিল, সুভদ্র মাজির চরিত্রচিত্রণ কী নিখুঁত।

এছাড়া অসীম দত্তর পাশে একজন সাফারি স্যুট পরা বলিষ্ঠ লোক দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক পেছনে আরও একজন। বোঝাই যাচ্ছে এরা অসীম দত্তর দেহরক্ষী।

শুভ্র দত্তর বক্তৃতা শেষ হয়ে আসছে। সে বলছিল, 'আমি আর আপনাদের বেশি সময় নেব না। আমাদের পরম-প্রিয় অসীম দত্তকে তাঁর জন্মদিনের কেক কাটার জন্য অনুরোধ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করব।'

অসীম দত্ত কেক কাটতে যাচ্ছিলেন। কী মনে হতে প্লাস্টিকের ছুরিটা নামিয়ে রেখে শুভ্র দত্তর কাছ থেকে মাইক্রোফোনটা চেয়ে নিলেন।

'তোমরা আমার জন্যে যে আয়োজনটা করেছ তাতে আমার যে কী আনন্দ হয়েছে বলে বোঝাতে পারব না। তোমরা আমার আপনজন। যদিও একা একা থাকি, তোমাদের কথাই সব সময় মনের মধ্যে ঘোরে। বিশেষ করে আমার নাতি এবং নাতনি যে উদ্যোগ নিয়ে এমন একটা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছে তাতে আমার গর্বের শেষ নেই। তোমাদের ভাল হোক, তোমাদের সকলের খুব ভাল হোক।'

অসীম দত্ত কিছুক্ষণ থামলেন। তারপর মেঝের দিকে তাকিয়ে আবার যখন বলতে শুরু করলেন তখন তাঁর গলার স্বরটা বদলে গেছে।

'এই এত আনন্দের মধ্যে একটা ব্যাপার কিন্তু আমাকে ভীষণ কষ্ট দিচ্ছে। তোমরা সকলেই জান কিছুদিন আগে কেউ আমাকে খুন করতে চেয়েছিল। আমি বরাত জোরে বেঁচে গেছি। কে আমাকে খুন করতে চেয়েছিল? কে আমার মৃত্যু চাইতে পারে? কে আমার মৃত্যুতে লাভবান হতে পারে? আমার চেনা কেউ? আমার কোনও নিকটজন? এইসব প্রশ্ন দিনের পর দিন আমাকে ভাবিয়েছে। সত্যি বলতে কি, একটা ভয়ও আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। যে আমাকে একবার খুন করার চেষ্টা করেছিল সে কি আর একবার চেষ্টা করবে না? দেখতেই পাচ্ছ, এখন আমাকে সিকিউরিটি নিয়ে ঘুরতে হচ্ছে। আমি আর কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছি না। এছাড়া আমার একজন গেস্ট সস্ত্রীক এখানে উপস্থিত আছেন।'

অসীম দত্ত হাত নেড়ে আদিত্যদের কাছে ডাকছেন। আদিত্য আর কেয়া তার কাছে পৌঁছবার পর অসীম দত্ত দুজনকে পাশে দাঁড় করিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন।

'আলাপ করিয়ে দিই ইনি আমার গেস্ট আদিত্য মজুমদার। পাশে ওঁর স্ত্রী। যারা আদিত্য মজুমদারকে চেনে না তাদের বলি, ইনি একজন বিখ্যাত বেসরকারি গোয়েন্দা। সম্প্রতি বেশ কয়েকটা জটিল রহস্য সমাধানে পুলিশকে সাহায্য করেছেন। তোমরা কেউ কেউ হয়তো এর নাম খবর কাগজে দেখে থাকবে।'

অসীম দত্ত দম নেবার জন্য একটু থেমেছেন। ঘরে অখণ্ড নীরবতা।

'যে আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল তাকে ধরার জন্য আমি আদিত্য মজুমদারের শরণাপন্ন হয়েছি। এখানে আমরা যে ক'দিন আছি, আদিত্যবাবু তোমাদের সকলের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলবেন। ওঁর সঙ্গে কোঅপরেট করার জন্য তোমাদের সকলকে অনুরোধ করছি।'

ঘরে একটা গুঞ্জন উঠেছে। মনে হচ্ছে এই রিসর্টে বেড়াতে এসে আদিত্যর গোয়েন্দাগিরি সহ্য করতে অনেকেই রাজি নয়।

'তোমরা আর একটু ধৈর্য ধরে শোনো। আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। যে আমাকে মারার চেষ্টা করেছিল সে কিন্তু পরের বার সফল হতেই পারে। যদি সে সফল হয়, মানে আমি যদি সত্যি সত্যি খুন হয়ে যাই,

খুনিকে ধরার ভার আমি আদিত্যবাবুর ওপরেই দিয়ে যাচ্ছি। আমি নিশ্চিত, খুনি খুন করে পার পাবে না। আদিত্য মজুমদার তাকে ঠিক খুঁজে বার করবেন।'

একটু থেমে অসীম দত্ত বললেন, 'এবার আমি কেক কাটব।'

ঘরের মানুষগুলোর ভেতর সেই গা-ছাড়া, হালকা ভাবটা আর নেই। অসীম দত্তর কথাগুলো পরিবারের সকলের মধ্যে একটা উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে দিয়েছে। আদিত্যর নিজেকে দোষী মনে হচ্ছে। সেই ভারী পরিবেশেই কেক কাটা হয়ে গেল। স্বাতী মল্লিক তার দাদুর মুখে এক খণ্ড কেক পুরে দিচ্ছে। কয়েকজন বেয়ারা ছোট ছোট কাগজের প্লেটে কেকের টুকরোগুলো অতিথিদের হাতে হাতে তুলে দিচ্ছে। শুভ্র দত্ত আবার মাইক্রোফোন হাতে নিয়েছে। ফটোগ্রাফার নিষ্ঠাভরে ছবি তুলে যাচ্ছে।

'আমরা ডিনারের আগে একটু গান-বাজনার আয়োজন করেছি। কলকাতা থেকে সুমিত এবং ঐন্দ্রিলা তাদের ব্যান্ড নিয়ে আমাদের গান শোনাতে এসেছে। মিউজিকাল ইনস্ট্রুমেন্টগুলো সেট আপ করতে এদের একটু সময় লাগবে। ততক্ষণ সকলে একটু বোসো। চেয়ার টেবিল সব খালি আছে।'

'তুই আসল কথাটাই তো বললি না।' স্বাতী শুভ্রর হাত থেকে মাইক্রোফোনটা ছিনিয়ে নিয়েছে। সে মাইক্রোফোনে বলল, 'শুভ্র আসল কথাটা বলতে ভুলে গেছে। তোমাদের বাঁদিকের টেবিলে কিছু স্ন্যাক্স রাখা আছে। নিজেরাও নিতে পারো আবার ওয়েটারকে বললে সেও সার্ভ করে দেবে। তবে বেশি খেও না, তাহলে ডিনার খেতে পারবে না।'

পরিবারের লোকেরা সকলেই সকলকে চেনে। তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। তাদের ভেতরে আদিত্য আর কেয়া ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছিল। মনে হয়, অসীম দত্ত সেটা বুঝতে পারলেন। তিনি আদিত্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনারা আমার সঙ্গে আমার টেবিলে বসবেন।'

অসীম দত্তর টেবিলটা একেবারে সামনের সারিতে। চারটে চেয়ারের মধ্যে একটাতে একজন বসে আছেন। দীপশিখা মজুমদার দত্ত। অসীম দত্তর ছোট ছেলে অনির্বাণ দত্তর স্ত্রী। উনিও বোধহয় অন্যদের সঙ্গে তেমন করে মিশতে পারছেন না। অসীম দত্ত অন্য টেবিলগুলোর দিকে পেছন করে বসলেন। তাঁর ঠিক উল্টোদিকে আদিত্য। যেদিকে খাবার রাখা আছে সেই দিককার চেয়ারে কেয়া। দীপশিখা তার মুখোমুখি। অসীম দত্তর সঙ্গে আদিত্যরা টেবিলে বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কালো স্যুট লাল টাই পরিহিত এক সুপুরুষ ব্যক্তি টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

'আলাপ করিয়ে দিই, এই রিসর্টের ম্যানেজার রঘুনন্দন পানিগ্রাহী, সংক্ষেপে রঘু। রিসর্ট চালানোর ব্যাপারে রঘুই আমার সব থেকে বড় বল-ভরসা।' অসীম দত্তর মুখে স্মিত হাসি।

'স্যার আমাকে স্নেহ করেন বলে এসব বলছেন। স্যার না থাকলে আমি কিছুই না।' রঘু বিনয়ী গলায় বলল।

'আপনার বাংলাটা কিন্তু চমৎকার।' আদিত্য না বলে পারল না।

'আমি প্রায় পনেরো বছর কলকাতায় চাকরি করেছি। বাংলা তো শিখতেই হয়েছে।'

'রঘুর অভিজ্ঞতাটা কাজে লাগাব বলে ওকে ওর কাজের জায়গা থেকে জোর করে তুলে আনলাম। ও কোথায় কাজ করত জানেন?'

প্রশ্নটা করে অসীম দত্ত নিজেই উত্তরটা দিতে গিয়ে কলকাতার একেবারে প্রথম সারির একটা হোটেলের নাম করলেন। আদিত্য আন্দাজ করল, জোর করে নয়, বেশি পয়সার লোভ দেখিয়ে রঘুনন্দনকে এখানে তুলে আনা হয়েছে।

'আপনারা কী খাবেন স্যার? আমাকে বলে দিলে আমি ওয়েটারের হাত দিয়ে খাবারটা পাঠিয়ে দিতে পারি। কিংবা ওই টেবিলে ফুড কাউন্টার আছে। ওখানে ফুড আইটেমগুলো ডিসপ্লে করা আছে। গেলেই

দেখতে পাবেন। দেখে কী খাবেন সেটা চুজ করা হয়ে গেলে ওখানে যে ছেলেটা ডিউটি করছে তাকে বলবেন খাবারগুলো এক নম্বর টেবিলে পাঠিয়ে দিতে।'

আদিত্যর একটু খিদে খিদে পাচ্ছে। বিকেলে যে ফিশ অ্যান্ড চিপসটা খেয়েছিল সমুদ্রের ধারে হেঁটে সেটা প্রায় হজম হয়ে গেছে। সে জানে কেয়ারও খিদে পেয়েছে কারণ এই নিয়ে একটু আগেই তাদের মধ্যে কথা হচ্ছিল।

'আমি একটা সুইট ফ্রেশ লাইম সোডা খেতে পারি?' দীপশিখা নিচু গলায় বলল।

'নিশ্চয় ম্যাডাম। আমি এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর কিছু খাবেন না?'

'চিকেন স্যান্ডউইচ খাও। এরা এটা খুব ভাল করে।' অসীম দত্ত তাঁর বিবাহবিচ্ছিন্ন-সম্ভবা পুত্রবধূকে বললেন। তারপর তার সম্মতির অপেক্ষা না করেই রঘুনন্দনকে বললেন, 'শোনো, এই ম্যাডামের জন্যে দুটো চিকেন স্যান্ডউইচ পাঠিয়ে দাও।'

'আর আপনারা কী খাবেন স্যার?' রঘুনন্দন একবার আদিত্যর দিকে তাকাল, আর একবার কেয়ার দিকে।

'আমি বরং গিয়ে দেখি কী খাওয়া যায়।' আদিত্য দাঁড়িয়ে উঠে বলল।

'আমার জন্যেও কিছু নিয়ে এস। বুঝে।' কেয়ার ধারণা আদিত্যর মতো পছন্দ সে নিজে করতে পারবে না। আদিত্য অনেক খাবারের নাম জানে যেগুলো কেয়া চেনেই না।

'আপনার জন্যে স্যার?' রঘুনন্দন অসীম দত্তর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'একটা ব্ল্যাক কফি পাঠিয়ে দাও। এখন আর কিছু খাব না।'

'ঠিক আছে স্যার।'

ফুড কাউন্টারে তেমন ভিড় নেই। মাত্র একজন আদিত্যর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আদিত্য তাকে চিনতে পারল। অনির্বাণ দত্ত। খাবার অর্ডার দিয়ে পেছন ফিরে আদিত্যকে দেখে সে ভুরু কোঁচকাল।

তারপর মুখে ব্যাঙ্গের হাসি এনে কেটে কেটে বলল, 'আ হা, মিস্টার স্লিউথ, নাইস টু সি ইউ।'

আদিত্য উত্তর দিল না। উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করল না। সে নিবিষ্ট চিত্তে টেবিলে ডিসপ্লে করা খাদ্যসম্ভারের দিকে তাকিয়ে ছিল।

উত্তর না পেয়ে অনির্বাণ দত্তর বোধহয় ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। সে তীক্ষ্ণস্বরে বলল, 'উই ডোন্ট ওয়ান্ট স্লিজি, স্নিকি, স্লাইমি বামস লাইক ইউ অ্যামং আস।' বলেই উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে হনহন করে চলে গেল। আদিত্য দেখল, লোকটা একাই একটা টেবিলে গিয়ে বসেছে। আদিত্য মুচকি হেসে খাদ্য নির্বাচনে মন দিল। খাবার বাছতে বাছতে আদিত্য লক্ষ করল, অসীম দত্তর জামাই জয়ন্ত মল্লিক ব্যাঙ্কোয়েট হলের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে।

আদিত্য যখন তার টেবিলে ফিরে এল, অসীম দত্ত চেয়ারে নেই আর কেয়া দীপশিখার সঙ্গে মশগুল হয়ে গল্প করছে। টেবিলে অসীম দত্তর কফি, দীপশিখার আধ-খাওয়া স্যান্ডউইচ এবং ফ্রেশ লাইম সোডা।

আদিত্য ফিরে এসেছে দেখে কেয়া উত্তেজিত গলায় বলল, 'জান, দীপশিখা আমাদের কলেজেই ইকনমিক্স পড়ত। তবে আমার থেকে বারো বছরের জুনিয়ার। তাছাড়া আমাদের কলেজ হোস্টেলের পাশেই ওদের বাড়ি। আমাদের যেসব প্রফেসর অঙ্ক পড়াতেন, তাদের অনেকে ওদেরও পড়িয়েছেন।'

আদিত্য আর কিছু উত্তর ভেবে না পেয়ে বলল, 'বাঃ।' তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, 'অসীম দত্ত গেলেন কোথায়?'

'ওঁর মেয়ে এসে ওঁকে ডেকে নিয়ে গেল। ওই তো ওই কোণে দাঁড়িয়ে উনি মেয়ের সঙ্গে কথা বলছেন।' কেয়া মনে হচ্ছে অসীম দত্তর পরিবারের অনেককে চিনে ফেলেছে।

আদিত্য ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল ব্যাঙ্কোয়েট হলের এক কোণে শ্বেতা মল্লিক হাত পা নেড়ে তার বাবাকে কীসব যেন বোঝাচ্ছে আর তার বাবা অসহায় মুখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, যেন পালাতে পারলে বেঁচে যায়।

খাবার এসে গেছে। একটি করে স্লাইডার, অর্থাৎ ছোট হ্যামবারগার, একটি করে চিংড়ির কাটলেট এবং এক পিস করে প্লাম কেক। সঙ্গে আদিত্যর জন্য চা, কেয়ার জন্য সুইট ফ্রেশ লাইম সোডা।

'তুমি ঠিক বুঝতে পেরেছ আমি সুইট ফ্রেশ লাইম খেতে চাইছি। কী করে বুঝলে গো?' আদিত্যর পছন্দে কেয়া খুব খুশি।

'আপনারা চিকেন স্যান্ডউইচটা খেলে পারতেন। সত্যিই ভাল করেছে।' দীপশিখা কেয়ার সঙ্গে কিছুটা অন্তরঙ্গ হয়েছে।

মাইক্রোফোনটা হঠাৎ জেগে উঠল। টেস্টিং চলছে। এবার বোধহয় গান শুরু হবে। অসীম দত্ত এখনও মেয়ের খপ্পর থেকে বেরোতে পারেননি। তাঁর কফিটা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। আদিত্য খেয়াল করল, অসীম দত্তর বড় ছেলে অনিকেত দত্ত হল থেকে বেরিয়ে গেল। জয়ন্ত মল্লিক এখনও ফেরেনি। অনির্বাণ দত্ত তার টেবিল থেকে উঠে গিয়ে ভাইপো-ভাগ্নির টেবিলে বসেছে। অনির্বাণের উপস্থিতিতে ওদের দুজনকেই কিছুটা অস্বচ্ছন্দ দেখাচ্ছে। অসীম দত্তর দুজন দেহরক্ষী ঘরের দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে সবার ওপর নজর রাখছে।

'লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলমেন, ভাইও আউর বহেনও, দাদারা ও দিদিরা, গুড ইভিনিং, শুভশাম, শুভসন্ধ্যা। আমি সুমিত। আমি এবং আমার পার্টনার ঐন্দ্রিলা কলকাতা থেকে আপনাদের গান শোনাতে এসেছি।' গায়ক ছেলেটি হাতে মাইক্রোফোন তুলে নিয়েছে।

গায়কের গায়ে ঝলমলে কোট, গলায় গিটার ঝুলছে। তার সঙ্গী মেয়েটির পরনে ঝলমলে পোশাক। যেরকম সিনেমায় দেখা যায়। আদিত্য ভাবছিল, মাইক্রোফোনের আওয়াজটা আর একটু কম হলে ভাল হত। কতক্ষণ এই আওয়াজ সহ্য করতে হবে কে জানে।

'আজ যার জন্মদিন তার জন্য আমরা কয়েকটা রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করব। তারপর অন্য গান গাইব।'

রবীন্দ্রসঙ্গীত? সেরেছে। আদিত্য মনে মনে ভাবল। গানের আগে মিউজিক শুরু হয়ে গেছে। অসীম দত্ত ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসলেন। কফির কাপটা হাত দিয়ে দেখলেন।

'ঠান্ডা হয়ে গেছে।' দীপশিখা বলল। সে হাত নেড়ে নিকটবর্তী ওয়েটারকে ডাকার চেষ্টা করছে।

গান শুরু হল। ছেলেটি গাইছে, 'আজি যত তারা তব আকাশে'। আদিত্য একটু অবাক হয়েই লক্ষ করল ছেলেটার গলাটা বেশ সুরে। তার ধারণা ছিল এইসব অনুঠানে গায়ক-গায়িকাদের গলায় কিছু খামতি থাকে যে খামতিগুলো চড়া মিউজিক বাজিয়ে ঢাকতে হয়। এক্ষেত্রেও ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক বেশ চড়া। এতটাই চড়া যে মিউজিকের ধাক্কায় ছেলেটার গলার আওয়াজটা মাঝে মাঝে চাপা পড়ে যাচ্ছে। আদিত্যর মনে হল ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক গায়ককে সাহায্য না করে তার অসুবিধে করছে। অসীম দত্তর জন্যে গরম কফি এসেছে। আদিত্য বেয়ারাকে তার নিজের জন্যে এক কাপ চা আনতে বলল। আদিত্যর সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু এখন ওঠাটা ঠিক হবে না।

আগের গানটা শেষ হয়ে আবার একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত শুরু হল। এবার মেয়েটা গাইছে। 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরও আরও আরও দাও প্রাণ'। মেয়েটার গলাটা সরু, রিনরিনে। প্রথাগত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীদের মতো নয়। কিন্তু তাতে আদিত্যর কিছু যায় আসে না। আদিত্য খেয়াল করল এর গলাটাও বেশ সুরে। শুধু সঙ্গের মিউজিকটা আর একটু চাপা হলে ভাল হত।

রবীন্দ্রসঙ্গীত শেষ হয়ে এখন হিন্দি ফিলমের গান শুরু হয়েছে। বর্তমান বলিউডের গান। আদিত্য এসব গান কোনও দিন শোনেনি, শুনতে চায়ও না। কেয়া চাপা গলায় দীপশিখার সঙ্গে গল্প করে যাচ্ছে। অনির্বাণ দত্ত ভাইপো-ভাগ্নির টেবিল থেকে উঠে গিয়ে আবার একা একা নিজের টেবিলে বসেছে। মনে হয় ভাইপো-ভাগ্নি তাকে খুব একটা পাত্তা দেয়নি। অসীম দত্ত আবার উঠে গেছেন। তিনি এখন তাঁর নাতি নাতনির সঙ্গে বসে গল্প করছেন। সুদীপ-ঐন্দ্রিলা জুটি ষাট-সত্তর দশকের বলিউডের গান গাইছে। সেসব গান শুনতে

আদিত্যর রীতিমতো ভালো লাগছে। অনিকেত দত্ত ফিরে এসেছে। স্ত্রী এবং বোনের সঙ্গে এক টেবিলে বসেছে। কিন্তু জয়ন্ত মল্লিক এখনও ফিরল না।

সাড়ে নটার সময় সঙ্গীতানুষ্ঠান শেষ হল। রঘুনন্দন পানিগ্রাহী মাইক হাতে নিয়ে বলল, ডিনার রেডি। ডিনার খাবারও একই ব্যবস্থা। টেবিলে বসে অর্ডার দেওয়া যায় আবার উঠে ফুড কাউন্টারে গিয়েও অর্ডার দেওয়া যায়। ফুড কাউন্টারে চার-পাঁচজনের লাইন পড়েছে।

কেয়া আদিত্যকে বলল, 'একটু বসি? ভিড় কমলে গিয়ে দেখব কী খাওয়া যায়?'

আদিত্য ঘাড় নাড়ল। দীপশিখা বলল, আমিও তখন আপনাদের সঙ্গে যাব।'

টেবিলের ওপর অসীম দত্তর মোবাইলটা ভাইব্রেট করছে। ওটা নিশ্চয় সাইলেন্ট মোডে আছে তাই কোনও রিং শোনা যাচ্ছে না।

আদিত্য দেখল মোবাইলে একটা নম্বর ফুটে উঠেছে। তার মানে যে ফোন করছে তার ফোন অসীম দত্তর মোবাইলে সেভ করা নেই। তবু নম্বরটা দেখে অসীম দত্তকে একটু চিন্তান্বিত মনে হল। অসীম দত্ত ফোন ধরার পর আদিত্য শুধু এক দিকের কথাগুলো শুনতে পাচ্ছে।

'হ্যালো'

......

'বুঝেছি।'

......

'বুঝতে পারছি। ঠিক আছে।'

......

'আমি এখনই যাচ্ছি।'

মোবাইল রেখে দিয়ে অসীম দত্ত বললেন, 'আমাকে মনে হচ্ছে একবার অফিসে যেতে হবে। কাল ইনগরেশনে উড়িষ্যার মিনিস্টার অফ ট্যুরিসম আসছেন। মন্ত্রী আসা মানে অনেক ঝামেলা। আমি দু-একটা কাজ সেরে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসছি। আপনারা ডিনার শুরু করে দিন।'

'আপনার অফিসটা কত দূরে?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'কত দূরে আবার? এই রিসর্টের মধ্যেই। রিসেপশনের পেছনে আমার অফিস। আপনারা প্লিজ খেতে শুরু করুন। দীপশিখা তুমিও খেয়ে নাও। তোমাদের খাওয়া শেষ হবার আগেই আমি এসে পড়ব।'

অসীম দত্ত একজন দেহরক্ষীকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। অন্যজন রয়ে গেল। সেও মনে হল সঙ্গে যেতে চাইছে, কিন্তু, আদিত্য খেয়াল করল, অসীম দত্ত তাকে থাকতে বললেন।

শ্বেতা মল্লিক ব্যাঙ্কোয়েট হল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

মিনিট পাঁচেক পরে, যখন ফুড কাউন্টার কিছুটা ফাঁকা হয়েছে, আদিত্য উঠে দাঁড়াল, তার সঙ্গে কেয়া এবং দীপশিখাও।

দীপশিখা খাবার পছন্দ করছে। তার পেছনে কেয়া। সবশেষে আদিত্য। আদিত্য টের পেল তার পেছনে আরও দুজন এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের একজনের গা থেকে ভুর ভুর করে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে। আদিত্য পেছন দিকে না তাকিয়েই আন্দাজ করল, এ জয়ন্ত মল্লিক না হয়ে যায় না। এতক্ষণ নিশ্চয় রিসর্টের বারে ছিল। পরে সে খাবার অর্ডার দেবার সময় ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিল, তার অনুমান নির্ভুল। মনে হচ্ছে, জয়ন্ত মল্লিকের বউ তাকে বার থেকে ধরে নিয়ে এসেছে।

বিরাট খাদ্যতালিকা। মোগলাই, পাঞ্জাবি, বাঙালি-ওড়িয়া, গোয়ান-কঙ্কনিজ ছাড়াও চিনে এবং ইয়োরোপীয় নানারকম পদের ভিড়ে আদিত্য প্রায় হারিয়ে যাচ্ছিল। সে কেয়াকে জিজ্ঞেস করল, 'কী অর্ডার দিলে?'

'গুলৌটি কাবাব, রুমালি রুটি, মাটন চাঁপ আর ফিরনি। আর কিচ্ছু না। চেনা জিনিস খাওয়াই ভাল।'

আদিত্য অনেক ভেবেচিন্তে প্লেন রাইসের সঙ্গে ডাল ও ঝিঙ্গা ফ্রাই অর্থাৎ চিংড়িমাছ ভাজা এবং কষা মাংসর সঙ্গে লুচি দিতে বলল। শেষে গরম গুলাব জামুন। দীপশিখা মজুমদার দত্ত চিনে খাবারের অর্ডার দিয়েছে।

তারা আবার টেবিলে গিয়ে বসেছে, কিন্তু খাবার তখনও আসেনি, স্বাতী মল্লিক মাইক্রোফোন হাতে সামনে এসে দাঁড়াল।

'ডিনার খাবার পর কেউ চলে যেও না যেন। আমাদের প্রোগ্রামের লাস্ট পার্টটা এখনও বাকি আছে।' সে ঘোষণা করল। 'দাদুর জন্যে একটা বার্থ ডে গিফট আছে। সেটা দাদুর হাতে তুলে দিয়ে আমরা এই প্রোগ্রাম শেষ করব। কিন্তু দাদু গেল কোথায়?' শেষ প্রশ্নটা আদিত্যদের টেবিলের দিকে তাকিয়ে।

'উনি একটু আগে ওঁর অফিসে গেলেন। বললেন, এক্ষুনি চলে আসবেন।' আদিত্য গলাটা একটু তুলে বলল।

খাবার এল। খাবার প্রায় শেষ হতে চলল। অসীম দত্ত এখনও ফিরলেন না। খেতে খেতে আদিত্য লক্ষ করছিল অনেকেই বেরিয়ে যাচ্ছে। আবার একটু পরে ফিরেও আসছে। বোধহয় তারা বাথরুমে গিয়েছিল। কারা কারা বাইরে গেল আদিত্য আর হিসেব রাখতে পারছে না। আদিত্যদের টেবিলে সকলের খাওয়া শেষ। ওরা তিনজনেই হাত ধুয়ে এসেছে। পৌনে এগারোটা বাজতে চলল। সকলেই উসখুস করছে। অসীম দত্ত এখনও ফিরছেন না কেন?

যে দেহরক্ষীটি অসীম দত্তর সঙ্গে গিয়েছিল সে দরজা ঠেলে ঢুকেছে। অন্য দেহরক্ষীর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলল। এবার তারা দুজনেই আদিত্যর দিকে এগিয়ে আসছে। লোকগুলো মনে হয় অবাঙালি। একজন নিচু হয়ে আদিত্যর কানে ফিসফিস করে বলল, 'কুছ গড়বড় মনে হচ্ছে সাব। দত্তা সাব অফিসের দরওয়াজা খুলছেন না। দরওয়াজা ভেতর থেকে বনধ আছে। সমুন্দরের দিক থেকে অফিসে ঢোকার অর একটা দরওয়াজা আছে। ওয় ভি অন্দর সে বনধ।'

'ঘরে জানলা নেই? খিড়কি? জানলা দিয়ে কিছু দেখা যাচ্ছে না?' আদিত্য উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'খিড়কি হ্যায়। রিসেপশান কি সাইড মে ভি হ্যায় অর সমুন্দর কি সাইড মে ভি। লেকিন খিড়কি সে কুছ দিখাই নেহি দেতা। দোনো খিড়কি মে ভিনিশিয়ান ব্লাইন্ড ফৈলা হুয়া হ্যায়।'

আদিত্য উঠে দাঁড়াল। রঘুনন্দন কি ঘরের মধ্যে আছে? না, তাকে দেখা যাচ্ছে না। দেহরক্ষীদের সঙ্গে আদিত্য বাইরে বেরোল। রিসেপশানে গিয়ে দেখল সেখানে একটি ছেলে ডিউটি করছে।

'ম্যানেজার রঘুনন্দন পানিগ্রাহীকে এক্ষুনি রিসেপশানে চলে আসতে বলুন। বলুন এমার্জেন্সি।' আদিত্য প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে বলল।

মিনিট পাঁচেক পরে রঘুনন্দনের ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে অসীম দত্তর অফিসের দরজা খোলা হল। ঘরে আলো থইথই করছে। একদিকে বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিল, রিভলভিং চেয়ার, তার উল্টোদিকে কয়েকটা গদি-মোড়া চেয়ার অতিথিদের জন্য। আপাতত সব ফাঁকা। টেবিলের পেছনে সুদৃশ্য ফাইল ক্যাবিনেট। কয়েকটা ফাইল, একটা বাঁধানো ফটোগ্রাফ। অনুমান করতে কষ্ট হয় না ফটোগ্রাফটা অসীম দত্তর প্রয়াত স্ত্রীর। টেবিলের ওপর ক্যালেন্ডার, টাইমপিস, ডেস্কটপ, নোট লেখার ছোট কাগজ। টেবিলের এক কোণে অসীম দত্তর মোবাইল-চার্জারের এক দিকের মুখটা রয়েছে। প্লাগের দিকটা সকেটে লাগানো। কিন্তু মোবাইলটা নেই। দেখে মনে হয় মোবাইলটা চার্জ দিতে দিতে কেউ খুলে নিয়ে চলে গেছে।

ঘরের অপর প্রান্তে আর একটা দরজা। সেটা বন্ধ। এই দরজাটা খুললে মনে হয় সমুদ্রের দিকে যাওয়া যাবে। দরজাটার ঠিক সামনে, অসীম দত্ত চিৎ হয়ে পড়ে আছেন। বুকের বাঁ দিকে একটা ক্ষত। আদিত্যর অভিজ্ঞ চোখ বলে দিচ্ছিল ক্ষতটা পিস্তলের গুলি থেকে হয়েছে। সিল্কের পাঞ্জাবি রক্তে ভেসে যাচ্ছে। এক ঝলক দেখলেই বোঝা যায় দেহে প্রাণ নেই।

(৩)

আদিত্য শুনেছিল ডিএসপি সাহেব নিজে তদন্ত করতে আসছেন। তাই সে লালবাজারে তার বন্ধু গৌতমকে বলে রেখেছিল যেন কলকাতা থেকে তার সম্বন্ধে কিছু ভাল ভাল কথা এদিকের ওপর মহলকে জানিয়ে দেওয়া হয়। তাহলে, আর কিছু নয়, তদন্তের সময় আদিত্য পুলিশের সঙ্গে থাকতে পারবে। অসীম দত্ত খুন হয়ে যাবার পর থেকে সে বিরাট হীনমন্যতায় ভুগছে। নিজেকে বাঁচানোর জন্যেই তো লোকটা তাকে নিয়োগ করেছিল। সেই কাজে আদিত্য শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। নিজের সম্বন্ধে তার নিশ্চয় একটা অহেতুক উঁচু ধারণা হয়েছিল। ফলে সে কাজে মন দেয়নি। যার এই মর্মান্তিক পরিণতি। অসীম দত্তর মৃত্যুর পর থেকে আদিত্য কিছুতেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারছে না।

সারা রাত্তির আদিত্যর ঘুম হয়নি। কেয়া অবশ্য ভালই ঘুমিয়েছে। ভোরবেলা ঘরে চা দিয়েছিল। চা খাবার পর কেয়া জানলা খুলে সমুদ্র দেখছে। আকাশে মেঘ আছে। হাওয়া এলোমেলো। তাই সমুদ্রও কিছু অবিন্যস্ত।

'ব্রেকফাস্ট খেতে যাবে না?' কেয়া জানলার ধার থেকে জিজ্ঞেস করল। আটটা থেকে রিসর্টের মূল ডাইনিং হলে বুফে ব্রেকফাস্ট শুরু হয়।

'আমার খুব একটা খিদে হয়নি। সারা রাত ঘুম হয়নি তো। চল তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। একটা কফি খাব আর হয়তো একটা ডোনাট বা ক্রোয়াসঁ গোছের কিছু।'

'ডিএসপি আসবে বলছিলে, এলেই তো তোমার ডাক পড়বে। আর কিছু খাবার তো সময়ই পাবে না। এখন একটু কিছু খেয়ে নাও।'

'দেখি কী খাওয়া যায়। কিন্তু ডিএসপি এসে গেলে আমাকে বোধহয় সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হবে। তুমি একা একা কেন বোর হবে? গাড়িটা তো পড়ে আছে। কোনারক, নন্দন কানন এসব ঘুরে এসো না। পুরীতেও ঘুরে আসতে পার।'

'একা যেতে আমার বয়েই গেছে। তার থেকে ঘরে বসে জানলা দিয়ে সমুদ্র দেখব।'

ওরা নীচে গিয়ে দেখল অনেকেই ব্রেকফাস্ট খেতে শুরু করেছে। তার মধ্যে অসীম দত্তর পরিবারেরও কেউ কেউ আছে। একটা টেবিলে প্রদীপ এবং রাখি চক্রবর্তী ব্রেকফাস্ট খাচ্ছিলেন। আদিত্য আর কেয়া খাবার নিয়ে সেখানে বসল।

'জানেন তো কাল রাত্তিরে এখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।' আদিত্য সাবধানী গলায় বলল।

'জানি। রিসর্টের মালিক অসীম দত্ত খুন হয়েছে। একটু পরেই নাকি পুলিশের বড় কর্তারা আসবে। আমরা ভেবেছিলাম আজ কোনারক যাব। এখন মনে হচ্ছে যাওয়াটাই আটকে গেল।' প্রদীপ চক্রবর্তীর গলায় বিরক্তি।

'না, না। আমার মনে হয় না আপনাদের আটকাবে। আপনারা তো সাধারণ গেস্ট। অসীম দত্তকে চেনেনই না। অসীম দত্তর পরিবারের লোকেদের হয়তো পুলিশ আটকে রেখে জেরা করবে। আপনারা কীভাবে কোনারক যাবেন ভেবেছিলেন?'

'একটা গাড়ি ভাড়া করতাম। রিসেপশানই ঠিক করে দেবে বলেছিল। কিন্তু এখন এই ডামাডোলের মধ্যে কি আর গাড়ি পাওয়া যাবে?'

'প্রদীপবাবুদের সঙ্গে কোনারক ঘুরে আসবে নাকি?' আদিত্য কেয়ার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল।

'তুমি কী করবে?' মনে হচ্ছে প্রস্তাবটা কেয়ার একেবারে অপছন্দ হয়নি। ওদের সঙ্গে যেতে সে খুব একটা অস্বস্তি বোধ করবে না। রাখি চক্রবর্তীর সঙ্গে তার বেশ ভাব হয়ে গেছে।

'আমাকে তো পুলিশের সঙ্গে থাকতে হবে।'

তারপর সে প্রদীপ চক্রবর্তীকে বলল, 'আপনারা হয়তো জানেন না, অসীম দত্ত তার প্রোটেকশানের জন্য আমাকে এখানে আসতে বলেছিল। প্রোটেকশান তো দিতে পারিনি। এখন দেখি খুনিকে ধরার ব্যাপারে পুলিশকে কিছু সাহায্য করতে পারি কিনা।' আদিত্যর মুখ বেজার।

একটু থেমে সে রাখির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমাদের সঙ্গে একটা গাড়ি আছে। সেই গাড়িটা করে কেয়ার সঙ্গে আপনারা কোনারক, নন্দন কানন ঘুরে এলে আমার খুব ভাল লাগবে। কেয়া একা যেতে চাইছে না। আমিও এই অবস্থায় ওর সঙ্গে যেতে পারছি না। আপনারা ওর সঙ্গে গেলে সব দিক থেকে ভাল হয়। না হলে কেয়া একা ঘরে বসে বসে সারাদিন বোর হবে।'

কেয়া বা প্রদীপ-রাখি কাউকেই খুব বেশি জোর করতে হল না।

ওরা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রিসর্টের ভিতরে পুলিশের তিনটে গাড়ি ঢুকে পড়েছে। কেয়াদের সি-অফ করে আদিত্য ততক্ষণ লাউঞ্জেই বসে ছিল।

কৃষ্ণগোপাল পধি, সংক্ষেপে কৃষ্ণ পধি, ডিএসপি, ডিআইবি, পুরী ডিস্ট্রিক্ট, নাদুস-নুদুস চেহারার হাসিখুশি একজন মানুষ। সমস্ত পুরী জেলায় তিনি যে পুলিশের তিন নম্বর ব্যক্তি, সেটা তাঁর হাভভাব দেখে বোঝা যায় না। অথচ আদিত্য দেখেছে তাঁর থেকে ঢের নিচু পদমর্যাদার কেউ কেউ কী প্রচণ্ড রোয়াব নিয়ে থাকে। তাছাড়া কৃষ্ণ পধি বহুদিন পুরী জেলায় চাকরি করছেন এবং চাকরিসূত্রে বাঙালি পর্যটকদের ঝক্কি সামলেছেন। ফলে বাংলা ভাষাটা তিনি শুধু যে বুঝতে পারেন তাই নয়, মোটামুটি বলতেও পারেন।

সাধারণ খুন-টুন হলে ডিএসপি সাহেবের নিজের আসার কথা নয়। কিন্তু অসীম দত্তর খুনটা হাই প্রোফাইল মার্ডার। শুধু উড়িষ্যা বা পশ্চিমবঙ্গের নয়, সারা দেশের মিডিয়াতে বড় করে বেরিয়েছে। উপরন্তু এখানে পরের দিন মন্ত্রীর আসার কথা ছিল। যে রিসর্ট উদ্বোধনে মন্ত্রীর আসার কথা সেখানে আগের দিন রিসর্টের মালিক নিজেই খুন হয়ে গেলে খবরটা তো গুরুত্ব পাবেই। তাই ডিসপি সাহেব নিজেই তদন্তে এসেছেন। সঙ্গে স্থানীয় থানার দারোগাবাবুকেও অবশ্য নিয়ে এসেছেন। দারোগাটির বয়স বেশি নয়, চল্লিশের এদিক-ওদিক। নাম প্রশান্ত পণ্ডা। বোধহয় ডিএসপি সাহেব পথ বাতলে চলে গেলে প্রশান্ত পণ্ডা সেই পথে আরও বিশদ অনুসন্ধান চালিয়ে যাবে।

'আজ সকালে কলকাতা থেকে অ্যাডিশনাল কমিশানার সাহেব নিজে আমাকে ফোন করেছিলেন। আপনার কথা অনেকবার বললেন। আপনাকে আমাদের সঙ্গে পেয়ে খুব ভাল হল।' ডিএসপি কৃষ্ণ পধি জানালেন।

প্রয়াত অসীম দত্তর অফিসে বসে কথা হচ্ছিল। 'আপনি তো অসীম দত্তকে আগে থেকে চিনতেন। আপনি যেটুকু জানেন, জানালে আমাদের কাজের খুব সুবিধা হয়।' কথাগুলো বলে ডিএসপি সাহেব চায়ের কাপে চুমুক দিলেন।

এই অনুরোধটা যে আসবে আদিত্য আন্দাজ করেছিল। তাই সে মনে মনে নিজেকে গুছিয়ে নিচ্ছিল। অসীম দত্ত সম্বন্ধে সে যেটুকু জানে সেটা বলতে মিনিট পনেরো লাগল। সুভদ্র মাজির ফাইল থেকে সে যে নোট নিয়েছিল তার কথাও বলল। নোটগুলো সে তার সঙ্গে নিয়ে এসেছে। আদিত্য ডিএসপি সাহেবকে বলল, 'আপনি আমার এই নোটগুলো ফটোকপি করে নিতে পারেন। এই রিসর্টেই নিশ্চয় ফটোকপির ব্যবস্থা আছে।'

একটি কন্সটেবল নোটগুলো নিয়ে ফটোকপি করার জন্য রিসেপশনে চলে যাবার পর কৃষ্ণ পধি বললেন, 'প্রথমেই যাঁরা বডিটা দেখেছেন আপনি তাদের একজন। খুনটা কীভাবে হয়েছে আপনার মনে হয়?'

'দেখুন, এটা পরিষ্কার যে খুনি অসীম দত্তর চেনা। সে সমুদ্রের দিকের দরজা দিয়ে এসেছিল। অসীম দত্তই তাকে দরজা খুলে দিয়েছিলেন। ডিনারের ঠিক আগে অসীম দত্তর একটা ফোন এসেছিল। আমরা তার

সাক্ষী। ফোনটা খুনির হবারই বেশি সম্ভাবনা। ফোনে কথা বলতে গিয়ে অসীম দত্তকে খানিকটা উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছিল। আমরা অবশ্য একদিকের কথাগুলোই শুনেছি।বেশিক্ষণ কথা হয়নি। ফোনটা নামিয়ে রেখে অসীম দত্ত বেরিয়ে গেলেন।'

'অসীম দত্ত যখন বেরিয়ে গেলেন তখন আপনার কিছু অড মনে হয়নি?'

'আমার দু'টো জিনিস অড মনে হয়েছে। একটা অসীম দত্ত বেরিয়ে যাবার সময়। আর একটা তাঁর মৃতদেহটা দেখার সময়। অসীম দত্ত যখন বেরিয়ে গেলেন তখন একজন বডিগার্ড তাঁর সঙ্গে গেল। অন্যজনও যেতে চেয়েছিল, কিন্তু অসীম দত্ত নিজেই তাকে বারণ করলেন। এটা কেন করলেন? একজনের বদলে দু'জন বডিগার্ড থাকলে তো আরও ভাল হত। বিশেষ করে অফিসের দু'দিকে যখন দু'টো দরজা, তখন এটাই তো স্বাভাবিক যে দু'জন দু'টো দরজা পাহারা দেবে।'

'আর দ্বিতীয় অড জিনিস?'

'দ্বিতীয় অড ব্যাপারটা হল, খুনি অসীমবাবুর মোবাইলটা সঙ্গে নিয়ে গেছে। আমি ধরে নিচ্ছি ওটা খুনিই নিয়ে গেছে, কারণ আর কেউ তো ওই ঘরে ঢোকেনি।'

'এটা কেন অড বলছেন? মোবাইলটাতে খুনির নম্বরটা রেকর্ডেড আছে। সেই নম্বরটা সে পুলিশকে জানাতে চায় না। তাই সে মোবাইলটা নিয়ে গেছে।'

'তাই কি?' আদিত্য নিজের মনে বিড়বিড় করে বলল। তারপর কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'আজকাল পুলিশের হাতে যা টেকনোলজি আছে তাতে অনায়াসে জানা যায় গত এক মাস কোন কোন নম্বর থেকে অসীম দত্তর মোবাইলে ফোন এসেছিল। এটা কি খুনি জানত না? যদি জানত, তা হলে সে মোবাইল নিয়ে যাবার ঝামেলাটা করতে গেল কেন?'

'মোবাইল নেওয়াটাকে ঝামেলা বলছেন কেন?'

'এই জন্যে বলছি, খুনি নিশ্চয় বেশ তাড়ার মধ্যে ছিল। এবং সে নিশ্চয় আগে থেকে জানত না যে মোবাইলটা সে টেবিলের ওপরেই পেয়ে যাবে। বস্তুত, সে যত বেশিক্ষণ অফিস-ঘরের মধ্যে থাকছে তত তার ধরা পড়ার রিস্ক। সে জেনেশুনে রিস্কটা নিল কেন?'

'হয়তো পুলিশের টেকনোলজির ব্যাপারে খুনির খুব ভাল ধারণা নেই, তাই সে রিস্কটা নিয়েছিল।' ডিএসপি সাহেব তাঁর তত্ত্বে অনড়।

'হতেও পারে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এর মধ্যে আরও কিছু আছে। হয়তো মোবাইলটার ভেতর এমন কিছু ছিল যেটা খুনি পুলিশকে জানতে দিতে চায় না। যদি দ্যাখেন, যে-নম্বরটা থেকে অসীম দত্তর মোবাইলে শেষ কলটা এসেছিল সেটা ট্রেস করা যাচ্ছে না, তা হলে ধরে নিতে হবে পুলিশের টেকনোলজির ব্যাপারটা খুনি ভালই জানে।'

'দেখা যাক। সেটা হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। কিন্তু আপনি প্রথম যে ব্যাপারটা অড লেগেছে বললেন তার কোনও এক্সপ্লানেশন কি আপনার মাথায় আছে?'

'একটা পসিবল এক্সপ্লানেশন আমি ভেবেছি। অসীম দত্ত খুনির সঙ্গে গোপনে দেখা করতে চেয়েছিলেন। তিনি খুনিকে সমুদ্রের দিকের দরজা দিয়ে আসতে বলেছিলেন যাতে তাকে কেউ দেখতে না পায়। সেইজন্যে তিনি সমুদ্রের দিকের দরজায় কোনও গার্ড রাখেননি। একজন সিকিউরিটিকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন যে শুধু রিসেপশানের দিকের দরজায় গার্ড দিতে পারবে।

'খুনি এসে সমুদ্রের দিকের দরজাটায় টোকা দিল। অসীম দত্তর সঙ্গে খুনির আগেই কথা হয়ে গিয়েছিল যে সে সমুদ্রের দিকের দরজাটা দিয়ে ঢুকবে। সেই অনুযায়ী অসীম দত্ত দরজা খুলে দিলেন। খুনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গুলি করল। সমুদ্রের গর্জনে গুলির শব্দটা চাপা পড়ে গেল। তারপর খুনি ঘরের মধ্যে ঢুকে অসীম দত্তর মোবাইলটা পকেটে পুরে নিল। মোবাইলটা টেবিলের ওপরে ছিল। অসীম দত্ত সেটাতে চার্জ দিচ্ছিলেন।

মোবাইলটা নিয়ে খুনি সমুদ্রের দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় দরজার লকটা টিপে দিয়ে বাইরে থেকে টেনে দিল। দরজা লক হয়ে গেল। আমার মনে হয়, মোটামুটি এইরকমই একটা কিছু ঘটেছিল।'

'আপনি যেভাবে ব্যাপারটা বললেন তাতে মনে হচ্ছে ঠিক এটাই ঘটেছিল। আর কিছু কি আপনার নজরে এসেছে?' কৃষ্ণ পধির গলাটা চিন্তান্বিত শোনাচ্ছে।

'আর একটা জিনিস নজরে এসেছে। যদিও ব্যাপারটা নিয়ে আমি এখনও শিয়োর নই তবু আপনাকে জানিয়ে রাখা ভাল।' আদিত্য একটু ইতস্তত করে বলল।

'বলুন না। বলুন, বলুন।'

'মৃতদেহটা দেখে মনে হল গুলিটা একটা ছোট হ্যান্ডগান থেকে করা হয়েছিল। খুব সম্ভবত .৩২পিস্তল। অবশ্য ব্যালিস্টিক রিপোর্টটা এলে শিয়োর হওয়া যাবে।'

'সেটা তো হতেই পারে। কিন্তু .৩২ পিস্তল দিয়ে খুন যদি হয়ও তাতে কী প্রমাণিত হল?' ডিএসপি সাহেব কিঞ্চিত অধৈর্য।

'হ্যাঁ, সেটা তো হতেই পারে। যদি হয়, তাহলে বলতে হবে আগের বার অসীম দত্তকে যে ধরনের পিস্তল দিয়ে হত্যার চেষ্টা হয়েছিল, একই ধরনের অস্ত্র দিয়ে গুলি করে এবার তাকে খুন করা হল। অর্থাৎ এটা খুবই সম্ভব যে দু'টো ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি একই অস্ত্র থেকে গুলি চালিয়েছিল।'

'হুঁ, বুঝলাম।' ডিএসপি সাহেব মাথা নাড়লেন।

'কিন্তু দু'টো জিনিস বোঝা যাচ্ছে না।' কথাটা বলে আদিত্য চিন্তায় ডুবে গেল।

'কী জিনিস?'

'মাস দেড়েক আগে যে গুলিটা অসীম দত্তর মোবাইল পেরিয়ে তাঁর শরীরে প্রবেশ করতে পারেনি সেটা ১৯৫২/৫৩ সালে তৈরি একটা স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন .৩২ রিভলভর। সম্ভবত ওই অস্ত্রটা দিয়েই গত রাত্তিরে অসীম দত্তকে খুন করা হয়েছে। প্রথম কথা হল, খুনি এত প্রাচীন একটা অস্ত্র ব্যবহার করছে কেন? অস্ত্রটা সম্ভবত বেআইনি, অর্থাৎ কারোর নামে ওটার লাইসেন্স নেই। বেআইনি অস্ত্র বাজারে নিশ্চয় ভাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু ভাড়া করতে গেলে, নাইন এম এম চাইনিজ রিভলভর জাতীয় আরও আধুনিক কিছু ভাড়া পাওয়াটাই স্বাভাবিক। এত পুরোনো অস্ত্র এবং তার কার্তুজ কি বাজারে ভাড়া পাওয়া যাবে? যদি না যায়, তাহলে খুনি এই অস্ত্রটা পেল কোথায়?' আদিত্য থামল।

কনস্টেবল, আদিত্যর নোটগুলো ফটোকপি করে নিয়ে এসেছে। সে ফটোকপিটা ডিএসপি সাহেবের হাতে দিয়ে অরিজিনালটা আদিত্যকে ফিরিয়ে দিল। কাগজগুলো হাতে নিয়ে ডিএসপি সাহেব বললেন, 'আর দ্বিতীয় কোন জিনিসটা বুঝতে পারছেন না?'

'দ্বিতীয় ধাঁধাটা হল, অসীম দত্ত কেন খুনিকে দরজা খুলে দিলেন? তিনি ঘরপোড়া গোরু, একবার গুলি খেয়ে অতি সাবধানী হয়ে গেছেন। তাহলে তিনি কেন খুনিকে তাঁর অফিসে ঢোকার সুযোগ করে দিলেন? তাহলে কি তিনি খুনিকে একেবারেই সন্দেহের ঊর্ধ্বে রেখেছিলেন? যদি ধরে নিই, তাঁর আত্মীয়দের কেউ তাঁকে খুন করেছেন, তাহলে খুঁজে বার করতে হবে কোন আত্মীয়কে তিনি সন্দেহের ঊর্ধ্বে রেখেছিলেন?'

'বুঝলাম, বুঝলাম। আপনি আমাদের কাজ অনেকটা এগিয়ে দিচ্ছেন। আপনাকে শুধু আর দুটো জিনিস জিজ্ঞেস করব। এক, অসীম দত্তর মৃত্যুর পর কারা তাঁর সম্পত্তির মালিক হবেন? দুই, গতকাল রাত্তিরে অসীম দত্ত ব্যাঙ্কোয়েট হল থেকে বেরিয়ে যাওয়া এবং অসীম দত্তর বডিগার্ড ব্যাঙ্কোয়েট হলে ফিরে আসা এই দু'টোর মধ্যে যে সময়টা, সেই সময়ে কারা কারা ব্যাঙ্কোয়েট হল থেকে বেরিয়েছিল আপনার কি মনে আছে?'

'আপনার প্রথম প্রশ্নটা আমি অসীম দত্তকে করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, তিনি তাঁর উইলে সমস্ত সম্পত্তি মেয়ে এবং ছেলেদের মধ্যে মোটামুটি সমান ভাগে ভাগ করে দিয়েছেন। তবে নাতি এবং নাতনির জন্যেও আলাদা করে কিছু রাখা আছে। আর তাঁর ছোট ছেলের বউ-এর জন্যেও তিনি আলাদা করে কিছু রেখেছেন। তিনি এটাও বলেছিলেন, ছোট ছেলে যদি তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেই যায় তাহলে তিনি ছোট ছেলের অংশ ছোট বউমাকেই দিয়ে যাবেন। এবং এটা তিনি ছোট ছেলেকে জানিয়েও দিয়েছিলেন।'

'আর আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটার উত্তর?'

'আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নটার উত্তর দেওয়া আর একটু কঠিন। আমার ধারণা, খাওয়ার পরে প্রত্যেকেই হাত-মুখ ধুতে বাইরে বেরিয়েছিলেন। আপনি নিশ্চয় লক্ষ করেছেন বাথরুমটা ব্যাঙ্কয়েট হলের বাইরে। সত্যি বলতে কি, কে কতক্ষণ বাইরে ছিল আমি খেয়াল করিনি। শুধু এইটা মনে আছে, দীপশিখা মজুমদার দত্ত মুখ ধুতে বেরিয়ে বেশ খানিকটা পরে ফিরেছিলেন। ফিরে এসে আমার স্ত্রীকে বলেছিলেন, বন্ধ ঘরে বসে বসে ওঁর মাথা ধরেছিল বলে কিছুক্ষণ সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়েছিলেন। দীপশিখাকে লক্ষ করেছিলাম কারণ উনি আমাদের টেবিলেই বসেছিলেন।'

ডিএসপি সাহেব কিছু বলার আগেই আদিত্যর ফোনটা বেজে উঠল। কেয়া। আদিত্য কৃষ্ণ পধিকে 'প্লিজ এক্সকিউজ মি' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে ফোনটা ধরল।

'আমরা ফিরে এসেছি।' কেয়ার গলায় চাপা উত্তেজনা।

'সে কী! কেন? ফিরে এলে কেন?' আদিত্য উৎকণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞেস করল।

'কোনারকে গিয়ে রাখিদি খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মন্দিরের সামনে একটা স্ট্রাকচার রয়েছে যেটাতে উঠতে গেলে অনেকগুলো সিঁড়ি ভাঙতে হয়। মন্দিরটা এই স্ট্রাকচারটার পেছনে। রাখিদি ওই স্ট্রাকচারটাতে জোর করে উঠলেন। ওখানে ওঠা ওঁর উচিত হয়নি। ওপরে বিশেষ কিছু নেই। আমি ওঁকে সিঁড়ি ভাঙতে বারণ করলাম। উনি শুনলেন না। বললেন, ঠিক পেরে যাব। প্রদীপদাও বারণ করলেন। বললেন, হয়তো পারবে, কিন্তু দরকার কী? কারও কথা না শুনে উনি সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলেন। তারপর আবার ওখান থেকে নেমে মন্দির দেখলেন। এবং তারপর ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমাদের ফিরে আসা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।

'এখন উনি কেমন আছেন?'

'অনেকটা ভাল। আমি তো এতক্ষণ ওদের ঘরেই ছিলাম।'

'তুমি এখন ঘরে যাবে তো? চাবি রিসেপশনে আছে।'

'একটু ঘরে যাব। বাথরুমে যেতে হবে। লাঞ্চ খেয়েছ?'

'খাইনি এখনও। তুমি?'

'আমিও খাইনি। চল একসঙ্গে লাঞ্চ খাব। তুমি ঘরে যাও আমি একটু পরেই যাচ্ছি।'

'তারপর আবার তো তোমাকে ডিএসপির সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে।'

'ভাবছি, আজ বাকি দিনটা তোমার সঙ্গে কাটাব। দেখি ডিএসপি সাহেবের কাছ থেকে ছুটি পাই কিনা।'

'সত্যি বলছ?' কেয়া আদিত্যর কথাগুলো বিশ্বাসই করতে পারছে না।

একটু পরে আদিত্য অসীম দত্তর অফিসে ঢুকে বলল, সরি, ফোনে কথা বলতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল। আপনাদের এখন কী প্ল্যান?'

কৃষ্ণ পধি ইন্সপেক্টার প্রশান্ত পণ্ডার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন, 'আগে লাঞ্চ খেতে হবে। তারপর অসীম দত্তর রিলেটিভদের ইন্টারোগেট করব। আপনি চাইলে আমাদের সঙ্গে থাকতে পারেন।'

'আমি ভাবছিলাম আজ বিকেলে একটু পুরী ঘুরে আসব। আসলে আমার স্ত্রী তো একা একা খুব বোর হচ্ছে। ওর সঙ্গে একটু সময় কাটানো দরকার। তাই যদি আপনাদের সঙ্গে ইন্টারোগেশনের সময় না থাকি

খুব অসুবিধে হবে? কাল সকালে বরং আপনাকে একটা ফোন করে আপনার অফিসে একবার ঘুরে আসব?' আদিত্য কুণ্ঠিত গলায় বলল।

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। আপনি ঘুরে আসুন। হ্যাভ এ নাইস টাইম।' ডিএসপি সাহেবকে দরাজ শোনাল। 'কাল চলে আসবেন। আমি দশটার মধ্যে অফিসে পৌঁছে যাই।'

ঘরের দিকে আসতে আসতে আদিত্য ভাবছিল জিজ্ঞাসাবাদের সময় পুলিশের সঙ্গে থাকলে নিশ্চয় লাভ হত, কিন্তু এখন কেয়ার সঙ্গে সময় কাটাতে তার ভীষণ ইচ্ছে করছে। যে কাজটা এখানে বাকি রয়ে গেল সেটা কলকাতায় ফিরে পুষিয়ে দিতে হবে।

(৪)

এই ফেব্রুয়ারি মাসেই চড়া রোদ্দুর। আদিত্যরা ভেবেছিল ডাইনিং হলে লাঞ্চ খেয়েই বেরিয়ে পড়বে। রোদ্দুরের তেজ দেখে ভরসা হল না। সমুদ্রের ধারটা যেন ঝলসে যাচ্ছে। এখন কিছুটা বিশ্রাম করে নিয়ে বিকেলের দিকে বেরোনোটাই বুদ্ধির কাজ হবে।

ঘরে ফিরে, পোশাক পালটে কেয়া বিছানার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে টিভি দেখছে। বাংলা চ্যানেলে কী একটা পুরোনো উত্তম-সুচিত্রার ছবি দেখাচ্ছে। মিনিট তিনেক অলস চোখে টিভি দেখতে দেখতে আদিত্যর চোখ দু'টো ঘুমে ঢুলে এল। ঘুমের আর কী দোষ, কাল রাত্তিরে আদিত্যর একেবারে ঘুম হয়নি। যখন ঘুম ভাঙল তখন পৌনে চারটে বাজে। টিভি বন্ধ। কেয়া নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে।

আদিত্য রুম সার্ভিসে দু'কাপ চায়ের অর্ডার দিল। চা আসতে আসতে মনে হয় কেয়ার ঘুম ভেঙে যাবে।

'কেমন বেড়ালে আজকে?' একটু পরে চা খেতে খেতে কেয়াকে জিজ্ঞেস করল আদিত্য।

'ভালই তো বেড়াচ্ছিলাম। রাখিদি জেদ করে অতগুলো সিঁড়ি ভাঙতে না গেলে নন্দন কানন, উদয়গিরি খণ্ডগিরি সব দেখা হয়ে যেত। চা-টা খেয়ে ওদের একবার ফোন করতে হবে। রাখিদি কেমন আছে কে জানে?'

'ওরা লোক কেমন?' আদিত্য আলগোছে জিজ্ঞেস করল।

'খুব ভাল লোক। বিশেষ করে রাখিদির তো তুলনাই হয় না। অত ভারী একটা অসুখ, তবু সব সময় মুখে হাসি লেগে আছে। প্রদীপদাও কিন্তু রাখিদিকে খুব সাপোর্ট দেয়। বউকে খুব ভালবাসে। তোমার মতো নয়। বউকে অন্যদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে ডিএসপির সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় না।' শেষের কথাগুলো কেয়া আদিত্যকে ঠেস দিয়ে বলল।

'আরে না, না। আমিও বউকে যথেষ্টই ভালবাসি। তাই তো আজ বউকে নিয়ে পুরী বেড়াতে যাব।' আদিত্য হাত বাড়িয়ে কেয়ার হাতটা ছুঁয়ে রয়েছে।

'জান তো, ফেব্রুয়ারির শেষে রাখিদির একটা খুব বড় অপরেশন হবে। বম্বেতে একজন ডাক্তার আছেন, অরুণ কুলকার্নি। উনি দু'তিন মাসে একবার করে কলকাতায় এসে অপরেশন করেন। উনি নাকি সারা দেশে এক নম্বর। ওই অপরেশনটা যদি সাকসেসফুল হয় তাহলে রাখিদির আয়ু অনেকটা বেড়ে যাবে। আর সেটা না হলে কী হবে কেউ জানে না। রাখিদি এসব কথা হাসতে হাসতেই বলছিল। আমার তো শুনতে শুনতে চোখে জল এসে যাচ্ছিল।'

'তোমার মনটা খুব নরম। এসব নিয়ে বেশি ভেবো না। ভেবে তো লাভ নেই। আমরা কিছুই করতে পারব না। তার থেকে তুমি তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। আমরা রওনা হয়ে যাই।'

বেরোনোর জন্যে তৈরি হতে হতে আদিত্য অন্য কথা ভাবছিল। অরুণ কুলকার্নির নাম সেও শুনেছে। বিরাট ডাক্তার। কিন্তু এক নম্বরের অর্থপিশাচ। ওকে নিয়ে আদিত্য একটা লেখা পড়েছিল। অবিশ্বাস্য সব

অপরেশন করেছে। কিন্তু পুরো টাকা না পেলে অরুণ কুলকার্নি অপরেশন করে না। আর সেটাও অবিশ্বাস্য অঙ্কের একটা টাকা। ওকে দিয়ে অপারেশন করানোর টাকা প্রদীপ চক্রবর্তী পাচ্ছে কোথায়? প্রদীপ চক্রবর্তীকে দেখে মনে হয় না অনেক টাকা জমাতে পেরেছে। হয়তো স্ত্রীর চিকিৎসার খরচ মেটাতে গিয়ে লোকটা বাড়ি-টাড়ি যা কিছু আছে সব বিক্রি করে দিচ্ছে। নাঃ, মানতেই হবে, প্রদীপ চক্রবর্তী বউকে ভালবাসে।

আদিত্যর দেবদ্বিজে ভক্তি নেই। কেয়ার আছে। অবশ্য ভক্তি না বলে ভয় বলাই সমীচীন। পুরীতে এসে জগন্নাথ মন্দিরে না গেলে ঠাকুর পাপ দিতে পারে এই ভয়ে কেয়া মন্দিরে যাবার কথা আগেভাগেই বলে নিয়েছে। অগত্যা আদিত্যকেও রাজি হতে হল।

স্বর্গদ্বারের সামনে সমুদ্র সৈকতটা এতটাই ঘিঞ্জি এবং অপরিষ্কার যে ওখানে বসতে মন চাইল না। সৌভাগ্যবশত, স্বর্গদ্বার ছাড়িয়ে পুরী শহর আরও এগিয়ে গেছে। সমুদ্রের ধার দিয়ে নতুন রাস্তা হয়েছে নিউ মেরিন ড্রাইভ। এদিকটা এখনও অনেকটাই ফাঁকা। গাড়িটাকে খানিক দূর অবধি নিয়ে গিয়ে তারপর ছেড়ে দেওয়া হল। দরকার হলে পরে ডেকে নেওয়া যাবে। আদিত্য আর কেয়া এখন সমুদ্রের ধারে অনেকক্ষণ হাঁটবে। নিউ মেরিন ড্রাইভে অনেক নতুন হোটেল হয়েছে। গতবার যখন কেয়া পুরী এসেছিল তখন এগুলো ছিল না। এই ফেব্রুয়ারি মাসে বিকেলের আয়ু বেশি নয়, কিন্তু স্থান-মাহাত্ম্যের কারণে হাওয়ায় দাঁত নেই, শুধু লবণাক্ত আর্দ্রতা আছে। তাই এই পড়ন্ত বিকেলেও সাহস করে কেউ কেউ সমুদ্রস্নানে নেমেছে।

আকাশ জুড়ে হাওয়ার রাখাল মেঘেদের গাভীর মতো তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শ্যামলী, ধবলী, পাটলী সব মেঘ। তাদের দীর্ঘ ছায়া সমুদ্রে পড়েছে। আদিত্য দেখল, আদিগন্ত সমুদ্রে ছোট-বড় কত রকম ঢেউ। উঠছে, নামছে, ভাঙছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে। যেন আকাশের মাঠে হাওয়া আর মেঘেদের খেলায় খুশি হয়ে বিরাট সমুদ্রটা হাততালি দিচ্ছে। এই সমুদ্রই আদিত্য দেখতে চেয়েছিল।

সূর্যটা পশ্চিমদিকের আকাশে টুপ করে ডুবে গেল। এবার একটু একটু করে অন্ধকার নেমে আসবে। আদিত্যর চা-কফি কিছু একটা খেতে ইচ্ছে করছে। কথাটা সে কেয়াকে জানাতে কেয়া বলল, 'একটু আগে আসার সময় একটা কফিশপ দেখলাম না? ওখানেই তো কফি খাওয়া যায়।'

খেয়াল করেনি, ওরা হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে এসেছে। কফিশপ অবধি ফিরে যেতেই প্রায় আধঘণ্টা লেগে গেল। কফিশপের দোরগোড়ায় পৌঁছে থমকে দাঁড়িয়ে কেয়া বলল, 'এখন যদি কফি খেতে ঢোকো, মন্দিরে গিয়ে আরতি দেখব কী করে?'

আদিত্য ভেবে দেখল কথাটা ঠিক। ঘড়িতে সোয়া ছটা বাজে। তারা রিসর্টের রিসেপশন থেকে জেনে এসেছে সাতটায় সন্ধ্যারতি। মন্দিরে বেশ ভিড় হয়। তাই একটু আগে আগে পৌঁছে যাওয়া ভাল। এখান থেকে গাড়িতে স্বর্গদ্বারের মোড় পর্যন্ত যেতে খুব বেশি সময় লাগবে না। কিন্তু তারপর গাড়ির পক্ষে খুব তাড়াতাড়ি এগোনো শক্ত। মন্দিরের রাস্তায় সন্ধেবেলা খুব জ্যাম থাকে। ড্রাইভার বলেছিল, গাড়িটা স্বর্গদ্বারের কাছে রেখে রিকশা নিয়ে নিলে তাড়াতাড়ি হবে। সব মিলিয়ে আদিত্যর মনে হল কফি খাওয়ার প্ল্যানটা আপাতত পরিত্যাগ করাই ভাল। সে ফোন করে ড্রাইভারকে কফিশপটার সামনে চলে আসতে বলল।

রিকশায় যেতে যেতে আদিত্য ভাবছিল এটাই প্রকৃত ভারতবর্ষ। মন্দিরের রাস্তায় কাতারে কাতারে লোক চলেছে। দু-দিকে দোকান শাড়ি, গামছা, বাসনকোসন, খেলনাপত্র। চাল-ডাল, মশলাপাতির দোকানও আছে। দু-একটা দোকানে গরম জিলিপি ভাজছে। আদিত্যর দেখেই খেতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু কেয়াকে বললেই ধমক খেতে হবে সেই ভয়ে আদিত্য মনের ইচ্ছেটা মনেই চেপে রাখল। রাস্তার দু-ধারে ভিখিরিরা সার দিয়ে বসে ভিক্ষে চাইছে। পাশাপাশি অনেকে। টাফ কম্পিটিশন। তাদের পাশেই মস্ত হাঁড়ি নিয়ে বসেছে একজন ছানাপোড়া ও ক্ষীরমোহন বিক্রেতা। এক প্রৌঢ় পুণ্যার্থী রাস্তার মাঝখানে উবু হয়ে বসে একটা পেল্লায় ষাঁড়কে

শসা খাওয়াচ্ছে। সাত-আটজন গৈরিক ধুতি-চাদর পরিহিত মুণ্ডিতমস্তক দীর্ঘ শিখাধারী পুরোহিত রাস্তার ধার দিয়ে লাইন করে চলেছে। দেখতে দেখতে মন্দির এসে গেল।

সন্ধারতিটা আদিত্যর বেশ ভালই লাগল। কেয়াদের বাড়ির এক পাণ্ডা আছেন, বৃদ্ধ মানুষ, নাম গোবিন্দগোপাল শৃঙ্গারী, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তিনি আদিত্যদের সন্ধ্যারতি দেখার ভাল ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। মন্দির থেকে বেরিয়ে আদিত্যকে আবার চা খাবার বাসনাটা পেয়ে বসল। কিন্তু মন্দিরের কাছাকাছি তেমন কোনও জায়গা পছন্দ হল না যেখানে কেয়াকে নিয়ে নিরিবিলিতে বসে এক কাপ চা বা কফি খেতে পারে। অগত্যা আবার স্বর্গদ্বার। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করতে সে কিছু ভাতের হোটেলের কথা বলল যেখানে সন্ধেবেলা কফি-টফিও পাওয়া যায়। কিন্তু সেরকম জায়গা আদিত্য ঠিক চাইছে না।

অবশেষে আদিত্যরা ঠিক করল নিউ পুরীর সেই কফিশপটাতেই আবার ফিরে যাবে। রাত্তির এমন কিছু হয়নি। সবে আটটা।

কফিশপের ভেতরটা প্রায়ান্ধকার। বাইরে থেকে ভেতরে ঢুকলে প্রথমে কিছুই দেখা যায় না। তারপর ধীরে ধীরে চোখ সয়ে এলে ঘরের ভেতরের অবয়বগুলো একটু একটু করে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। আদিত্য দার্জিলিং চা খাবে, কেয়া কফি লাটে। আদিত্য ভেবেছিল সঙ্গে দুপ্লেট মাডকেক বলবে। কেয়া রাজি হল না। বলল, অনেক রাত্তির হয়ে গেছে। এখন কিছু খেলে রাত্তিরে ডিনার খেতে পারবে না।

এই কফিশপটার সব থেকে বড় আকর্ষণ হল এখানে জানলার ধারে বসে সমুদ্র দেখা যায়। অবশ্য সমুদ্র প্রায় পুরোটাই এখন অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেছে, শুধু দু-একটা ঘর-ফেরতা নৌকোতে টিমটিম করে আলো জ্বলছে।

আধো-অন্ধকারে দুটি ছায়ামূর্তি আদিত্যদের টেবিলের দিকে এগিয়ে আসছে। একজন পুরুষ, একজন নারী। আদিত্য তাদের চেনে। কফিশপে তাদের উপস্থিতি আদিত্য আগেই খেয়াল করেছিল, কেয়াকে কিছু বলেনি। এবার তারা আদিত্যদের টেবিলের একেবারে সামনে চলে এসেছে।

মেয়েটি বলল, 'আমাদের চিনতে পারছেন? আমি স্বাতী, অসীম দত্তর নাতনি। আমার সঙ্গে আমার মামাতো ভাই শুভ্র। আমরা এখানে একটু বসতে পারি?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। বোসো তোমরা।' আদিত্য কিছু বলার আগেই কেয়া বলে উঠল। 'অন্ধকারে আমি তো প্রথমে তোমাদের চিনতেই পারিনি।'

'কফি খাবে?' দুজন বসার পর আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'না, না। আমরা দু-বার কফি খেয়েছি। আর কফি খেলে রাত্তিরে ঘুম হবে না।' শুভ্র তাড়াতাড়ি বলল। 'আমরা আপনাদের সময় বেশি নষ্ট করব না। দু-একটা কথা বলেই চলে যাব।'

'তোমরা মোটেই আমাদের সময় নষ্ট করছ না। তোমাদের সঙ্গে বসে কফি খেতে আমাদের খুব ভাল লাগবে।' কেয়া বলল।

আদিত্যর চা এবং কেয়ার কফি লাটে এসে গেছে।

'আচ্ছা, তোমরা ছাড়া পেলে কী করে? আজ তো ডিএসপি কৃষ্ণ পধি তোমাদের সকলকে ইন্টারোগেট করবেন বলেছিলেন। ইন্টারোগেশন শেষ হয়ে গেছে?' আদিত্য চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'আরে না, না। ইন্টারোগেশন আজ হয়নি। ডিএসপি সাহেবের কী একটা দরকারি কাজ পড়ে গেছে। কাল সকাল থেকে ইন্টারোগেশন শুরু হবে। আমাদের সবাইকে হোটেলে থাকতে বলেছে। অনেক বলে-টলে আজ আমাদের ছুটি করিয়ে নিয়েছি। আজ আমরা যেখানে খুশি যেতে পারি। তবে পুরীর মধ্যে। পুরীর বাইরে কোথাও যাওয়া যাবে না।' স্বাতী গড়গড় করে বলে গেল। সে একটু তাড়াতাড়ি কথা বলে।

ইন্টারোগেশন হয়নি শুনে আদিত্য মনে মনে খুশি হল। কাল ইন্টারোগেশন হলে সে প্রথম থেকেই পুলিশের সঙ্গে থাকতে পারবে।

'আমরা আপনাকে একটা ছোট্ট কথা বলতে এসেছি।' শুভ্র আদিত্যর দিকে তাকিয়ে কুণ্ঠিতভাবে বলল। 'যখন দেখলাম আপনারা এই রেস্টোরেন্টে ঢুকছেন, তখন আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে ঠিক করলাম আপনার সঙ্গে কথা বলতেই হবে।'

'বল কী বলবে।' আদিত্য পূর্ণদৃষ্টিতে শুভ্র দত্তর দিকে তাকাল। কাল ছেলেটার চেহারায় যতটা হাসিখুশি, আত্মবিশ্বাসী ভাব আদিত্য দেখেছিল, আজ তার ছিটেফোঁটাও দেখতে পাচ্ছে না। একদিনে যেন ছেলেটার দশ বছর বয়েস বেড়ে গেছে। তার দিদিকে কিন্তু ততটা উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে না।

'আমরা যেটা বলতে চাইছি সেটা হল, পুলিশ যেন ধরেই নিয়েছে দাদুকে তার পরিবারের কেউ খুন করেছে। এটা কিন্তু সত্যি নয়। আমাদের পরিবারে সকলেই সমান ভাল বা সৎ তা বলছি না। কিন্তু আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি টাকার লোভে দাদুকে খুন করবে এমন খারাপ লোক আমাদের পরিবারে নেই।'

'শুভ্র, তোমার সেন্টিমেন্টটা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু পুলিশকে তো শুধু আবেগ দিয়ে তুমি ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। পুলিশ মোটিভ খুঁজবে, প্রমাণ দেখতে চাইবে। আর এটা তো তুমি মানবে যে তোমার দাদুকে খুন করার মোটিভ তোমাদের পরিবারের সকলেরই ছিল।'

শুভ্র মাথা নিচু করে রইল। তার কাছে আদিত্যর কথার কোনও উত্তর নেই। তার দিদি বলল, 'আপনি তো দাদুর সঙ্গে আগে কথা বলেছেন। আপনার কি মনে হয়েছে দাদু তার পরিবারের লোকেদেরই সন্দেহ করত?'

'করতেন না এটা বলা যাবে না। বরং জোর দিয়ে বলা যায় কিছুটা সন্দেহ করতেন। না হলে এই পারিবারিক গেট টুগেদারের মধ্যে আমাকে আসতে বলবেন কেন? তাছাড়া গত রাত্তিরে কেক কাটার আগে তিনি যা বলেছিলেন তাতে এটাই মনে হয় না কি তিনি তাঁর পরিবারকে সন্দেহের বাইরে রাখেননি?'

'কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখুন। পরিবারের কেউ যদি এই কাজটা করত তাহলে সে তো কলকাতাতে বসেও কাজটা করতে পারত। এই জায়গাটা বেছে নিল কেন? এই জায়গাটা বেছে নেবার মানে যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো হচ্ছে পরিবারের কেউ খুনটা করেছে। কারণ এখানে পরিবারের লোক ছাড়া দাদুর চেনা আর কেউ ছিল না। পরিবারের কেউ এই কাজটা করলে সে অন্য জায়গা বেছে নিত না কি?' স্বাতী মল্লিক থেমে থেমে কথাগুলো বলল।

আদিত্য মনে মনে ভাবল, মেয়েটার বেশ বুদ্ধি আছে। স্বাতীর কথার উল্টো যুক্তি আদিত্য দিতে পারত কিন্তু তা না দিয়ে সে স্বাতীর দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল, 'তাহলে তোমাদের মতে কে খুনটা করেছে?'

'আমাদের মনে হয় কোনও বাইরের লোক খুনটা করেছে। দাদুর তো শত্রুর অভাব ছিল না। তারাই হয়তো কেউ প্রফেশানাল লোক দিয়ে কাজটা করিয়েছে।'

'কারা তোমাদের দাদুর শত্রু ছিল তোমরা জান?'

'দাদুর অনেক শত্রু ছিল। একটা পুরোনো স্ক্যান্ডেল ...' বলতে বলতে শুভ্র থেমে গেল। মনে হল টেবিলের তলা দিয়ে স্বাতী তাকে চিমটি কাটল।

'স্ক্যান্ডেল? কীসের স্ক্যান্ডেল?' আদিত্য উদগ্রীব।

'না, না। আমি ভুল বলছিলাম। কিছু নয়, সেরকম কিছু হয়নি। আমি ভুল বলেছি।'

'আমার কাছে কোনও তথ্য লুকোলে আমি কিন্তু তোমাদের সাহায্য করতে পারব না।' আদিত্য হতাশ গলায় বলল। শুভ্র দত্ত নিশ্চুপ। আদিত্য বুঝল তার কাছ থেকে আর কোনও কথা বার করা যাবে না। তার দিদির থেকেও না।

'আমি তোমাদের দুজনকেই একটা প্রশ্ন করব।' কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আদিত্য বলল। 'গত রাত্তিরে তোমাদের দাদু ব্যাঙ্কোয়েট হল থেকে বেরিয়ে যাবার পর তোমরাও কি বেরিয়েছিলে?'

'আমি বেরিয়েছিলাম। রেস্টরুমে গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ বাদেই আবার ফিরে এসেছিলাম।' স্বাতী বলল।

'তুমি কি কাউকে রিসেপশানের দিকে কিংবা রিসর্টের পেছন দিকে যেতে দেখেছিলে?'

'না, আমি কাউকে দেখিনি।'

'তুমি?' আদিত্য শুভ্রর দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করল।

'আমিও রেস্টরুমে যাবার জন্য বেরিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পরে ফিরেও এসেছিলাম। বাইরে কারও সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। তবে আমি যখন রেস্টরুমের ভেতরে বেসিনে হাত ধুচ্ছিলাম তখন কাকাও আমার পাশে আর একটা বেসিনে হাত ধুচ্ছিল। তারপর আর কাকাকে দেখিনি।'

'ঠিক আছে। এবার তা হলে উঠে পড়া যাক। রিসর্টে ফিরে ডিনার খেতে হবে। আমার তো বেশ খিদে পেয়ে গেছে।' আদিত্য বেয়ারার দিকে তাকিয়ে বিল আনার ইশারা করল।

'কতদিন পুলিশ আমাদের আটকে রাখবে জানেন? আমাকে তো দিল্লি ফিরে গিয়ে অফিস জয়েন করতে হবে।' স্বাতীর গলাটা উদ্বিগ্ন শোনাল।

'ঠিক জানি না। তবে খুব বেশিদিন আটকে রেখে পুলিশের লাভ কী?' আদিত্যর যেটা মনে হয়, সেটাই সে বলল। তারপর শুভ্রকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমিও কি ব্যাঙ্গালোর ফিরে যাবে?'

'আমার ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স তো সবে এক বছর কমপ্লিট হয়েছে। এখনও তিন বছর বাকি। ব্যাঙ্গালোরের এই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটা খুব এক্সপেন্সিভ। বাবার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না। দাদু টাকা দিল তাই ভর্তি হতে পারলাম। জানি না এখন কে টাকা দেবে।'

'তোমার বাবাই দেবেন। তোমার বাবা কি চান না তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করো?' কেয়া জিজ্ঞেস করল।

'হয়ত চান। কিন্তু চাইলেও বাবার টাকা নেই।'

'কিন্তু এখন তো আর সে সমস্যা রইল না। তোমার দাদুর টাকা তো কিছুটা তোমার বাবার হাতে আসবে।' আদিত্য আশ্বাস দেবার মতো করে বলল।

'জানি না কত টাকা বাবার হাতে আসবে। বাজারে বাবার অনেক ধার। দাদুর টাকা বাবার হাতে এলেই পাওনাদারেরা ছেঁকে ধরবে। সমস্ত ধার মেটানোর পর কতটুকু আর থাকবে বাবার হাতে?' শুভ্র দত্তর গলায় অপরিসীম অবসাদ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

(১)

কাল রাত্তির থেকে রাখি চক্রবর্তী অনেকটা সুস্থ বোধ করছেন। তাই তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট সেরে প্রদীপ এবং রাখিকে সঙ্গে নিয়ে চিলকা হ্রদের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছে কেয়া। আইডিয়াটা অবশ্য প্রদীপ চক্রবর্তীর। চিলকাতে সিঁড়ি ভাঙতে হবে না, সেটা একটা মস্ত সুবিধে। রাখি চক্রবর্তী আর সিঁড়ি ভাঙতে পারবেন না। না হলে উদয়গিরি-খণ্ডগিরির দিকটাতেও যাওয়া যেত। আদিত্য খুব খুশি। সে নিজে আজ সারাদিন পুলিশের সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদে ব্যস্ত থাকবে। একা ঘরে বসে কেয়া বোর হবে কেন? আর একটা গাড়ি যখন মজুত রয়েছে প্রদীপ চক্রবর্তীদের আলাদা করে গাড়ি ভাড়াও করতে হবে না। সঙ্গী হিসেবে প্রদীপ এবং রাখি চমৎকার। কেয়ার ভাল সময় কাটবে। মনে হয়, সন্ধের আগেই ওরা ফিরে আসতে পারবে।

সকালবেলা কৃষ্ণ পধির সঙ্গে কথা হয়েছিল। উনি দশটার মধ্যে দলবল নিয়ে চলে আসবেন। ঠিক হল, অসীম দত্তর অফিসটাই ওদের ঘাঁটি হবে। ওখানে একজন একজন করে অসীম দত্তর আত্মীয়দের ডেকে নেওয়া যাবে।

দশটা বাজতে এখনও মিনিট পনেরো বাকি। আদিত্য রিসর্টের সামনে সমুদ্রের ধারে পাইচারি করতে করতে চিন্তা করছিল। অসীম দত্তর জীবনে কোনও একটা স্ক্যান্ডেল আছে। শুভ্র বলতে গিয়েও বলল না। তবে মনে হল স্ক্যান্ডেলটার কথা অনেকেই জানে। টেনে বার করতে অসুবিধে হবে না। সমুদ্রের ধারে খুব হাওয়া। আদিত্য একটা আস্ত দেশলাই বাক্সর প্রায় সব কটা কাঠি শেষ করে একটা সিগারেট ধরাল। হয়তো স্ক্যান্ডেলটার কথা জানা গেলে অসীম দত্তর খুনের ব্যাপারে একটা রাস্তা দেখা যেত। মোবাইলটা বাজছে। ইন্সপেক্টার অচিন্ত্য সাহা। সৈকত চৌধুরি, মণিময় গুপ্তদের আদিত্য যেন ভুলেই গিয়েছিল।

'পুকুর থেকে একটা বডি পাওয়া গেছে স্যার। মাছগুলো প্রায় সবটাই খেয়ে নিয়েছে। কিছুই আর অবশিষ্ট নেই।'

'ওটা মণিময়ের বডি বলে কেউ আইডেন্টিফাই করেনি?'

'বডি দেখে তো কিছু বোঝার উপায় নেই। জামাকাপড়ও সব জলে ভিজে ফাঁদরাফাঁই হয়ে গেছে। তবে হাতে একটা ঘড়ি ছিল আর আঙুলে একটা আংটি। সেই দু'টো জিনিস শিবপদ বলে লোকটা চিনতে পেরেছে। বলছে এগুলো মণিময় গুপ্তর।'

'ঘড়িটা কি চলছিল, না বন্ধ হয়ে গিয়েছিল?'

'আমি বুঝতে পারছি আপনি কী ভাবছেন। যদি ঘড়িটা মণিময় খুন হবার সময় বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সেটা থেকে খুনের দিন এবং সময়টা বোঝা যাবে। অবশ্য খুনের অনেক পরে জলে ভিজে ভিজেও ঘড়িটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ১১টা বেয়াল্লিশ মিনিটে। আপনার কি মনে হয় ওইটাই খুনের সময়?'

'জানি না। একটু ভেবে দেখতে হবে। ঘড়িটা কোন কম্পানির ছিল?'

'খুব দামি ঘড়ি। ওমেগা স্পিডমাস্টার।'

'তা হলে তো ঘড়িটাতে তারিখও থাকবে। ঘড়িটা বন্ধ হয়ে যাবার সময় তারিখ কী দেখাচ্ছে?'

'তারিখটাই সমস্যা হয়ে গেছে। ঘড়িটা এমনভাবে ভেঙে গেছে যে তারিখ কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

'হুঁ।' আদিত্য ভাবছিল জিজ্ঞেস করবে, জামাকাপড় ফাঁদরাফাঁই হয়ে যাওয়ার মানে কী? সেটা না জিজ্ঞেস করে সে বলল, 'ফরেন্সিক রিপোর্ট থেকে বডি আইডেন্টিফিকেশনের ব্যাপারে আর কোনও হেল্প পাওয়া যায়নি? দাঁতটা দেখেছেন?'

'দাঁতটাই আমরা দেখছি স্যার। যে ডেন্টিস্ট মণিময় গুপ্তকে দেখতেন তাঁকে খুঁজে বার করা গেছে। সেখানকার রেকর্ডে মণিময় গুপ্তর দাঁতের কিছু এক্সরে আছে। বডিটার দাঁতের সঙ্গে ওই এক্সরেগুলো মিলিয়ে দেখা হচ্ছে। আজ-কালের মধ্যেই রিপোর্ট পেয়ে যাব। তবে আমার স্থির বিশ্বাস লাশটা মণিময়েরই।'

'আমারও তাই বিশ্বাস। আচ্ছা, মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে কী জানা গেল?'

'ও হ্যাঁ, সেটাই তো বলা হয়নি। মৃত্যু হয়েছে পিস্তলের গুলিতে। মণিময় গুপ্ত যখন পুকুরের দিকে ফিরে মাছ ধরছিল তখন পেছন থেকে কেউ গুলি চালায়। গুলি পিঠের হাড় ভেঙে, হার্ট ফুঁড়ে, বুকের পাঁজরের হাড়ে আটকে গেছে। অল্প ক্যালিবারের পিস্তল,তাই গুলিটা শরীর ফুঁড়ে বাইরে চলে যেতে পারেনি। পুকুর থেকে আর একটা জিনিস পেয়েছি। মণিময় গুপ্তর মোবাইল।'

'সেটার থেকে কি কিছু উদ্ধার করা যাবে? কন্ট্যাক্টস? কলিং লিস্ট?'

'এখনও করা যায়নি। তবে আমরা চেষ্টা করছি স্যার।'

অচিন্ত্য সাহার ফোনটা নামিয়ে রেখে আদিত্য সুভদ্র মাজির নম্বরটা লাগালো। কিছুক্ষণ কথা বলল সেই নম্বরে। তারপর ফোন রেখে দেবার আগে বলল, 'আমাকে তাহলে এই নতুন তথ্যগুলো মেল করে দেবেন প্লিজ।'

মোবাইলটা নামিয়ে রাখতে না রাখতে দেখল রিসর্টের উর্দি পরা এক বেয়ারা তার দিকে এগিয়ে আসছে।

'ডিএসপি সাহেব এসে গেছেন।' সে জানাল। 'আপনাকে খুঁজছেন।'

'সাড়ে ন'টার একটু পরে অসীম দত্ত ব্যাঙ্কোয়েট হল থেকে বেরিয়ে নিজের অফিসে গিয়েছিলেন। পৌনে এগারোটা নাগাদ তাঁর সিকিউরিটি আবিষ্কার করল অফিসের দরজায় ধাক্কা দিলেও তিনি খুলছেন না। রাত্তির সাড়ে ন'টা থেকে পৌনে এগারোটা, এই সময়ের মধ্যে অসীম দত্ত খুন হন। আপনি এই সময় কোথায় ছিলেন?' প্রশ্নটা করে কৃষ্ণ পধি অনিকেত দত্তর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

'আ-আমি হলের মধ্যেই ছিলাম। আ-আমার স্ত্রী এবং বোনের সঙ্গে এক টেবিলে বসে ছিলাম। ডিনার করেছিলাম।'

'একবারও বেরোননি?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'আমি একবার বে-বেরিয়েছিলাম ডিনার শুরু হবার অনেক আগে। তখন গানও শুরু হয়নি। আমার মোবাইলটা ঘরে ফেলে এসেছিলাম। সেটা আনতে গিয়েছিলাম।'

'কতক্ষণ পরে ফিরেছিলেন?'

'ঠিক মনে নেই।'

'আমার মনে আছে। আপনি এক-দেড় ঘণ্টা বাদে ফিরেছিলেন। আমি আপনাকে লক্ষ করেছিলাম। মোবাইল আনতে এক-দেড় ঘণ্টা লেগে গেল?' আদিত্যর ধমকের স্বরে বলল।

'না, মানে, ক-করিডোরে জয়ন্তর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দু'-দুজনে কিছুক্ষণ বা-বারে বসেছিলাম।'

'এটা প্রথমে বলতে অসুবিধে কী ছিল?'

অনিকেত দত্ত চুপ করে রইল।

'পরে আর বেরোননি?'

'প-পরে? হ্যাঁ, খাবার পর একবার বোধহয় বেরিয়েছিলাম। বোধহয় মুখ ধুতে বাথরুমে গিয়েছিলাম।' অনিকেত দত্তর গলাটা অনিশ্চিত শোনাল।

'দ্বিতীয়বার বেরিয়ে কতক্ষণ বাইরে ছিলেন?'

'ঠিক মনে নেই। খুব বেশিক্ষণ হ-অবে না।'

'বাথরুম ছাড়া আর কোথাও গিয়েছিলেন?'

'না, আ-আর কোথায় যাব?'

'আপনার কোম্পানি, দত্ত কন্সট্রাকশান্স, কেমন চলছে?' আদিত্য প্রসঙ্গ বদলালো।

'ভালই চলছে। ভা-ভালই তো চলছে।'

'কোনও সমস্যাই নেই? সব ঠিকঠাক?' আদিত্য অনিকেত দত্তর চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল।

'না, মানে কিছু স-সমস্যা তো সব কোম্পানিতেই থাকে। আ-আমাদেরও আছে। বড়সড় কিছু নয়।' অনিকেত দত্ত চোখ নামিয়ে নিয়েছে।

'তবে যে শুনলাম আপনারা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে শোধ দিতে পারছেন না? শুনলাম, আপনাদের লোনটা এনপিএ হয়ে গেছে। সামনের মাসে ধারের কিস্তি শোধ দিতে না পারলে আপনাদের অ্যাসেটগুলো ব্যাঙ্ক অধিগ্রহণ করে নিলামে চড়াবে। এটা কি ঠিক শুনেছি?' একটু আগে সুভদ্র মাজিকে ফোন করে আদিত্য যেটা জানতে পেরেছে সেটাই সে অনিকেত দত্তকে দিয়ে যাচাই করে নিতে চাইছিল।

অনিকেত দত্তকে বেশ নার্ভাস দেখাচ্ছে। সে কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারল না। তারপর থেমে থেমে বলল, 'দেখুন পে-পেমেন্ট আটকে গেলে এরকম ক্রাইসিস কনস্ট্রাকশান ক- কোম্পানিদের মাঝে মাঝেই হয়। আ-আমাদেরও সেটাই হয়েছে। আমরা এটার থেকে বে-বেরিয়ে আসতে পারব।'

আদিত্য বলতেই পারত, কী করে পারবেন? আপনারা তো ব্ল্যাকলিস্টেড হয়ে গেছেন। তাই তো আপনাদের পেমেন্ট বন্ধ। কিন্তু তার মনে হল লোকটাকে আর রগড়ে লাভ নেই। সে একটু নরম গলায় বলল, 'কোম্পানি চালানোর ব্যাপারে আপনি কি আপনার বাবার কোনও সাহায্য পেতেন?'

'মাঝে মাঝে পে-পেতাম।' অনিকেত দত্ত উদাস গলায় বলল।

'কী ধরনের সাহায্য? আর্থিক নাকি অন্য কিছু?'

'এক সময় আ-আর্থিক সাহায্যও পেয়েছি। তবে ইদানীং বা-বাবার কাছে পরামর্শ চাইতেই বেশি যেতাম।'

'তার মানে, এই মুহূর্তে আপনার কোম্পানি যে ব্যাঙ্কের টাকা শোধ করতে পারছে না, সে ব্যাপারে আপনি আপনার বাবার কাছে কোনও অর্থসাহায্য চাননি?'

অনিকেত দত্ত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, 'চেয়েছিলাম, কিন্তু এ-এখনও পাইনি। জানি না, বাবা চলে যাবার আগে টাকাটা দেবার ব্যাপারে কোনও নি-নির্দেশ দিয়ে গেছিল কিনা।'

'ঠিক আছে। আমার আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই। ডিএসপি সাহেব কিছু জিজ্ঞেস করবেন?'

'আপনাকে একটা কথা বলি। আপনি নিশ্চয় এখান থেকে কলকাতায় ফিরে যাবেন। যাবার আগে আপনার ফোন নম্বর আর কলকাতার ঠিকানাটা দিয়ে যাবেন। আর আপনার বাবার মার্ডার মিস্ট্রিটা মীমাংসা না হওয়া অবধি কলকাতা ছেড়ে কোথাও যাবেন না। আমরা এই ব্যাপারে কলকাতা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখব। আপনি এবার আপনার স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিন।'

অনিকেত দত্ত ঘর থেকে বেরোনোর আগেই আদিত্যর ফোনটা বেজে উঠল। অচিন্ত্য সাহা আবার ফোন করছে। ঘরের বাইরে গিয়ে ফোনটা ধরল আদিত্য।

'সকালে একটা ছোট্ট জিনিস বলতে ভুলে গিয়েছিলাম স্যার। একটা উড়ো খবর বলতে পারেন। সত্যি না মিথ্যে জানি না। তাই হয়তো মাথা থেকে বেরিয়ে গেছিল। আপনার দু'মিনিট সময় হবে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ সময় হবে। বলুন কী উড়ো খবর। বলা যায় না, কাজেও লেগে যেতে পারে।' আদিত্য ঔৎসুক্য দেখিয়ে বলল।

'কিছুদিন আগে কলকাতার সিবিআই অফিস ডেপুটেশনে রাজ্য সরকার থেকে লোক চেয়েছিল। ইন্সপেক্টর এবং কন্সটেবল, দুটো পোস্টের জন্যেই। তো বিদ্যুৎ বলে আমার চেনা একটি ছেলে, আগে আমাদের এখানে কন্সটেবল ছিল, ডেপুটেশনে সিবিআই জয়েন করল। ওর সঙ্গে কিছুদিন আগে দেখা।'

'হুঁ, তারপর?'

'একথা-সেকথার পর বলল, স্যার আপনি শুনলাম সৈকত চৌধুরির কেসটা ইনভেস্টিগেট করছেন। আমি বললাম, করছি তো, তাতে কী হয়েছে। সুজয় একটু ইতস্তত করে বলল, সৈকত চৌধুরি বলে একজনের বিরুদ্ধে সিবিআই একটা ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন করছিল স্যার। এ-ব্যাপারে আপনি কি কিছু জানেন? এটা অবশ্য আমার জানার কথা নয়, আমি তো চুনোপুঁটি। তার ওপর নতুন এবং ডেপুটেশনে। সব থেকে বড় কথা, ইনভেস্টিগেশনটা মনে হয় খুব কনফিডেনশিয়ালি করা হচ্ছিল। সিবিআই-এর ভেতরেও খুব বেশি লোক এটার কথা জানে না দেখলাম। আমি নেহাত ঘটনাচক্রে ব্যাপারটা জেনে ফেলেছি।'

আদিত্যকে গল্পটা টানছিল। সে উত্তেজনায় সিগারেট ধরিয়ে ফেলেছে।

'আসলে আমার ওপর অফিসের গাড়িগুলো কোথায় কোথায় ডিউটিতে যাবে সেটা দেখাশোনা করার দায়িত্ব পড়েছিল। ডিউটি রোস্টারে দেখছিলাম প্রায় ছ'মাস ধরে কিছু অফিসার নিয়মিত সৈকত চৌধুরির সঙ্গে দেখা করতে সল্ট লেকে তার অফিসে গেছে। তাই ভাবলাম, আপনি তো একজন সৈকত চৌধুরির মার্ডার কেস ইনভেস্টিগেট করছেন। আপনি হয়তো ব্যাপারটা জানতে পারেন। মানে আমি ভাবছিলাম, সিবিআই যার বিরুদ্ধে ইনভেস্টিগেট করছিল আর যে সৈকত চৌধুরি খুন হয়েছে দু-জন কি একই লোক? আমি বললাম, আমি এ-ব্যাপারে কিছুই জানি না।'

'কিন্তু আপনাদের এই বিদ্যুতের এই ব্যাপারে এত উৎসাহ কেন?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'এই প্রশ্নটা আমার মনেও এসেছিল। আমি ওকে জিজ্ঞেসও করলাম। ও বলল, নিছক কৌতূহল। আর কিছু নয়। আমার বিশ্বাস ও পুরোটা বলছে না। এর মধ্যে বোধহয় আরও কিছু আছে। কিন্তু আর কোনও কথা ওর কাছ থেকে বার করতে পারলাম না।'

আদিত্য দেখল করিডর দিয়ে ছন্দা দত্ত তার স্বামী অনিকেত দত্তকে নিয়ে এদিকে আসছে। নিশ্চয় তার স্বামী তাকে এই আপিস অবধি এগিয়ে দিতে এসেছে, যে আপিসে বসে আদিত্যরা জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

আদিত্য ফোনে বলল, 'এখন আমাকে একটু রাখতে হচ্ছে। একটা ইন্টারোগেশনের মধ্যে আছি। আমি যদি কিছু জানতে পারি আপনাকে জানাব। পরশুদিন কলকাতা ফিরে যাচ্ছি। তারপর নিশ্চয় দেখা হবে।'

আদিত্য মোবাইলটা পকেটে রেখে দিল। সিগারেটে দু'টো সুখটান দেবার পর আগুনটা নিভিয়ে সিগারেটের অবশিষ্টাংশ রিসেপশানের পাশে রাখা একটা পেল্লায় গারবেজ ক্যানের মধ্যে ফেলে দিয়ে ছন্দা দত্ত, অনিকেত দত্তর আগমন পথের দিকে তাকিয়ে রইল। রিসেপশনে হোটেল স্টাফ কিংবা গেস্ট কেউ নেই। থাকলে নিশ্চয় এখানে সিগারেট খাওয়া নিয়ে খ্যাচ খ্যাচ করত।

আদিত্যর কাছে এসে অনিকেত দত্ত বলল, 'আ-আমার স্ত্রীর জিজ্ঞাসাবাদের সময় আ-আমি কি আমার স্ত্রীর সঙ্গে থাকতে পারি? আসলে উনি তো খুব বে-বেশি বাইরে বে-বেরোন না, হয়ত সব কথা গুছিয়ে বলতে পারবেন না।'

'আমার মনে হয় না আপনার স্ত্রীর ইন্টারোগেশনের সময় আপনার থাকাটা ডিএসপি সাহেব অ্যালাউ করবেন। তবে আপনি জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।' আদিত্য কেজো গলায় বলল।

রিসেপশানের সামনে কয়েকটা আরাম কেদারা রয়েছে, একটা টিভিও চলছে। আদিত্য ভাবল এখানে বসে অনিকেত দত্ত দিব্যি সময় কাটিয়ে দিতে পারবে, যদি সে তার স্ত্রীকে ফেরার পথেও এসকর্ট করে নিয়ে যেতে চায়। রিসেপশনের মেয়েটা তার জায়গায় ফিরে এসেছে।

আদিত্যর অনুমানই ঠিক। ডিএসপি কৃষ্ণ পধি অনিকেত দত্তকে বাইরে রিসেপশনের সামনে অপেক্ষা করতে বললেন।

ছন্দা দত্ত চেয়ারে জবুথবু হয়ে বসে আছে। তার শরীরের ভাষা থেকে এটা পরিষ্কার যে একসঙ্গে এতগুলো পুরুষ মানুষের সামনে বসে থাকতে হচ্ছে বলে সে নিজেকে বেআব্রু মনে করছে। বিশেষ করে তার স্বামীকে যখন তার সঙ্গে থাকতে দেওয়া হয়নি। আদিত্যর মনে হল ডিএসপি সাহেব তার টিমে দু-একজন মেয়ে পুলিশ রাখলে ভাল করতেন। বলা যায় না, যা দিনকাল!

ছন্দা দত্তকে যে কোনও মাপকাঠিতেই সুন্দরী বলতে হবে। তবে এখন শরীরে কিছু মেদ জমেছে। শুভ্র দত্ত তার অস্বাভাবিক ফরসা রংটা মনে হয় তার মায়ের কাছ থেকেই পেয়েছে।

'আপনাকে খুব অল্প কিছু প্রশ্ন করব।' ডিএসপি শুরু করলেন। 'শনিবার রাত সাড়ে ন'টা থেকে পৌনে এগারোটার মধ্যে আপনি কি একবারও ব্যাঙ্কোয়েট হল থেকে বেরিয়ে ছিলেন?'

প্রশ্নটা শুনে ছন্দা দত্ত থতমত খেয়ে গেছে।

'আমার ঠিক মনে পড়ছে না বেরিয়েছিলাম কিনা। বোধহয় খাবার পরে একবার হাত-মুখ ধুতে বেরিয়েছিলাম।'

'তখন কি আপনি আর কাউকে বাইরে দেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ। বাইরে তখন অনেকেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কেউ কেউ সমুদ্রের দিক থেকে ফিরছিল।'

'আমি বলতে চাইছি, আপনাদের পরিবারের কাউকে কি বাইরে দেখেছিলেন?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'আমাদের পরিবারের?' ছন্দা দত্তর গলাটা খুব অনিশ্চিত শোনাল। 'মনে হচ্ছে ঠাকুরপোকে যেন রিসর্ট থেকে সমুদ্রের দিকে যেতে দেখেছিলাম। তবে আমার ভুলও হতে পারে।'

'তার মানে আপনি যাকে দেখেছিলেন তার সঙ্গে আপনার কোনও কথা হয়নি, তাই তো?' আদিত্য নিশ্চিত হবার জন্য আবার জিজ্ঞেস করল।

'না। আমি তো ঠাকুরপোকে দূর থেকে দেখেছিলাম। ওটা ঠাকুরপো ছিল কিনা সেটাও জোর দিয়ে বলতে পারব না।'

'আর কাউকে আপনি দেখেননি?'

'আপনি বলতে এখন মনে পড়ছে, আমি যখন আবার ব্যাঙ্কোয়েট হলে ঢুকছি তখন দেখলাম দীপশিখা হল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে ও হাসল। আমিও হাসলাম।'

'আচ্ছা, আপনার সঙ্গে আপনার শ্বশুরমশায়ের সম্পর্ক কেমন ছিল?'

'খুব ভাল ছিল। আমি ওঁকে নিজের বাবার মতোই শ্রদ্ধা করতাম, উনিও আমাকে মেয়ের মতো দেখতেন। আমার তো ছোটবেলায় বাবা মারা গিয়েছিলেন। তাই উনিই ছিলেন আমার বাবা।' বলতে বলতে ছন্দা দত্তর গলাটা ধরে এল।

একটু সামলে নিয়ে ছন্দা দত্ত বলল, 'বাবা ওঁর নিজের মেয়ের থেকে আমার সঙ্গে সময় কাটাতে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন।' ছন্দা দত্ত একটু একটু করে সহজ হচ্ছে।

'সেটা কেন?'

'দেখুন খুকু, মানে শ্বেতা, আমার শ্বশুরমশাইকে টাকার জন্যে মাঝে মাঝেই জ্বালাতন করত। বারবার ওদের ব্যবসায় টাকার টান পড়ত। আর টাকার দরকার হলে বাবা ছাড়া আর কে আছে? বাবা দু'একবার টাকা দিয়েও ছিলেন। তারপর বুঝলেন ওদের টাকা দিয়ে কোনও লাভ নেই।'

'লাভ নেই কেন?'

'আসলে খুকু মেয়েটা ভিতরে ভিতরে ভীষণ নরম, ওকে ওপর থেকে যাই মনে হোক না কেন। বিশেষ করে স্বামীর কোনও কথা ও ফেলতে পারে না। আর যত গণ্ডগোল সব ওই জয়ন্তদাকে নিয়ে। এমনিতে

জয়ন্তদা মানুষটা খারাপ নয়, কিন্তু ওই আর্মিতে যা হয়, ভীষণ ড্রিঙ্ক করে আর প্রবল জুয়ার নেশা। টাকা তো ওদের কম ছিল না। জয়ন্তদাই সব উড়িয়ে দিল। খুকু ওকে এত ভালবাসে যে ওর কোনও দোষ দেখতে পারে না। জয়ন্তদাকে না সামলাতে পারলে ব্যবসা চলবে কী করে?'

'কিন্তু আমরা তো শুনেছি আপনার স্বামীর ব্যবসাও ভাল চলে না। আপনার শ্বশুরমশায়ের কাছে মাঝে মাঝে আপনাদেরও টাকা চাইতে হয়।' আদিত্য বুলেটের মতো প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ হয়।' একটু চুপ করে থেকে ছন্দা দত্ত বলল। 'কিন্তু জয়ন্তদার সঙ্গে আমার স্বামীর একটা বড় তফাৎ আছে। জয়ন্তদা বেপরোয়া, দায়িত্বজ্ঞানহীন। কারোর কথা ভাবে না। নিজের স্ত্রীর কথাও নয়। আমার স্বামী কিন্তু একেবারে উল্টো। নিজের পরিবারই আমার স্বামীর কাছে সব। আসলে স্বীকার করতেই হবে, অনেক চেষ্টা করেও ব্যবসা ব্যাপারটা আমার স্বামীর মাথায় ঢুকল না। ওর যদি একটা সাধারণ চাকরি থাকত তাহলে আমরা অনেক বেশি সুখে থাকতাম। কী করব বলুন, আমার অদৃষ্ট।'

'কিন্তু আপনার স্বামী তো অসীম দত্তর ফার্মে চাকরি করতেন। সেখানে পোষালো না কেন?'

'উনি যেটা করতেন তাকে চাকরি করা বলে না। ব্যবসাই বলতে হয়। বাবা ওকে নিজের ব্যবসায় বসিয়ে কাজকর্ম শেখাচ্ছিলেন যাতে বাবার অবর্তমানে আমার স্বামী ব্যবসাটা সামলাতে পারে। ঠাকুরপোর সঙ্গে বাবার সম্পর্ক কোনও দিনই ভাল ছিল না। তাই ঠাকুরপোকে ব্যবসায় বসানোর প্রশ্নই ওঠেনি। তার মানে আমার স্বামীকে বাবার ব্যবসাটাই দেখতে হচ্ছিল। সেই কাজটা উনি ভালভাবে করতে পারেননি। তাই বাবা বিরক্ত হয়ে ওকে অন্য কোম্পানি খুলতে বলেন। শুরুর টাকাটা অবশ্য বাবাই দিয়েছিলেন।'

ছন্দা দত্ত ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর আদিত্য ভাবছিল মহিলাকে ওপর ওপর দেখে যতটা বোকাসোকা মনে হয়, উনি আদৌ কি তাই?

(২)

ডিএসপি কৃষ্ণ পধি এবং ইন্সপেক্টার প্রশান্ত পণ্ডার সঙ্গেই লাঞ্চ খেয়ে নিল আদিত্য। রিসর্টেই পুলিশদের খাবার ব্যবস্থা হয়েছে। তবে দুজন কন্সটেবল পরে বসবে। ওপরওলাদের সঙ্গে একাসনে বসে লাঞ্চ খাবার অধিকার তাদের নেই। ডিএসপি সাহেব ভোজনরসিক। তবে মানের থেকে পরিমাণের দিকে তাঁর নজর বেশি। তিনি যতটা মাংস খেলেন, আদিত্য ভেবে দেখল, তিন-চারদিনের লাঞ্চেও সে অতটা খেয়ে উঠতে পারত না। ডিএসপি সাহেবের নাদুসনুদুস চেহারার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। কৃষ্ণ পধি বোধহয় খেয়াল করেছেন আদিত্য তাঁর প্লেটের দিকে টেরিয়ে দেখছে।

'আসলে কী জানেন, বাড়িতে তো মাটন খেতে দেয় না, তাই বাইরে সুযোগ পেলে একটু বেশি খাওয়া হয়ে যায়। আবার হয়তো এক বছর মাটন জুটবে না।' ডিএসপি সাহেব কৈফিয়ত দেবার মতো করে বললেন।

মাটন না হয় জুটবে না। কিন্তু চারটে ফিসফ্রাই এবং একটি আস্ত তন্দুরি চিকেন খাবার কী অজুহাত, আদিত্য আর জিজ্ঞেস করল না।

ইন্সপেক্টার প্রশান্ত পণ্ডা ঠিক উল্টো, যেমন স্বল্পবাক তেমনই স্বল্পাহারী। আদিত্য তাকে দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে ডাল-তরকারি সহ দু'টো হাতরুটি এবং একটি ফিসফ্রাই দিয়ে মধ্যাহ্নভোজন সেরে নিল। এটাও অবশ্য ঠিক যে ব্রেকফাস্টে একটু বেশি খাওয়া হয়ে গিয়েছিল বলে তার খিদেও তেমন ছিল না।

খাওয়া শেষ করে কেয়াকে ফোন করল আদিত্য। কেয়ারা চিলকার ধারে বসে স্যান্ডউইচ-ফিসফ্রাই-আলুভাজা দিয়ে লাঞ্চ খাচ্ছে। রিসর্ট থেকেই প্যাক করে দিয়েছে। মন্দ কী!

কেয়া বলল, 'খুব এনজয় করছি গো। একটু আগে নৌকো করে চিলকায় বেড়িয়েছি। অসাধারণ।'

'কী রকম নৌকো? হাতে টানা?'

'না, না, হাতে টানা নৌকোর মতো দেখতে। কিন্তু মোটর লাগানো আছে। বেশ জোরে যায়। শুধু হালটা মনে হল একজন হাতে করে কন্ট্রোল করছে।'

'খুব সাবধানে থেকো। তুমি তো সাঁতারও জান না।'

'আর সাবধান হয়ে কী করব? বোট রাইড নেওয়া তো হয়েই গেছে।' কেয়া খিলখিল করে হাসল। 'তবে জান তো? প্রদীপদাদের একটা ব্যাগ চিলকায় পড়ে গেছে। একেবারে মাঝ দরিয়ায়। উদ্ধারের কোনও চান্সই নেই।'

'কী করে পড়ল?'

'জানি না। মনে হয় ধারে রেখেছিল। নৌকোর ঝাঁকানিতে পড়ে গেছে।'

'নৌকো ঝাঁকানি দেয় নাকি?'

'এমনিতে ঝাঁকানি-টাকানি কিছু নেই। খুব স্মুথ। কিন্তু টার্ন নেবার সময় একটু ঝাঁকানি হয়। ভাগ্য ভাল একটা ব্যাগ পড়েছে, কোনও মানুষ পড়েনি।'

'আমার শুনেই ভয় করছে। সাঁতার জানো না নৌকো চড়তে গেছ! কী ছিল ব্যাগে?'

'প্রদীপদা বলল দু'টো গায়ের চাদর ছিল, একটা প্রদীপদার, একটা রাখিদির। চিলকায় জলের ধারে এসে যদি ঠান্ডা লাগে তাই এনেছিল। এখানে ঠান্ডা অবশ্য একেবারেই নেই। আর খুব মোটা একটা বই ছিল। কে একজন নকশালদের ইতিহাস নিয়ে থান ইটের মতো একটা বই লিখেছে। প্রদীপদা সেটা গাড়িতে পড়তে পড়তে আসছিল। তারপর বইটা ব্যাগে রেখে দিয়েছিল। সেটাও গেছে। এটা গেলো বলেই প্রদীপদার দুঃখ, চাদরগুলো নিয়ে দুঃখ নেই।'

'যাক, ছাড় ওসব। ফিরছ কখন?'

'ফিরতে সন্ধে হয়ে যাবে। রম্ভায় উড়িষ্যা সরকার যে পান্থনিবাস করেছে সেখানে বিকেলের চা খেয়ে রওনা দেব। রাখছি।'

কনস্টেবল দুজন ডাইনিং হলের দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল। আইসক্রিমের বাটিতে চামচ ডোবাতে ডোবাতে ডিএসপি সাহেব তাদের কাছে ডাকলেন।

'অনির্বাণ দত্তকে বলো পনেরো মিনিট পরে অফিসে চলে আসতে। ওকে এবার ইন্টারোগেট করা হবে।' ডিএসপি সাহেব ওড়িয়া ভাষায় এই ধরনের একটা কিছু নির্দেশ দিলেন। তারপর আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অনির্বাণ দত্তকে ডেকে পাঠালাম। পনেরো মিনিট পরে আসছে।'

না বললেও চলত। 'অনির্বাণ দত্ত' এবং 'ইন্টারোগেট' শব্দ দু'টো আদিত্য ধরতে পেরেছিল। বাকিটা তার থেকে আন্দাজ করা শক্ত নয়। আদিত্যর খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সে ডিএসপি কৃষ্ণ পধির অনুমতি নিয়ে সিগারেট খেতে বাইরে বেরোল।

আকাশে মেঘ আছে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া। তবে সমুদ্র এখনও ততটা উত্তাল হয়ে ওঠেনি। আদিত্য সিগারেট ধরিয়ে সমুদ্রের দিকে গিয়েছিল। সমুদ্রের ধারে অত হাওয়ার মধ্যে সিগারেট খেয়ে সুখ হয় না। তাই আবার রিসর্টের দিকে ফিরে এল আদিত্য। রিসর্টের বাগানে দাঁড়িয়ে সিগারেটে টান দিতে দিতে সে রিসর্টের ওপর অলস দৃষ্টি রাখছিল। সেই দুজন কনস্টেবলের একজন লম্বা করিডোর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কোণের দিকের একটা ঘরে গিয়ে কলিং বেল বাজাচ্ছে। অন্যজন তার সঙ্গে খানিকটা এসে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্চয় ওটা অনির্বাণ দত্তর ঘর। কনস্টেবলরা ওকে ডাকতে এসেছে। কিন্তু কেউ দরজা খুলছে না কেন? খানিকক্ষণ পরে লোকটা আবার বেল বাজাল। এবারেও কোনও উত্তর নেই। আদিত্য বিপদের গন্ধ পাচ্ছে।

প্রথম কনস্টেবলটি এখন দ্বিতীয় জনকে ডাকছে। এবার আর কলিং বেল নয়, দুজনে মিলে দরজা ধাক্কা দিচ্ছে। বেশ জোরে ধাক্কা দিচ্ছে। আদিত্য এত দূর থেকে দরজা ধাক্কা দেবার শব্দ শুনতে পাচ্ছে। তবু কোনও সাড়া নেই। অনির্বাণ দত্ত ঘরে নেই নাকি? খেতে গেছে? খেতে গেলে তো ডাইনিং হলে তাকে দেখাই যেত।

আদিত্য আধখাওয়া সিগারেটটা ঘাসে ফেলে পায়ে চেপে দ্রুত গতিতে রিসেপশনের সামনে পৌঁছে গেল। সেখানে কনস্টেবল দুজন ডিএসপি সাহেবকে সমস্যাটা বলছে।

ডিএসপি কৃষ্ণ পধি আদিত্যকে দেখে সংক্ষেপে বললেন, 'অনির্বাণ দত্ত দরজা খুলছে না, ঘরে আছে কিনা সেটাই বোঝা যাচ্ছে না।'

'রিসেপশন থেকে ওর ঘরে একটা ফোন করুন না।' আদিত্যর গলায় উৎকণ্ঠা।

'সেটাই করব ভাবছিলাম।'

ঘরে ফোন করে কিন্তু কোনও উত্তর পাওয়া গেল না। অনেকক্ষণ ধরে ফোনটা বেজে গেল। রিসেপশানের কম্পিউটার থেকে অনির্বাণ দত্তর মোবাইল নম্বরটাও পাওয়া গেছে। কিন্তু কোনও সাড়া শব্দই করছে না ফোনটা। মনে হচ্ছে সুইচড অফ।

ডাইনিং হলে জিজ্ঞেস করে এটাও জানা গেল যে আজ অনির্বাণ দত্ত ব্রেকফাস্ট খেতে ডাইনিং হলে আসেননি, রুম সার্ভিসেও ব্রেকফাস্ট অর্ডার দেননি। আর প্রথম দিন এসেই তিনি বেড টি দিতে বারণ করে দিয়েছেন কারণ খুব সকালে তিনি ঘুম থেকে উঠতে পারেন না। কাল রাত্তিরে ডিনার খাবার সময় অনির্বাণ দত্তকে শেষ দেখা গেছে, তারপর আর তাকে কেউ দেখেনি। আদিত্যরও মনে পড়ল, সে আর কেয়া কাল রাত্তিরে যখন ডিনার খাচ্ছিল, তখন অনির্বাণও একা একটা টেবিলে বসে ডিনার খাচ্ছিল।

ডিএসপি সাহেব বললেন, 'আর কোনও উপায় দেখছি না। এবার ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে অনির্বাণ দত্তর ঘরটা খুলতে হবে। লোকটা যদি ভেতরে লুকিয়ে বসে না থাকে, ধরে নিতে হবে সে জেরার ভয়ে পালিয়ে গেছে। ওর নামে ট্রেন স্টেশন, এয়ারপোর্ট, ট্যাক্সিস্ট্যান্ড সব জায়গায় পাহারা বসাতে হবে। কাজ বেড়ে গেল।'

আদিত্য কিছু বলল না। কিন্তু মনে মনে সে আরও বড় কোনও ঘটনার জন্যে তৈরি হচ্ছে।

পুলিশের দলটা ম্যানেজার রঘুনন্দন পানিগ্রাহীকে সঙ্গে নিয়ে অনির্বাণ দত্তের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। রঘুনন্দনের হাতে দরজা খোলার স্মার্টকার্ড।

দরজা খুলে দেখা গেল ঘর ফাঁকা। বিছানা পরিপাটি করে পাতা। কাল রাত্তিরে হাউসকিপিং-এর লোক এসে বিছানা করে দেবার পরে মনে হয় না অনির্বাণ এই বিছানায় শুয়েছিল। করিডোরের দিকে কোনও জানলা নেই, শুধু একটা দরজা, যে দরজাটা খুলে ওরা ঘরে ঢুকল। উল্টোদিকে, অর্থাৎ সমুদ্রের দিকে আর একটা দরজা এবং একটা জানলা। জানলায় ভেনেশিয়ান ব্লাইন্ড ফেলা বলে বাইরে থেকে ঘরের ভেতরটা দেখা যায় না। কিন্তু ব্লাইন্ডের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে ঘরটাকে কিছুটা আলোকিত করে রেখেছে। হয়ত সেই কারণেই আদিত্য প্রথমে খেয়াল করেনি ঘরে আলো জ্বলছে। ব্যাপারটা খেয়াল করার পর সে দেখল অনির্বাণ দত্তর স্মার্টকার্ডটা সকেটে লাগানো আছে। ওটা সকেট থেকে বার করে নিলে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ঘরের আলো নিভে যেত। আদিত্য সেদিকে ডিএসপি সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

ইন্সপেক্টার পণ্ডা ডিএসপি কৃষ্ণ পধিকে ওড়িয়া ভাষায় কিছু একটা বলল। আদিত্য ধরতে পারল না কী বলছে। সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

ডিএসপি আদিত্যর দিকে ফিরে বলল, 'পণ্ডা বলছে, ঘরে আলো জ্বললেও এসি কিংবা পাখা কিছুই চলছিল না। কাল রাত্তিরে কিন্তু বেশ গরম ছিল। এসি চালানোর মতো গরম।'

আদিত্য বলল, 'হুঁ।' ওইটুকু বলেই সে চিন্তায় ডুবে গেছে।

'এমন হতে পারে অনির্বাণ দত্ত পালিয়ে যাবার আগে ইচ্ছে করে ঘরে আলোটা জ্বেলে রেখে গিয়েছিল যাতে লোকে মনে করে সে ঘরেই আছে। কিন্তু অভাসবশত এসিটা নিবিয়ে দিয়েছিল।' ডিএসপি সাহেব চিন্তিত গলায় বললেন।

'হতেই পারে, হতেই পারে। বিশেষ করে রিসর্টের আংশিক মালিকানা এখন তো তার। মিছিমিছি ইলেকট্রিক বিল উঠলে তারও ক্ষতি। হয়তো সেইজন্যে সে এসিটা নিবিয়ে গিয়েছিল। তবে একটা জিনিস দেখুন, অনির্বাণ দত্তর স্যুটকেসটা কিন্তু ঘরেই রয়েছে। এবং এই দেখুন স্যুটকেসে তার অধিকাংশ জামাকাপড়ও রয়েছে। মনে হচ্ছে, লোকটা একবস্ত্রে বেরিয়ে গিয়েছিল। কেন? কী এমন তাড়া ছিল তার?' আদিত্য প্রায় নিজের মনেই বিড়বিড় করছে।

আদিত্য খেয়াল করল অনির্বাণ দত্তর মোবাইল এবং পার্স ঘরে নেই।

'আমি হেড কোয়ার্টারে অনির্বাণ দত্তর মোবাইল নম্বরটা জানিয়ে দিচ্ছি। ওদের বলছি, যদি মোবাইলটা চালু হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ওটাকে ট্রেস করে ওটার লোকেশানটা জানিয়ে দিতে। আর অনির্বাণ দত্তর কোনও ছবি কি পাওয়া যাবে? তা হলে ছবিটা আমার অফিসারদের হোয়াটসঅ্যাপ করে দিতাম। লোকটাকে খুঁজতে সুবিধে হত।'

'ছবি নিশ্চয় পাওয়া যাবে। শনিবার রাত্তিরে তো প্রফেশানাল ফটোগ্রাফার এসে অনেকগুলো ছবি তুলেছিল। নিশ্চয় অনির্বাণের ছবিও তুলেছিল। আপনি ম্যানেজার রঘুনন্দনকে জিজ্ঞেস করলে ও বলতে পারবে। ও-ই তো পুরো ইভেন্টটা ম্যানেজ করছিল।'

আদিত্য সমুদ্রের দিকের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে সিগারেট ধরাল। ঘরের মধ্যে তার যা দেখার দেখা হয়ে গেছে।

অনির্বাণ দত্তকে খোঁজার জন্য নির্দেশ দিতে ডিএসপি সাহেবের বেশ খানিকটা সময় লেগে গেল। ইতিমধ্যে কী করে যেন রটে গেছে অনির্বাণকে পাওয়া যাচ্ছে না। অসীম দত্তর পরিবারের কয়েকজন এসে পুলিশের কাছে খোঁজ খবর করছিল। তাতেও কিছু সময় নষ্ট হয়েছে। ফলে পরবর্তী ইন্টারোগেশন যখন শুরু হল তখন প্রায় চারটে বাজে। অনির্বাণ দত্তর স্ত্রী দীপশিখাকে ডাকা হয়েছে।

'আপনি নিশ্চয় শুনেছেন আপনার স্বামীকে পাওয়া যাচ্ছে না। কাউকে কিছু না বলে উনি কোথাও একটা চলে গেছেন। এ-ব্যাপারে আপনি কি কিছু জানেন?' ডিএসপি কৃষ্ণ পধি শুরু করলেন।

'আমি কী করে জানব? আমার সঙ্গে আমার স্বামীর কোনও সম্পর্ক নেই। সকলেই এটা জানে। উনি কোথায় যাচ্ছেন না যাচ্ছেন আমি জানব কী করে?' দীপশিখার মুখটা কঠিন দেখাল।

'বুঝতে পারছি। আচ্ছা, অনির্বাণবাবুর সঙ্গে শেষ কবে আপনার কথা হয়েছে?'

দীপশিখা চুপ করে আছে। কিছু একটা বলতে গিয়ে ইতস্তত করছে। আদিত্য তাকে সময় দিতে চায়। ডিএসপি সাহেব অধৈর্য হয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, আদিত্য তাঁকে হাত তুলে নিরস্ত করল। তার মনে হচ্ছে যা বলার দীপশিখা নিজের থেকেই বলবে।

একটু পরে দীপশিখা বলল, 'আপনাদের কাছে সত্যিটা লুকিয়ে লাভ নেই। আপনারা পরে হয়ত নিজেরাই বার করে ফেলবেন। তাছাড়া সত্যিটা বললে কোনও ক্ষতিও নেই। সত্যিটা হল, যে রাত্তিরে আমার শ্বশুরমশাই খুন হন, সেই রাত্তিরেই আমার সঙ্গে অনির্বাণের কথা হয়েছিল।'

'ঠিক কখন কথা হয়েছিল? কী নিয়ে কথা হয়েছিল? একটু খুলে বলবেন?' আদিত্য ঈষৎ উত্তেজিত গলায় বলল।

'হ্যাঁ, বলছি।' দীপশিখা চুপ করে থেকে আবার শুরু করল।

'আপনারা নিশ্চয় জানেন আমার স্বামীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভাল নয়। আমি দু'বছর অনির্বাণের সঙ্গে থাকার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পারলাম না। কলকাতায় ফিরে এলাম। ব্যাপারটা এখন ডিভোর্সের দিকে এগোচ্ছে। অনির্বাণ ভয় দেখাচ্ছে আমার নামে অ্যাডালট্রির চার্জ আনবে। সেই চার্জ প্রমাণিত হলে অনির্বাণকে অ্যালিমনি দিতে হবে না। অনির্বাণের যা টাকা আছে তাতে ও বেস্ট লইয়ারদের নিয়োগ করে কেস জিতে যেতে পারবে। আমার তো কোনও টাকা-পয়সাই নেই। আমি অনির্বাণের সঙ্গে লড়ব কী করে?'

'আপনার বাপের বাড়ি থেকে সাহায্য পাবেন না?' ডিএসপি জিজ্ঞেস করলেন।

'না। তার কোনও আশা নেই। আমার বাবা দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী। মা কিছু করে না। আমার আর কোনও ভাই-বোন নেই। আমাকেই ওদের হেল্প করতে হয়।'

'আপনার শ্বশুরমশাই এই ব্যাপারটা জানতেন না?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'জানতেন। আমিই বাধ্য হয়ে জানিয়েছিলাম। আমাকে উনি ছোট থেকেই খুব স্নেহ করেন। আমার বাবা আর শ্বশুরমশাই ইস্কুলের বন্ধু। তাই আমার শ্বশুরমশাই আমাকে ছোট থেকে দেখছেন। আমাদের বিয়েটা দুই বাবা মিলে ঠিক করেছিলেন।'

দীপশিখা আবার থামল। আদিত্য বুঝতে পারছে না পুরোনো স্মৃতি তাকে আরাম দিচ্ছে নাকি যন্ত্রণা।

'যাক, যেটা বলছিলাম,' দীপশিখা অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে এসেছে, 'আমার শ্বশুরমশাই যখন শুনলেন অনির্বাণ আমার বিরুদ্ধে অ্যাডালট্রির অভিযোগ আনতে চলেছে উনি ভীষণ রেগে গেলেন। উনি আমাকে বললেন উনি আমার সঙ্গে আছেন। মামলার সমস্ত খরচ উনি দেবেন। কথাটা উনি অনির্বাণকেও জানিয়ে দিলেন। অনির্বাণ একটু ঘাবড়ে গেল। বুঝল, যত সহজে সে কেসটা জিতে যাবে ভেবেছিল ব্যাপারটা তত সহজ হবে না।'

'অনির্বাণ দত্তর বিরুদ্ধে আপনার কী চার্জ?' ডিএসপির জিজ্ঞাসা।

'ক্রুএলটির চার্জ। দিনের পর দিন অনির্বাণ আমাকে ভার্বালি অ্যাবিউস করেছে। আমাকে যে ভাবে ট্রিট করেছে লোকে রাস্তার কুকুরকেও তার থেকে ভাল ভাবে ট্রিট করে। আর সবার ওপরে ফিসিকাল অ্যাবিউস তো আছেই। একবার তো মেরে মাথাটাই ফাটিয়ে দিল। আর একবার হাতটা এত জোরে মুচড়ে দিল যে হাড়ে স্প্রেন হয়ে গেল। আমার কাছে সমস্ত মেডিকাল রিপোর্ট আছে। ভাল লইয়ার পেলে আমার কেসটা দাঁড় করাতে অসুবিধে হবে না।'

'হুঁ। তারপর?' আদিত্য নিবিষ্ট হয়ে শুনছে।

'আমার শ্বশুরমশাই তাঁর ফাইন্যান্সিয়াল রিসোর্স নিয়ে আমার পাশে দাঁড়ানোর পর অনির্বাণ একটু পিছিয়ে গেল। শ্বশুরমশাই অনির্বাণকে বললেন আমার সঙ্গে বসে কথা বলে সে যেন মিউচুয়াল ডিভোর্সে রাজি হয়ে যায়। একটা অ্যালিমনি অনির্বাণকে দিতেই হবে। ঠিক হল, টাকার অঙ্কটা কী হবে সেটা নিয়ে আগে অনির্বাণ আর আমি কথা বলব। তারপর দুজনে একসঙ্গে শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে বসব। সেই অনুযায়ী, শনিবার রাত্তিরে ডিনারের পর আমি প্রাথমিক কিছু কথাবার্তা বলতে অনির্বাণের সঙ্গে দেখা করেছিলাম।'

'কোথায় দেখা করেছিলেন?'

'আমাদের ঘরগুলোর পেছন দিক দিয়ে যে সরু করিডোরটা গেছে তার একেবারে পশ্চিমপ্রান্তে দেখবেন একটা ঘর আছে। ঘরটা খুব ছোট নয়। ঘরটাতে অনায়াসে দশ-পনের জনের জন্মদিন বা বিবাহবার্ষিকীর পার্টি হতে পারে। মনে হয় ওই উদ্দেশ্যেই ভাড়া দেওয়া হবে বলে ঘরটা তৈরি হয়েছে। এখন তো ঘরটা ফাঁকা পড়ে রয়েছে। ওখানেই অনির্বাণের সঙ্গে দেখা করেছিলাম।'

'কতক্ষণ কথা বলেছিলেন আপনারা?'

'ঠিক মনে নেই, তবে মিনিট দশেকের বেশি হবে না। আমি মনে মনে ভেবে নিয়ে গিয়েছিলাম একটা সমঝোতা করব। কিন্তু গিয়ে দেখলাম সেটা অসম্ভব। অনির্বাণ একটুও বদলায়নি। সেই ঔদ্ধত্য, সেই অন্যকে হেয় করে মজা পাওয়ার চেষ্টা। আসলে ও মানসিকভাবে অসুস্থ। কোনও ভাল সাইকিয়াট্রিস্ট-এর কাছে গিয়ে অসুখটা না সারালে ও বদলাবে না। এত অপমানিত লাগছিল। মিউচুয়াল ডিভোর্স-এর প্রসঙ্গ না তুলেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।'

'আপনি যে ঘরটার কথা বলছেন সেটা আমি দেখেছি। ওখান থেকে অসীম দত্তর অফিস ঘরটার পেছন দিকটা দেখা যায়। আপনি কি খেয়াল করেছিলেন পেছন দিকের জানলা দিয়ে আলো আসছে কিনা?'

'তখন খুব সচেতনভাবে খেয়াল করিনি। কিন্তু আপনি বলার পর মনে হচ্ছে অফিসের জানলা দিয়ে একটা আলো করিডোরে এসে পড়ছিল। আসলে আমি খুব সচেতনভাবে এটা খেয়াল করিনি তার কারণ বোধহয় আমি আগেই জানতাম উনি ওঁর অফিসে আছেন। উনি অফিসে কাজ করবেন বলেই তো উঠে গেলেন, তাই না? আপনিও তো শুনেছেন।' শেষ কথাগুলো আদিত্যকে।

'আপনি কি কাউকে আপনার শ্বশুরমশায়ের অফিসের পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখেছিলেন?' আদিত্য সরাসরি উত্তর দিল না।

'না। দেখিনি। দেখলে নিশ্চয় আমার মনে থাকত।' দীপশিখা বেশ জোর দিয়ে বলল।

'আচ্ছা একটা অন্য প্রসঙ্গে আসছি। আপনার শ্বশুরমশায়ের জীবনে কি কোনও স্ক্যান্ডেল ছিল?'

'স্ক্যান্ডেল!' আদিত্যর মনে হল দীপশিখা চেষ্টা করে অবাক হবার অভিনয় করছে। তার কানদুটো লাল হয়ে গেছে। কপালে সামান্য ঘাম।

'কই না তো। আমার শ্বশুরমশায়ের কোনও স্ক্যান্ডেলের কথা আমি অন্তত জানি না। কিন্তু এরকম অদ্ভুত প্রশ্ন করার মানে কী?' দীপশিখা ভাব করছে যেন প্রশ্নটা শুনে সে ভীষণ আহত হয়েছে।

ডিএসপি বললেন, 'একটা পারসোনাল অবজারভেশন। ছন্দা দত্ত তার শ্বশুরকে বাবা বলে রেফার করছিলেন। আপনি কিন্তু অসীমবাবুকে শ্বশুরমশাই বলেই রেফার করে গেলেন। হোয়াই দিস ডিফারেন্স?'

'দেখুন এক-একজন এক-একরকম ভাবে চিন্তা করে। আমার মনে হয়, শ্বশুর যতই ভাল হোন না কেন তিনি কখনও বাবার জায়গা নিতে পারেন না। এটা অবশ্য আমার ব্যক্তিগত মত।' দীপশিখা মজুমদার দত্ত ম্লান হাসল।

ঘরে একজন কনস্টেবল ঢুকে পড়েছে। এ সেই দুজনের একজন যারা অনির্বাণ দত্তকে ডাকতে গিয়েছিল। লোকটাকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছে। ওড়িয়া ভাষায় সে ডিএসপি সাহেবকে যা বলল, আদিত্য তার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারল না। তবে আন্দাজ করল কিছু একটা ঘটেছে।

ডিএসপি কৃষ্ণ পধি আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার আর কোনও প্রশ্ন নেই তো?'

আদিত্য ঘাড় নেড়ে না বলার পর দীপশিখার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাদের আর কোনও প্রশ্ন নেই। আপনি এখন তাহলে আসতে পারেন।'

দীপশিখা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর আদিত্য বলল, 'ব্যাপার কী ডিএসপি সাহেব? মনে হল আপনার কনস্টেবল কিছু একটা খবর নিয়ে এসেছে।'

'হ্যাঁ। খবর এসেছে অনির্বাণ দত্তর মোবাইলে কাল রাত্তিরে একটা ফোন এসেছিল। অনির্বাণ দত্ত ফোনটা ধরে প্রায় তিন মিনিট কথা বলেছিল।'

'ক'টার সময় সেই ফোনটা এসেছিল?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'রাত্তির সাড়ে এগারোটা নাগাদ। তখন তো বটেই আজ সকাল সাতটা পনেরোতেও অনির্বাণ দত্তর ফোনটা চালু ছিল। সকালে একটা ফোন এসেছিল, অনির্বাণ দত্ত সেটা ধরেনি। বেজে বেজে ফোনটা থেমে গেছে।'

'রাত্তির সাড়ে এগারোটার ফোনটা ট্রেস করার চেষ্টা হয়েছিল?'

'হয়েছিল। কিন্তু সেই ফোনটা ততক্ষণে সুইচঅফ হয়ে গেছে। তবে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আমরা আবিষ্কার করেছি। খুন হবার আগে অসীম দত্তকে যে ফোনটা থেকে ফোন করা হয়েছিল, এটা সেই নাম্বার। অর্থাৎ খুনের আগে যে নম্বর থেকে অসীম দত্ত ফোন পেয়েছিলেন এটা এক্স্যাটলি সেই নম্বর। আমরা অসীম দত্তর কল লিস্ট থেকে ফোনটা ট্রেস করার পর একবার ফোন করেছিলাম। তখনও ফোনটা বন্ধ ছিল। মাঝে নিশ্চয় ফোনটা সুইচ অন করে অনির্বাণ দত্তকে ফোন করা হয়েছিল। কিন্তু আমরা সেটা ধরতে পারিনি। আমাদের উচিত ছিল কনটিনুয়াসলি ফোনটা মনিটর করা। সেটা করা হয়নি।'

'যাগগে যা হবার তো হয়েই গেছে। কিন্তু কী জানেন? আমার মন বলছে ওই ঘরটা একবার দেখা দরকার যেখানে অনির্বাণের সঙ্গে দীপশিখা দেখা করেছিল। চলুন না একবার গিয়ে দেখে আসি। মোবাইলটা তো অনির্বাণের পকেট থেকেও ওখানে পড়ে যেতে পারে। হয়তো পড়ে গিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে।'

'ঠিক আছে চলুন। আপনি বলছেন যখন।' ডিএসপি সাহেবের কণ্ঠস্বর থেকে এটা স্পষ্ট যে তাঁর মনে হচ্ছে যাওয়াটা বিফল হবে।

পিছনের করিডোরে খুব হাওয়া। হাওয়াদের ঢেউ সরাসরি সমুদ্র থেকে দৌড়ে দৌড়ে আসছে। সমুদ্রের ওপরে পুঞ্জীভূত কালো মেঘমালা। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে সংগতি রেখে ঝাউবন হাওয়াদের সঙ্গে নাচছে। হাতে সময় থাকলে আদিত্য তন্ময় হয়ে দেখত।

আকাশের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে আদিত্যর মনে হঠাৎ কামড় দিল চিলকার দিকে যদি বৃষ্টি নামে কেয়ারা ঠিকঠাক ফিরতে পারবে তো? কেয়ারা কি রওনা হয়ে গেছে?

কোণের ঘরের দরজা বন্ধ, তবে তালা দেওয়া নয়। নব ঘোরাতেই দরজা খুলে গেল। ভিতরে কুপকুপে অন্ধকার। কিচ্ছু দেখা যায় না। একজন কনস্টেবল ঘরের ভিতরে ঢুকে হাতড়ে হাতড়ে সুইচবোর্ডটা বার করে ফেলল। আলো জ্বলে ওঠার পর কয়েক সেকেন্ড আদিত্যর চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। চোখে আলো সয়ে আসতে সে দেখতে পেল সামনের সোফার ওপর অনির্বাণ দত্ত মরে কাঠ হয়ে বসে আছে। বুকের বাঁদিকে জমাট বাঁধা রক্ত। মুখের অভিব্যক্তিতে অবিশ্বাস। যেন সে শেষ মুহূর্তেও বিশ্বাস করতে পারেনি আততায়ী তাকে গুলি করতে পারে। অনির্বাণ দত্তর বুকে যে গুলি লেগেছে এবং তার দেহে যে আর প্রাণ নেই এগুলো বোঝার জন্যে কাছে গিয়ে লাশ পরীক্ষা করার দরকার পড়ে না।

পার্সটা অনির্বাণ দত্তর পেছনের পকেটে রয়েছে কিন্তু অনেক খুঁজেও ঘরের মধ্যে কোথাও অনির্বাণ দত্তর মোবাইলটা পাওয়া গেল না।

(৩)

কেয়া ভয় পেয়েছে। বারবার বলছে, এই রিসর্ট ছেড়ে আজই চলে যাবে। কাছাকাছি অনেক থাকার জায়গা আছে, কোথাও জায়গা পাওয়া যাবে না, হতেই পারে না। রিসর্টে সবসুদ্ধু চব্বিশটা ঘর। তার মধ্যে ছ'টা ঘর অসীম দত্তর পরিবারের দখলে, একটা আদিত্যদের জন্য বরাদ্দ, অসীম দত্ত যে ঘরটায় ছিলেন সেটাও ফাঁকা পড়ে আছে। বাকি ষোলোটা ঘরের সব ক'টাতেই বাইরের গেস্ট, যারা পয়সা দিয়ে থাকছে। প্যাকেজ অনুযায়ী আগামীকাল অবধি এদের বুকিং। এদের অনেকেই পয়সার মায়া ত্যাগ করে রিসর্ট ছেড়ে চলে যাচ্ছে। যে কয়েকজন রয়ে গেছে, প্রদীপ চক্রবর্তীরা তাদের মধ্যে আছে। প্রদীপ এবং রাখির সহজ কথা। এত কষ্টের পয়সা খরচ করে যখন এসেছি, পুরোটা উসুল করে যাব। ম্যানেজার রঘুনন্দন জানাল, পরশু থেকে যত বুকিং ছিল সব ক্যানসেল করা হয়েছে। পরশু থেকে রিসর্ট অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হবে।

আদিত্য আর কেয়া প্রদীপ চক্রবর্তীদের সঙ্গে ডিনার খাচ্ছিল। ডাইনিং হল আজ ফাঁকা, ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাঁচ-ছ'টা পরিবার ডিনার খাচ্ছে। কিন্তু দত্ত বা মল্লিক বাড়ির কাউকে দেখা যাচ্ছে না। প্রদীপ এবং রাখি চক্রবর্তী রিসর্ট ছেড়ে যাচ্ছে না শুনে কেয়া, মনে হয়, একটু বল-ভরসা পেয়েছে। আর 'চলে যাব' 'চলে যাব' বলে আদিত্যকে ভয় দেখাচ্ছে না।

'অনির্বাণ দত্ত কখন খুন হয়েছিল গো?' কেয়া জিজ্ঞেস করল।

'পুলিশের ডাক্তার বলছে খুনটা কাল রাত্তিরে এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে হয়েছিল। সময়টা এর থেকে একটু এদিক-ওদিক হতে পারে কিন্তু এটা নিয়ে সন্দেহ নেই যে খুনটা কাল রাত্তিরেই হয়েছে।'

'লোকটা অতক্ষণ ওই ঘরটাতে মরে পড়ে রইল, অথচ কেউ খেয়ালই করল না? এটা কিন্তু বেশ আশ্চর্য ব্যাপার।' প্রদীপ চক্রবর্তী মন্তব্য করল।

'ওই ঘরটাতে সাধারণত কেউ যায় না। তাই হয়ত কেউ লক্ষ করেনি। একজন সিকিউরিটি গার্ড অবশ্য বলছে সে রাত্তির এগারোটা সাড়ে এগারোটা নাগাদ অনির্বাণ দত্তকে ওই ঘরে দেখেছে। অন্য কোনও গেস্ট হলে সে আপত্তি করত, কিন্তু সে জানত অনির্বাণ দত্ত মালিকের ছেলে। তাই সে কিছু বলেনি। সিকিউরিটি গার্ড দেখেছে অনির্বাণ ঘরের দরজা খুলে রেখে কারও জন্যে অপেক্ষা করছিল। বলাই বাহুল্য, ঘরে তখন আলো জ্বলছিল, কিন্তু আমরা যখন ওই ঘরে ঢুকলাম তখন ঘরটা ছিল একেবারে অন্ধকার।'

'এটা তো আশ্চর্য কিছু নয়।' প্রদীপ চক্রবর্তী ভুরু কুঁচকে বলল। 'খুনি নিশ্চয় কাজ সারার পর আলো নিভিয়ে, দরজা টেনে দিয়ে চলে গেছিল। যাতে ঘরটা কারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করে।' তারপর মুচকি হেসে যোগ করল, 'আমি খুনি হলে তাই করতাম।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন, প্রদীপদা। সেই সিকিউরিটি গার্ডই রিসর্টটা টহল দিতে দিতে ঘণ্টা দেড়েক পরে যখন ওই ঘরটার সামনে আবার ফিরে এসেছিল, সে ঘরের দরজা বন্ধই দেখেছিল। আর জানলার ভেনিশিয়ান ব্লাইন্ড-এর ফাঁক দিয়েও কোনও আলো আসছিল না। অতএব সে ধরে নিয়েছিল অনির্বাণ ঘরের আলো নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে ফিরে গেছে।'

'কিন্তু আজ সকালে ঝাড়পোঁচ করার জন্যেও কি কেউ ঘরটাতে ঢোকেনি?' রাখি জিজ্ঞেস করল।

'আমরা হাউসকিপিং-এ খোঁজ নিয়েছিলাম। যে মহিলা ওই ঘরটা পরিষ্কার করার দায়িত্বে আছে সে বলল ওই ঘরটা যেহেতু নিয়মিত ব্যবহার হয় না তাই সে একেবারে শেষে, বাড়ি যাবার ঠিক আগে, সে ওই ঘরটা ঝাড়পোঁচ করে। গতকালও তাই করত। কিন্তু তার আগেই আমরা ওই ঘরে ঢুকে পড়ি।'

'তুমি কী করে বুঝলে গো অনির্বাণ দত্তর বডিটা ওই ঘরেই আছে?' কেয়া ঈষৎ আদুরে গলায় জিজ্ঞেস করল।

'ঠিক জানি না। বলতে পার ইনটুইশান। এর কোনও ব্যাখ্যা নেই।'

'আপনার কী মনে হয় অসীম দত্তকে যে খুন করেছে সে-ই অনির্বাণ দত্তকে খুন করেছে?' প্রদীপ চক্রবর্তীর গলায় কৌতূহল।

'প্রাথমিকভাবে দেখে আমার তো তাই মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, একই বন্দুক থেকে দু'জনকে গুলি করা হয়েছিল। ব্যালিস্টিক রিপোর্টটা পেলে নিশ্চিত হওয়া যাবে।'

'তার মানে ওদের বাড়ির কেউই দু'জনকে খুন করেছে?' রাখি সরলভাবে জিজ্ঞেস করল।

তার প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই খাবার এসে গেছে। যেসব গেস্টরা এত সব সত্ত্বেও থেকে গেল তাদের জন্য রিসর্ট স্পেশাল মেনু করেছে। তার মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য লবস্টার থার্মিডোর এবং স্মোকড হিলসা। চিংড়ি ও ইলিশের সহাবস্থান দেখে সকলেই বেশ হকচকিয়ে গেছে। ফলে রাখি চক্রবর্তীর প্রশ্নটা চাপা পড়ে গেল।

পরের দিন সকাল দশটা নাগাদ ডিএসপি কৃষ্ণ পধি তাঁর দলবল নিয়ে হাজির। শ্বেতা মল্লিক এবং তার স্বামীকে এখনও জিজ্ঞাসাবাদ করা বাকি আছে।

আজই এখানে আদিত্যদের শেষ দিন, তাই সে ভেবেছিল কেয়াকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে অনেকটা সময় কাটাবে। সমুদ্র তার বুকের ওপর চেপে বসেছে।

কিন্তু কৃষ্ণ পধি রিসর্টে হাজির হয়েই তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। ইন্টারোগেশনের সময় তিনি চান আদিত্য উপস্থিত থাকুক। পেশাগত দিক থেকে সেটাই আদিত্যর করা উচিত, কিন্তু আজ এই শেষ দিনে কেয়াকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রের ধারে সময় কাটাতেই বেশি ইচ্ছে করছে।

গতকালের ঝোড়ো হাওয়া, মেঘ কিছুই আর নেই। সমুদ্রের ধারে চড়চড়ে রোদ্দুর। গুমোট। আদিত্য ভাবল, ভালই হয়েছে এখন সমুদ্রের ধারে যাওয়া হচ্ছে না। এত রোদ্দুরে সমুদ্রটাকে খুব একটা উপভোগ করা যেত না। কেয়াও বোধহয় ব্যাপারটা বুঝতে পারছে। তাই আদিত্যর অনুপস্থিতি নিয়ে সে খুব একটা রাগারাগি করছে না। শুধু বলল, 'কাজ শেষ করে খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবে। আমাকে যেন একা একা লাঞ্চ খেতে না হয়।'

আদিত্য আপিসঘরে ঢুকে দেখল তার জন্যে সকলে অপেক্ষা করছে। টেবিলের একদিকে শ্বেতা মল্লিক একা একটা চেয়ারে বসে আছে। টেবিলের উল্টোদিকে তিনটে চেয়ার। তার মধ্যে দুটো ডিএসপি কৃষ্ণ পধি এবং ইন্সপেক্টার পণ্ডার দখলে। আর একটা চেয়ার ফাঁকা, সেটা, ধরে নেওয়া যায়, আদিত্যর জন্যে।

'আপনার বাবা এবং ভাই-এর মৃত্যুর জন্যে আপনাকে আমাদের গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।' আদিত্য চেয়ারে বসার পর ডিএসপি শুরু করলেন। ডিএসপির বাংলার ওপর দখল আদিত্যকে মুগ্ধ করেছে।

ডিএসপির নরম কথার কোনও সাড়া কিন্তু শ্বেতা মল্লিকের দিক থেকে পাওয়া গেল না। সে রুক্ষ গলায় বলল, 'সমবেদনা-টমবেদনা ছাড়ুন। আপনারা যদি একটু তাড়াতাড়ি এই ইন্টারোগেশনের ঝামেলাটা চুকিয়ে দিতে পারেন তাহলেই হবে।'

ডিএসপি সাহেব চটেছেন। তিনি চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'মিসেস মল্লিক, আপনার বাবা এবং ভাই খুন হয়েছেন। এদের মৃত্যুতে আপনার এবং আপনার স্বামীর প্রচুর লাভ। তাছাড়া আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি আপনাদের ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থাও এখন ভাল যাচ্ছে না। তাই অসীম দত্ত এবং অনির্বাণ দত্তকে খুন করার মোটিভ আপনার এবং আপনার স্বামীর দুজনেরই আছে। অর্থাৎ আপনি একজন প্রাইম সাসপেক্ট। এই অবস্থায় আপনাকে আমরা যতক্ষণ খুশি ইন্টারোগেট করব। দরকার হলে থানায় নিয়ে গিয়ে ডিটেনও করতে পারি। অতএব মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিন। অধৈর্য হলে আপনারই ক্ষতি।'

শ্বেতা মল্লিক কিছু একটা উত্তর দিতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল। সে চুপ করে বসে আছে।

'আমাদের প্রথম প্রশ্ন, গত শনিবার রাত্তির সাড়ে নটা থেকে পৌনে এগারোটার মধ্যে আপনি একবারও কি ব্যাঙ্কোয়েট হল থেকে বেরিয়েছিলেন?'

'মনে নেই। বোধহয় বেরিয়েছিলাম।' শ্বেতা মল্লিক তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল। 'আর বেরোলেই বা কী হয়েছে?'

শ্বেতা মল্লিকের হাবভাব আদিত্যকেও রাগিয়ে দিচ্ছে। সে বলল, 'মিসেস মল্লিক, আপনার খুব ভাল করেই মনে থাকার কথা আপনি অন্তত দুবার বেরিয়েছিলেন। দুবারই আপনার বাবা হল থেকে বেরিয়ে যাবার পর। একবার আপনি আপনার মাতাল স্বামীকে ধরে আনতে রিসর্টের বারে গিয়েছিলেন। বারম্যান আপনাকে এবং আপনার স্বামীকে নিশ্চয় আইডেন্টিফাই করতে পারবে। আর একবার ডিনার শেষ করে অন্যদের মতো আপনিও হাত-মুখ ধুতে বেরিয়েছিলেন। আপনার স্বামীও ডিনার শেষ করে আর একবার বেরিয়েছিলেন। ফর

আ কাপল অফ লাস্ট ড্রিঙ্কস। বারম্যান আর ডিঙ্ক সার্ভ করতে চাইছিল না। তার সঙ্গে আপনার স্বামীর মৃদু কথা কাটাকাটি হয়েছিল।'

শ্বেতা মল্লিক উত্তর দিল না। চোয়াল শক্ত করে বসে রইল।

'আর একটা কথা। আপনাদের বাইরে বেরোনোটা দরকারি একটা তথ্য। যেহেতু আপনারা বাইরে বেরিয়েছিলেন, অসীম দত্তকে খুন করার সুযোগ আপনাদের ছিল।'

'তার মানে আপনারা বলতে চান আমি আর আমার স্বামী মিলে আমার বাবাকে খুন করেছি? হাউ ডেয়ার ইউ সে দ্যাট?' শ্বেতা মল্লিক আবার আক্রমণাত্মক।

'আমরা এখনও বলিনি আপনারা খুন করেছেন। আমরা বলছি, আপনাদের সুযোগ এবং মোটিভ দুটোই ছিল।' আদিত্য ঠান্ডা গলায় বলল।

শ্বেতা মল্লিক কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'আপনাদের আর কোনও প্রশ্ন আছে?'

'হ্যাঁ আছে। পরশু রাত্তিরে এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে অনির্বাণ দত্ত খুন হয়েছে। আপনি তখন কোথায় ছিলেন?' ডিএসপির প্রশ্ন।

'রাত্তিরে লোকে যেখানে থাকে। আমি আমার ঘরে ছিলাম। ঘুমোচ্ছিলাম।'

'আপনাদের গেস্ট হাউস কেমন চলছে?' আদিত্য হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলালো।

'আমার মনে হয় এটা ইররেলেভেন্ট প্রশ্ন। আমার বাবা এবং ভাই-এর খুনের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্কই নেই।'

'ইররেলেভেন্ট না রেলেভেন্ট সেটা আমরা বুঝব। আপনাকে যেটা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তার উত্তর দিন।' ডিএসপি সাহেব হুঙ্কার ছাড়লেন।

'আমাদের গেস্ট হাউস ভাল চলছে।' শ্বেতা মল্লিক কেটে কেটে উত্তর দিল।

'আপনাদের গেস্ট হাউস যদি ভালই চলবে তাহলে কেন বারবার বাবার কাছে টাকার জন্যে হাত পাততে হত?'

'এটা আমার এবং আমার বাবার ব্যক্তিগত ব্যাপার। পুলিশকে কৈফিয়ত দেব কেন?'

'মিসেস মল্লিক, আপনি কেন বুঝতে পারছেন না আপনার বাবা খুন হয়েছেন। খুনের মামলায় ব্যক্তিগত বলে কিছু হয় না।'

'ঠিক আছে। আমি বলছি। আমাদের ব্যবসায় মাঝে মাঝে টাকার দরকার পড়েছে। তখন বাবার কাছ থেকে টাকা চাইতে হয়েছে।'

'ইদানীং কি এমন হয়েছে যে আপনি বাবার কাছে টাকা চেয়ে পাননি?'

শ্বেতা মল্লিক আবার নিরুত্তর।

'সেই রাত্তিরে ব্যাঙ্কোয়েট হলেও আপনি আপনার বাবার কাছে টাকা চান, এবং আপনার বাবা টাকা দিতে অস্বীকার করেন। এটা আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

শ্বেতা মল্লিকের মুখে কুলুপ।

'আপনারা কি কোনও দোষ করেছিলেন যাতে আপনার বাবা আপনাদের ওপর রেগে গিয়েছিলেন?'

শ্বেতা মল্লিকের হঠাৎ ধৈর্যচ্যুতি হল। সে চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'দ্যাট ওল্ড ফুল ওয়াজ মেন্টেনিং এ ডাবল স্ট্যান্ডার্ড। যবে থেকে আমার মেয়ে ফুলকি, মানে স্বাতী, অভয় সিনকরের সঙ্গে লিভ ইন করছে, বাবা আমাদের ওপর খেপে গেছে। বলছে, আমার নাতনি এই ধরনের কেচ্ছা করবে এটা আমি মেনে নেব না। আমরা নাকি এ-ব্যাপারে তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি। এই নিয়ে বাবার সঙ্গে প্রচণ্ড ঝামেলা। এই ঝামেলার ফলে বাবা আমাদের টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।'

'কী নাম বললেন? অভয় সিনকর?' আদিত্য উৎকর্ণ হয়ে বলল।

'হ্যাঁ অভয় সিনকর। ফটো জার্নালিস্ট। ও আর ফুলকি লিভ ইন করছে। ওরা বিয়ে করেনি। কোনও দিন করবে কিনা তাও জানি না। যুগের সঙ্গে সঙ্গে ইয়াংগার জেনারেশানের চিন্তাগুলোও তো বদলাচ্ছে।'

'বুঝতে পারছি।' আদিত্য মৃদু গলায় বলল।

'আপনি বুঝতে পারছেন, কিন্তু মোস্ট আনফরচুনেটলি আমার বাবা বুঝতে পারেনি। বাবা বলত, এটা একটা স্ক্যান্ডেল। জানাজানি হলে নাকি সমাজে মুখ দেখানো যাবে না। বাবার ধারণা ছিল, একটু বোঝালেই ফুলকি বুঝতে পারবে। হয় অভয়কে বিয়ে করে ফেলবে আর না হয় অভয়কে ছেড়ে অন্য কাউকে। আরে বাবা, ফুলকি কী আর বাচ্চা আছে নাকি যে বোঝালেই বুঝে যাবে? তাছাড়া ও খুব লিবারেল অ্যাটমোস্ফিয়ারে বড় হয়েছে। ওর চিন্তাভাবনা খুব লিবারেল। আর সব থেকে বড় কথা, আমি বা ওর বাবা তো আপত্তি করছি না। আমার বাবার এত মাথাব্যথা কেন?'

'কিন্তু আপনার বাবা ডাবল স্ট্যান্ডার্ড মেন্টেন করছেন এটা কেন বললেন?'

শ্বেতা মল্লিক আবার কিছুক্ষণ নিরুত্তর। তারপর বিষণ্ণ গলায় বলল, 'আমাদের মা অনেকদিন আগে চলে গেছে। তারপর থেকে বাবার একজন মিস্ট্রেস আছে। আমরা অনেকদিন কিছু জানতাম না, কিন্তু এখন সবই জানি। তবে কেউ কিছু বলতে পারিনি যেহেতু বাবার ওপর আমরা ইকনমিকালি ডিপেন্ডেন্ট ছিলাম।'

'আপনারা সকলেই নিশ্চয় অসীমবাবুর ওপর ইকনমিকালি ডিপেন্ডেন্ট ছিলেন না। অনির্বাণ দত্তও কি তার বাবার ওপর ইকনমিকালি ডিপেন্ডেন্ট ছিল?'

'না, ও নিজেই ভাল রোজগার করত। কিন্তু ও কী করে কথা বলবে? ওর শাশুড়ির সঙ্গেই তো বাবার সম্পর্ক।' শ্বেতা মল্লিক ঘরের মধ্যে বোমা ফাটিয়েছে।

আদিত্য ভাবল, এটাই তাহলে সেই স্ক্যান্ডেল যার কথা বলতে বলতে শুভ্র থেমে গিয়েছিল। কেসটার একটা সম্পূর্ণ নতুন অ্যাঙ্গেল পাওয়া গেল।

শ্বেতা মল্লিক বলে যাচ্ছে, 'আমার ছোট ভাই পুচকুর শ্বশুর রাহুল মজুমদার আর আমার বাবা ছোটবেলার বন্ধু। আমার ছোট ভাইকে বাড়ির সবাই পুচকু বলে ডাকে। তো সে যাই হোক, অল্প বয়েসে রাহুল মজুমদারের সেরিব্রাল হয়। উনি ইনভ্যালিড হয়ে যান। রোজগারও বন্ধ হয়ে যায়। দীপশিখা তখন খুবই ছোট। আমার বাবার টাকায় রাহুল মজুমদারের ফ্যামেলিটার পুরো খরচটাই চলত। আস্তে আস্তে রাহুল মজুমদারের স্ত্রী সোমা মজুমদারের সঙ্গে বাবার একটা ইল্লিসিট সম্পর্ক তৈরি হয়। রাহুল মজুমদার সবই জানত, কিন্তু কী বলবে? বাবাই তো সংসারটা চালাচ্ছে।'

'অনির্বাণের সঙ্গে দীপশিখার বিয়েটা কীভাবে ঠিক হল?'

'সকলে জানে বাবা বিয়েটা ঠিক করেছে। কিন্তু আমাদের, মানে আমার স্বামীর আর আমার, ধারণা সোমা মজুমদার বিয়েটা নিয়ে বাবাকে জোর করেছিল। দেখুন, সোমা মজুমদার তো আর বাবার সম্পত্তির কিছু পাবে না। এই একটা ব্যাপারে বাবা একেবারে অ্যাডামেন্ট ছিল। তাই সোমা মজুমদার চেয়েছিল সম্পত্তির কিছুটা যেন ওর মেয়ে পায়।'

'কিন্তু অনির্বাণ রাজি হল কেন?'

'এটা তো মানবেন, দীপশিখা ইজ ভেরি অ্যাট্র্যাক্টিভ। পুচকু ওকে প্রথম দেখেই একেবারে হেড ওভার হিলস। আনফরচুনেটলি সেই ফ্যাসিনেশনটা বেশিদিন টেকেনি।'

'একটা শেষ প্রশ্ন। আপনার বাবার মৃত্যুতে না হয় অনেকের লাভ হতে পারে, কিন্তু আপনার ভাইকে খুন করে কার লাভ?'

'একটু ভেবে দেখুন, একজনেরই লাভ। দীপশিখার সঙ্গে পুচকুর ফর্মাল ডিভোর্সটা কিন্তু হয়নি। বাবার সম্পত্তির যে অংশটা পুচকু পেত তার পুরোটাই এখন দীপশিখা পাবে। ফলে পুচকু মারা গেলে দীপশিখার লাভ। আরও একটু পিছিয়ে ভেবে দেখুন। বাবার খুন হওয়ার পেছনেও এই একই মোটিভ কাজ করছে।

বাবা খুন না হলে পুচকু সম্পত্তি পাবে কী করে? এইভাবে না ভাবলে আপনি এক সঙ্গে দুটো খুন এক্সপ্লেন করতে পারবেন না।'

'আপনার তা হলে মনে হচ্ছে দুটো খুনই দীপশিখা করেছে?'

'লজিকালি তাই তো দাঁড়াচ্ছে। আর সাইকোলজিকালি, দীপশিখা তার স্বামীকে তো অবশ্যই ঘেন্না করত, কিন্তু আমার মনে হয় শ্বশুরকে, মানে আমার বাবাকেও কম ঘেন্না করত না। মায়ের লাভারকে ঘেন্না করাটাই তো স্বাভাবিক। বিশেষ করে সে যদি অসহায় অবস্থার সুযোগ নেয়। অতএব ওদের মারতে ওর কোনও অসুবিধে হবার কথা নয়।'

শ্বেতা মল্লিক ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পরে আদিত্য ডিএসপি কৃষ্ণ পধিকে বলল, 'একটা জিনিস খেয়াল করলেন? এই মহিলাকে যখন তার নিজের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল তখন উনি একদম কোঅপরেট করছিলেন না। কিন্তু যেই প্রসঙ্গটা অন্যদের দিকে ঘুরে গেল, উনি গড়গড় করে নিজেদের বাড়ির কেচ্ছা বলে গেলেন।'

'হুঁ। কিন্তু ভদ্রমহিলা শেষে যেসব কথাগুলো বললেন তার মধ্যে সাবস্টেন্স আছে।' ডিএসপি সাহেবকে চিন্তান্বিত দেখাল।

(৪)

জয়ন্ত মল্লিকের মতো লম্বা লোক বাঙালিদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। জয়ন্ত মল্লিক যখন দরজা দিয়ে ঢুকছে আদিত্য হাঁ করে ওর হাইটটা দেখছিল।

'আপনার হাইটটা কত হবে?' কথাটা বলেই আদিত্য বুঝল খুব বোকাবোকা একটা প্রশ্ন করে ফেলেছে। সে মুখটাকে যথাসম্ভব সরল করার চেষ্টা করল।

অবশ্য তার দরকার ছিল না। জয়ন্ত মল্লিক চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'আমাকে দেখার পর এই প্রশ্নটা প্রায় সকলেই করে। বলুন তো কত হতে পারে আমার হাইট?' জয়ন্ত মল্লিক চওড়া করে হেসে পালটা প্রশ্ন করল।

'ছয়-তিন, নাকি ছয়-চার?' আদিত্যও হাসতে হাসতে বলল।

'পুরো ছয় ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি। তার থেকে আধ ইঞ্চিও কম নয়।'

'আপনি স্কুলে গোল কিপিং করেননি? আপনার হাইটে গোল কিপিংটা বিরাট অ্যাডভান্টেজ।'

'না, ফুটবলটা তেমন করে খেলা হয়নি। তবে আর্মিতে থাকতে নিয়মিত বাস্কেটবল খেলতাম।'

'ব্রিগেডিয়ার মল্লিক, আমরা আপনাকে দু-একটা প্রশ্ন করব। বুঝতেই পারছেন দুদিনে দুটো খুন হয়ে গেছে। তাই আমাদের কিছু কমপালশান আছে। না হলে আপনাদের বিরক্ত করতাম না।' ডিএসপি সাহেব আর সময় নষ্ট করতে রাজি নন।

'আমাদের প্রথম প্রশ্ন, শনিবার, মানে যেদিন রাত্তিরে অসীম দত্ত খুন হলেন, সেদিন রাত্তির সাড়ে ন'টা থেকে পৌনে এগারোটার মধ্যে আপনি কোথায় ছিলেন?'

'আমি ঘড়ি দেখিনি, তাই বলতে পারব না ঠিক সাড়ে ন'টা থেকে পৌনে এগারোটার মধ্যে আমি কোথায় ছিলাম। তবে এটুকু বলতে পারি আই ফাউন্ড দ্য প্রোগ্র্যাম ইন দ্য ব্যাঙ্কোয়েট হল কোয়াইট বোরিং। সো আই স্লিপড আউট অ্যান্ড ওয়েন্ট টু দ্য বার। আমি রাত্তির পর্যন্ত বারেই ছিলাম।'

'আপনি একবার ডিনার খেতে ফিরে আসেননি?'

'ও হ্যাঁ। শ্বেতা, মানে আমার স্ত্রী, আমাকে ধরে নিয়ে এসেছিল। বলল, সবার সঙ্গে ডিনার না খেলে খারাপ দেখাবে। সো আই হ্যাড টু গো। আমার খুব একটা খিদে ছিল না। বারে যেটুকু স্ন্যাক্স খেয়েছিলাম তাতেই আমার পেট ভরে গিয়েছিল। তাই ব্যাঙ্কোয়েট হলে ফিরে এসে সামান্য কিছু খেয়েছিলাম।'

'তারপর কি আপনি আবার বারে ফিরে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। ফর আ ডাইজেস্টিফ। এখানকার বারে দেখলাম কোঁয়াত্র পাওয়া যাচ্ছে। সো আই হ্যাড টু সারভিংস।'

'আপনি কি বার থেকে বেরিয়ে আর কোথাও গিয়েছিলেন?'

'আই ওয়েন্ট টু দ্য জন আ কাপ্ল অফ টাইমস। ঠিক কখন গিয়েছিলাম মনে নেই।'

'কোথায় গেছিলেন?' ডিএসপি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন।

'ওয়েন্ট টু দ্য লু।'

ডিএসপির ভ্রূকুঞ্চন তখনও যায়নি দেখে আদিত্য বলল, 'উনি বলছেন যে উনি বার দুয়েক বাথরুমে গিয়েছিলেন।'

'ও বাথরুমে গেছিলেন।' ডিএসপিকে আশ্বস্ত মনে হল।

'আপনি কি বারে একাই ছিলেন?'

'না, বেশ কিছুক্ষণ আমার বড় শালা অনিকেত আমার সঙ্গে ছিল।'

'আমাদের হিসেব অনুযায়ী রবিবার রাত্তির এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে আপনার শালা অনির্বাণ দত্ত খুন হয়েছেন। আপনি ওই সময় কোথায় ছিলেন?'

'এগারোটার সময় বার বন্ধ হয়। আমি এগারোটা অবধি বারেই ছিলাম। তারপর সোজা ঘরে ফিরে আসি।'

'আপনি যখন ফিরলেন তখন কি আপনার স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?'

'না, না। ও অত তাড়াতাড়ি ঘুমোয় না। আমি যখন ঘরে ফিরলাম তখন ড্রেসিং টেবল-এর সামনে বসে ও মুখে ক্রিম মাখছিল।'

'আমি অন্য একটা প্রশ্ন করছি। আপনারা কলকাতায় যে গেস্ট হাউসটা চালান, সেটা কেমন চলছে?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'ভাল চলছে না, মোটেই ভাল চলছে না। আমি ওয়ার স্ট্র্যাটেজি ভাল বুঝতে পারি, কিন্তু বিজনেস স্ট্র্যাটেজি আমার মাথায় ঢোকে না। ব্যবসা জিনিসটা শ্বেতাও খুব ভাল বোঝে বলে আমার মনে হয় না। আমাদের গেস্ট হাউসটা প্রচুর লসে চলছে। অনেক টাকা ধার হয়ে গেছে। হয়ত ওটাকে বন্ধই করে দিতে হবে।'

'আপনাদের তো ভাল পেনশন আছে।' ডিএসপি সাহেব হালকা চালে বললেন।

'আছে। কিন্তু আমি তো অর্ধেক পেনশন কমিউট করে দিয়েছি। রিটায়ার করে যে টাকাটা পেলাম সেটা দিয়েই তো ব্যবসা শুরু করলাম।'

'লোকে কিন্তু বলে আপনাদের গেস্ট হাউসটা খুব ভাল চলার কথা। আসলে ওটার ঠিকমতো মেনটেনেন্স হচ্ছে না। আপকিপ খুব খারাপ। তাই লোকে ওখানে থাকতে আসছে না। কিছু টাকা দিয়ে যদি জায়গাটা সারিয়ে নেওয়া যেত তা হলেই ওটা খুব ভাল চলত।' আদিত্য বলল।

'আপনি এত কথা কী করে জানলেন?'

'পুলিশ ইনভেস্টিগেশন থেকে জেনেছি। অসীম দত্ত প্রথমবার অ্যাট্যাকড হবার পরে পুলিশ আপনাদের গেস্ট হাউসে তো ইনভেস্টিগেট করেছিল।'

'আই সি। আপনি যেটা বললেন সেটা কিন্তু ঠিক। ইন ফ্যাক্ট আমার এক্সট্রাভ্যাগেন্স-এর জন্যেই ব্যবসাটা ডুবতে বসেছে। প্রথম দিকে যে প্রফিটটা করছিলাম সেটা যদি খানিকটা জমিয়ে রাখতাম তা হলে সেই টাকাটা দিয়ে গেস্ট হাউসটা মাঝেমাঝেই রেনোভেট করা যেত। বাট মাই ড্যাম ড্রিঙ্কিং অ্যান্ড গ্যাম্বলিং হ্যাবিটস! ইফ আই ডিডন্ট হ্যাভ দোজ ভাইসেস তা হলে ব্যবসাটা এই জায়গায় পৌঁছত না। শ্বেতাকেও এত কষ্ট পেতে হত না।'

'এখন তো আপনারা অসীম দত্তর সম্পত্তির একটা অংশ পেয়ে যাবেন। এখন ব্যবসাটা দাঁড় করাতে পারবেন না?'

'জানি না পারব কিনা। নিজের ওপর কনফিডেন্স চলে গেছে।'

'আচ্ছা, আপনি যখন ফোর্ট উইলিয়ামে পোস্টেড ছিলেন তখন একটা ঘটনা ঘটেছিল। একজন লোক আপনার হাতে মার খেয়েছিল। ঘটনাটা ঠিক কী হয়েছিল?' ডিএসপি সাহেব জিজ্ঞেস করলেন।

'দেখুন ওই ইন্সিডেন্টটা আমি মনে করতে চাই না। ইটস ভেরি এমব্যারাসিং। সি, আই হ্যাভ আ ভেরি ব্যাড টেম্পার। যখন রেগে যাই, কোনও হুঁশ থাকে না। ওই লোকটি ছিল একজন সুইপার। আমার ঘর ঝাড়ু দিত। ঝাড়ু দিতে গিয়ে আমার ঘর থেকে দুটো রামের বোতল সরিয়েছিল। এমন কিছু ব্যাপার নয়। কিন্তু দোষটা কিছুতেই স্বীকার করছিল না। দোষ স্বীকার করলেই আমি ছেড়ে দিতাম। শেষে এমন রাগ হয়ে গেল মারলাম কষে এক থাপ্পড়। আসলে নিজের হাতের জোরের কথা আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। লোকটা প্রায় মরেই যাচ্ছিল। মরে গেলে আমি সত্যিই ঝামেলায় পড়তাম। যাই হোক আমার ভাগ্য ভাল। আর্মি হসপিটালে কিছুদিন থেকে ও সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পেরেছিল। অ্যান্ড দ্য ম্যাটার এন্ডেড দেয়ার।'

'একটা শেষ প্রশ্ন করি। আপনার কোনও ফায়ার আর্মস আছে?'

'আছে। ব্রুগার অ্যান্ড থমেট এম পি নাইন। এটাকে বলে মেশিন পিস্তল। সুইস মেড। স্টেট অফ দ্য আর্ট ওয়েপন। ইটস আ বিউটি।'

'অস্ত্রটা কি আপনি আপনার সঙ্গে এখানে এনেছেন?'

'ওটা সব সময় আমার সঙ্গে থাকে।'

'অ্যামিউনিশন্স?'

'অ্যামিউনিশন্স ছাড়া তো ওটা রাখার মানে হয় না। কিছু অ্যামিউনিশন্স আমার সঙ্গে থাকে।'

লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে। ডিএসপি বললেন, আরও কয়েকটা ইন্টারোগেশন বাকি আছে। লাঞ্চ খেয়ে তিনি সেগুলো শেষ করতে চান। অসীম দত্তর নাতি এবং নাতনির সঙ্গে পুলিশ এখনও কথা বলেনি। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। তাছাড়া অনির্বাণ দত্তর মৃত্যুর আগে যাদের ইন্টারোগেশন শেষ হয়ে গিয়েছিল তাদের আবার জিজ্ঞেস করতে হবে রবিবার রাত্তির এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে তারা কোথায় ছিল। এটা একটা রুটিন জিজ্ঞাসা। এর থেকে কিছু পাওয়ার আশা না থাকলেও করতে হবে। আদিত্য বলল, চন্দ্রিমা সেন বলে অসীম দত্তর যে সেক্রেটারি আছে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কিছু পাওয়া যেতেও পারে। দীপশিখার মা সোমা মজুমদারের সঙ্গেও একবার কথা বলা যেতে পারে। ডিএসপি বললেন, অফিশিয়াল চ্যানেলে ক্লিয়ারেন্স নিয়ে কলকাতা যেতে যেতে তাঁর কিছুটা সময় লেগে যাবে। আদিত্য যদি প্রাথমিক ভাবে এদের দুজনের সঙ্গে কথা বলে তাঁকে জানায় তাহলে ভাল হয়। আদিত্য রাজি। সে ডিএসপি কৃষ্ণ পধিকে বলে দিয়েছে লাঞ্চ পরবর্তী জিজ্ঞাসাবাদের সময় সে থাকতে পারছে না।

'আর একটা কথা।' আদিত্যকে উঠতে দেখে কৃষ্ণ পধি বললেন। 'মার্ডার ওয়েপনটা তো পাওয়া গেল না। আমি ভাবছি এই রিসর্টটা ভাল করে সার্চ করব। অসীম দত্তর রেলেটিভদের ঘরগুলো তো সার্চ করতেই হবে, অন্য গেস্টদের ঘরগুলোও দেখব। রিসর্টের কমপাউন্ডটাও। বলা যায় না, খুনি হয়তো কোথাও ওয়েপনটা লুকিয়ে রেখেছে বা ফেলে দিয়েছে।'

'গুড আইডিয়া। দেখুন কিছু পাওয়া যায় কিনা। যাঁরা খুন হয়েছেন তাদের মোবাইল দুটোও তো মিসিং। মার্ডার ওয়েপনের সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন ও দুটোও পাওয়া যায় কিনা।'

আদিত্য ঘরে এসে দেখে কেয়া লাঞ্চে যাবে বলে সেজেগুজে বসে আছে। আরও কিছুক্ষণ এইভাবে বসে থাকতে হলে কেয়া বেজায় রেগে যেত, বিশেষ করে যেহেতু ক্রমশ তার খিদে পেয়ে যাচ্ছিল। আদিত্য সময়

মতো ফিরে এসেছে।

'তোমার বন্ধুরা কোথায়? তারা লাঞ্চ খেতে যাবে না?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'আমি ওদের ফোন করেছিলাম। রাখিদির শরীরটা আবার খারাপ হয়েছে। তাই ওরা ঘরেই খাবার আনিয়ে নিচ্ছে।'

'তাহলে চল, আমরাই যাই।' আদিত্য মনে মনে একটু খুশি হয়েছে। সে খানিকটা প্রাইভেসি চাইছিল।

কেয়াকে দেখে হঠাৎ তার আদর করতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু শাড়িটার ইস্ত্রি নষ্ট হয়ে গেলে কেয়া মোটেই খুশি হবে না। তার ওপর এখন কেয়ার খিদেও পেয়েছে। আদিত্য ভাবল, এই অবস্থায় নিজেকে সংযত রাখাই বুদ্ধির কাজ হবে।

ডাইনিং হলে ডিএসপি সাহেব ইন্সপেক্টার পণ্ডাকে নিয়ে এক কোণে বসে লাঞ্চ খাচ্ছেন। আদিত্য তাদের দিকে হাত নেড়ে কেয়াকে নিয়ে অনেক দূরে গিয়ে বসল। পুলিশের সঙ্গ আর ভাল লাগছে না। সেই কনস্টেবল দুজন দরজা পাহারা দিচ্ছে।

খাওয়া শেষ করে আদিত্য আর কেয়া ভেবেছিল কিছুক্ষণ সমুদ্রের ধারে কাটাবে। আজই এখানে শেষ দিন। কাল সকালবেলা ফেরার ফ্লাইট, অর্থাৎ কোনও রকমে ব্রেকফাস্ট খেয়েই বেরিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু সমুদ্রের ধারে রোদ্দুর যেন ঝলসে দিচ্ছে। এই রোদ্দুরে সমুদ্রের ধারে গেলে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়বে। জানলার ব্লাইন্ডটা তুলে দিলে ঘর থেকে সমুদ্র দেখা যায়। ওরা ঠিক করল ঘরেই ফিরে যাবে। বিকেলে রোদ্দুর পড়লে না হয় সমুদ্রের ধারে যাবার কথা ভাবা যেতে পারে।

ঘরে ফিরে অবশ্য জানলার ব্লাইন্ড তুলে সমুদ্র দেখা হল না। তার বদলে ঘরের আধো-অন্ধকারে এসির ঠান্ডায় আদর-টাদর শেষ হবার পর কেয়া ঘুমিয়ে পড়ল। দুপুরে আদিত্যর ঘুম আসে না। সে শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবছে।

সেই ঘরটার একটা ছবি তার চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠছে, যে ঘরটাতে অনির্বাণ দত্ত খুন হয়েছিল। ঘরটাতে কি কিছু একটা আছে যেটা আদিত্যর চোখ এড়িয়ে গিয়েছে? এমন কিছু যেটা সে খোলা চোখে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু তার অবচেতন মন দেখতে পেয়েছে? আদিত্য চোখ বুঝে মনঃসংযোগ করার চেষ্টা করল। সে ঘরটা দেখতে পাচ্ছে। সেই সোফা, সোফার ওপর অনির্বাণ দত্ত বসে আছে। সামনে একটা টেবিল। টেবিলের ওপর অনির্বাণ দত্তর মোবাইল। ঘরের দরজা খোলা।

খোলা দরজা দিয়ে একজন ঘরে ঢুকল। আততায়ী। গায়ে চাদর জড়ানো। সে পকেট থেকে পিস্তল বার করে অনির্বাণ দত্তকে গুলি করল। খুব কাছ থেকে গুলিটা করল। রক্ত ছিটকে টেবিলের ওপর পড়েছে। আততায়ী টেবিলের ওপর থেকে মোবাইলটা তুলে নিল। সেটাকে সুইচ অফ করার চেষ্টা করল। পারল না। সাইলেন্ট মোডে দেবার চেষ্টা করল এবং পারল। আততায়ী মোবাইলটা পকেটে পুরে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

না, এটা ঠিক ছবি নয়। অনির্বাণ দত্তর ঘরে আলো জ্বলছিল কেন?

আদিত্য যেটা দেখতে পাচ্ছিল না এখন সেটা দেখতে পেয়েছে। সে বিছানা ছেড়ে উঠে রিসেপশনে ফোন করে দীপশিখা মজুমদার দত্তর ইন্টারকম নম্বরটা জানল। তারপর তার ঘরের ইন্টারকম থেকে নম্বরটা লাগাল।

'আমি আদিত্য মজুমদার বলছি। এই বিশ্রী সময় ফোন করে কি ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম?'

'না, না। আমি দুপুরে ঘুমোই না। বই পড়ছিলাম। বলুন।'

'একটা ছোট্ট জিনিস জানার ছিল। মনে হল আপনিই বলতে পারবেন। আপনার কি মনে আছে আপনার স্বামী অনির্বাণ দত্ত কী ধরনের বা কী ব্র্যান্ডের মোবাইল ব্যবহার করতেন?'

'মোবাইলের ব্যাপারে অনির্বাণ খুব ফাসি ছিল। খুব প্রোটেক্টিভও বটে। কাউকে নিজের মোবাইল ধরতে দিত না। ওর ভাব দেখে মনে হতো মোবাইলে ওর অনেক পার্সোনাল সিক্রেট আছে।'

'মোবাইলটা কি পাসওয়ার্ড দিয়ে খুলতে হত?'

'ডবল পাসওয়ার্ড। একটা অ্যালফা-নিউমারিক। আর একটা ওর নিজের ভয়েস। নাহলে মোবাইল খুলবেই না।'

'আচ্ছা, আপনার শ্বশুরমশাই কী রকম মোবাইল ব্যবহার করতেন মনে আছে?'

'উনি খুব একটা টেক স্যাভি ছিলেন না। তাই খুব সিমপ্ল মোবাইল ব্যবহার করতেন।'

'আইফোন?'

'হ্যাঁ, আইফোন। তবে একেবারে বেসিক।'

'সেটা খুলতে গেলে কি পাসওয়ার্ড লাগত?'

'আমার মনে হয় না। কিন্তু মোবাইল নিয়ে আমাকে এত সব জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'আসলে অসীম দত্ত এবং অনির্বাণ দত্ত দুজনের মোবাইলই মিসিং। খুনি সম্ভবত দুজনের মোবাইলই সঙ্গে নিয়ে গেছে। তাই ভাবছিলাম, মোবাইলগুলো ঠিক কেমন ছিল? মনে হল, আপনিই দুটো মোবাইল সম্বন্ধে সঠিক তথ্য দিতে পারবেন। আপনাকে বিরক্ত করা জন্য দুঃখিত।'

কথাবার্তায় কেয়ার ঘুম ভেঙে গেছে। ঘুম জড়িত গলায় বলল, 'রোদ্দুর পড়ে গেছে?'

আদিত্য ভেনিশিয়ান ব্লাইন্ড ফাঁক করে দেখল সমুদ্রের ধার থেকে রোদটা সরে গেছে। এখন সমুদ্রের ধারে যাওয়া যেতেই পারে।

রাত্তির সাড়ে-আটটা নাগাদ ডিএসপি সাহেবের ফোন।

'অনেক খুঁজেও মার্ডার ওয়েপনটা পাওয়া গেল না। মোবাইল দুটোও পাওয়া যায়নি। দত্ত বাড়ির সঙ্গে রিলেটেড সবার ঘর সার্চ করেছি। কিচ্ছু নেই।

আদিত্য ভাবছে, এরকমই কিছু একটা হবে সে আন্দাজ করেছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

(১)

খাঁটি কলকাত্তাইয়া বলতে যা বোঝায় আদিত্য হাড়ে-মজ্জায় তাই। দু-চারদিন কলকাতার বাইরে থাকতে হলেই কলকাতার জন্যে তার মনটা হুহু করে ওঠে। তাদের প্রিপেড ট্যাক্সি ভিআইপি রোড পেরিয়ে উল্টোডাঙার দিকে মোড় নেবার সঙ্গে সঙ্গে আদিত্যর মনটা ভাল হয়ে গেল। এই ভিড়ের রাস্তা, ফুটপাথে মানুষের ট্র্যাফিক জ্যাম, ধুলো, ধোঁয়া, ভাঙাচোরা দোকান, রোদে-জলে মলিন হয়ে যাওয়া পুরোনো বাড়ি—এই সবই তার একান্ত নিজের মনে হয়। পাশে বসে কেয়া কখনও চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ছে আবার কখনও জেগে উঠে ঢুলুঢুলু চোখে ট্যাক্সির জানলা দিয়ে শহরের রাস্তাঘাট দেখছে। অত সকালে উঠে ফ্লাইট ধরতে হয়েছে, ঘুম তো পাবেই। একটা বড় সান্ত্বনা, ফেরার ফ্লাইটটা সময় মতো ছেড়ে সময় মতো আদিত্যদের দমদম পৌঁছে দিয়েছে।

'বাড়ি গিয়ে খাবে কী?' কেয়াকে চোখ খুলতে দেখে আদিত্য জিজ্ঞেস করল। 'তড়কা-রুটি কিনে নিয়ে বাড়ি ঢুকবে নাকি? তা হলে তোমাকে আর রান্নাঘরে ঢুকতে হবে না।'

'না,না। তড়কা-রুটি খাব না। একগাদা তেল। একে ঘুম হয়নি, অত তেল খেলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে। আমি বাড়ি গিয়ে খিচুড়ি চাপিয়ে দেব। খিচুড়ি আর ডিমের অমলেট। ভালোই খাওয়া হবে। আসার সময় ফ্রিজে আধ ডজন ডিম রেখে এসেছি। ঘরে আলু-পেঁয়াজও আছে।' কেয়া ঈষৎ ঘুম-জড়ানো গলায় বলল।

বাড়ি ফিরে আদিত্য একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবছে এবার চান করতে যাবে, বিমলের ফোন। কেয়া রান্নাঘরে খিচুড়ির তোড়জোড় করছে।

'পুরী থেকে ফিরে এসেছেন স্যার?'

'একটু আগে ফিরেছি। কিন্তু তুমি জানলে কী করে আমরা পুরী গিয়েছিলাম? তোমাকে তো বলিনি।'

'জানার কত রকম উপায় আছে স্যার। একটু চেষ্টা করলেই তো জানা যায়। বলছি, কী করে জানলাম। তার আগে একটা খবর দিই স্যার। সমীর প্যাটেলকে কারা যেন প্রচণ্ড মারধোর করে রাস্তার ধারে ফেলে রেখে গেছিল। পুলিশ জানতে পেরে বাড়ির লোককে খবর দিয়েছিল। তারা সমীরকে বাইপাসের ধারে একটা হাসপাতালে ভর্তি করেছে। ওই ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট না কী যেন বলে, সেখানে। দুদিন জ্ঞান ফেরেনি। গতকাল কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান ফিরেছিল। লোকজন কিছু চিনতে পারছে না। ভাবলাম আপনাকে খবরটা জানাই।'

আদিত্য প্রায় জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, কে সমীর প্যাটেল? হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল সমীর প্যাটেল অনিতা চৌধুরির বন্ধুর নাম। যে বন্ধু মাঝে মাঝেই অনিতার সঙ্গে দেখা করতে আসে।

'সমীর প্যাটেল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে তুমি জানলে কী করে?' আদিত্য খানিকটা বিভ্রান্ত।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেটা তো আগে বলা দরকার। আসলে কী হয়েছে স্যার, আপনি তো সেদিন বললেন আর এখন আমার কোনও কাজ নেই। শুনে মনটা একটু দমে গেল। ওই সমীর ছেলেটাকে ফলো করে মনে হচ্ছিল এর ভিতরে একটা রহস্য আছে। তা, আপনি যখন বললেন তখন আমি আপনার কথায় জামির লেনের ওই বাড়িটায় যাওয়া কদিন বন্ধ রাখলাম। তারপর এই দুদিন আগে মনে হল একবার গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে আসি না। খোঁজ-খবর নিতে তো কোনও ক্ষতি নেই।

'ওখানে তো সিকিউরিটির সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গিয়েছিল। সে জানত আমি অনিতা ম্যাডামের বন্ধুর ওপর নজর রাখছি। তো আমি ওখানে যেতে সিকিউরিটির ছেলেটা বলল, 'সাংঘাতিক খবর। ওই ছেলেটা, যার ওপর তুমি নজর রাখছিলে, প্রচণ্ড ধোলাই খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছে। অনিতা ম্যাডাম রোজ ছেলেটাকে দেখতে যাচ্ছে। আমি বললাম, তুমি জানলে কী করে। সে বলল, সবাই জানে। অনিতা ম্যাডামের যে কাজের মাসি আছে সে বলেছে। এইসব কথাবার্তা যখন চলছে তখন দেখি অনিতা ম্যাডাম বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে। সিকিউরিটি ছেলেটা বলল, ওই দ্যাখো, ম্যাডাম বেরোচ্ছেন। মনে হয় হাসপাতালেই যাচ্ছেন। তুমি চাইলে পেছন পেছন গিয়ে দেখে আসতে পার কোন হাসপাতালে ছেলেটা ভর্তি আছে।'

'তারপর?' আদিত্য বেশ আগ্রহ নিয়ে শুনছে।

'আমার প্রচণ্ড কৌতূহল হল। ম্যাডাম একডালিয়ার মোড় থেকে একটা ডাবলু বি টি সি-র বাস ধরে মুকুন্দপুরে গিয়ে নামলেন। ম্যাডামের পেছন পেছন গিয়ে আমিও তাই করলাম। মুকুন্দপুরের বড় হাসপাতালটায় ম্যাডাম ঢুকে গেলেন। তখন ভিজিটিং আওয়ার। ম্যাডাম লিফটে উঠে চলে গেলেন। আমি রিসেপশনে গিয়ে খোঁজ করলাম সমীর প্যাটেল কোন ফ্লোরে আছে, কেমন আছে। জানা গেল, সমীর ট্রমা কেয়ার সেন্টারের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে আছে। আগের থেকে ভাল আছে। জ্ঞান ফিরেছে। তবে এখনও লোক চিনতে পারছে না।

'আমার মোবাইলটায় পয়সা ফুরিয়ে গিয়েছিল। তাই ভাবলাম আপনার আপিসে গিয়ে আপনাকে ব্যাপারটা জানিয়ে তারপর ডিউটিতে চলে যাব। আপনার আপিসে গিয়ে দেখি আপনি নেই। শ্যামল বলে যে ছেলেটা আপনাদের আপিসে কাজ করে বলল আপনারা পুরী গেছেন, আজ ফিরবেন। আমি আজ সকালে মোবাইলে পয়সা ভরে এই আপনাকে ফোন করছি।'

কেয়া ঘরে ঢুকেছে। বিরক্ত গলায় বলল, 'এখনও ফোন নিয়ে পড়ে আছ? এবার চান করতে যাও। খিচুড়ি হয়ে গেছে।'

'এক মিনিট।' আদিত্য কেয়ার দিকে তাকিয়ে বলল। তারপর বিমলকে বলল, 'তুমি খুব দরকারি তথ্য দিয়েছ। আর একটা কাজ তোমাকে করতে হবে। অনিকেত দত্ত এবং জয়ন্ত মল্লিক, নাম দুটো মনে রাখ। আমি এদের ঠিকানাগুলো হোয়াটসঅ্যাপ করে দিচ্ছি। এদের ওপর নজর রাখতে হবে। তুমি একা না পারলে আর কাউকে সঙ্গে নিয়ে নাও। আমি তাকে আলাদা পেমেন্ট করে দেব। কয়েকদিন পরে আমাকে জানাবে এরা কোথায় যায়, কী করে। বুঝতে পেরেছ? ঠিক আছে, আজ রাখছি।'

আদিত্যর খিদে পেয়ে গেছে।

খাবার সময় আদিত্য দেখল খিচুড়ির সঙ্গে শুধু ডিমের অমলেট নয় আলুর বড়া এবং পেঁয়াজিও আছে। কেয়ার গৃহিণীপনায় আদিত্যর মুগ্ধতা দিনে দিনে বাড়ছে।

'যদিও বডি একেবারে ডিসইন্টিগ্রেট করে গেছিল তবু অটোপসি এবং ফরেনসিক থেকে দু একটা দরকারি জিনিস জানতে পারা গেছে।' অচিন্ত্য সাহার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। 'ঘড়িটা যে সময়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, অটোপসি রিপোর্ট বলছে মৃত্যু ওই সময় নাগাদই হয়েছিল। মৃত্যু যে পিস্তলের গুলিতে হয়েছে সেটা তো আগেই বোঝা গিয়েছিল। এখন জানা গেল পিস্তলটার রেঞ্জ সম্ভবত খুব বেশি ছিল না, কাজেই গুলিটা খুব কাছ থেকে ছোঁড়া হয়েছে। খুনি পাঁচিল টপকে পেছন দিক থেকে চুপিচুপি এসে গুলি করেছে। মণিময়বাবু এত মগ্ন হয়ে মাছ ধরছিলেন যে খুনির আসাটা টের পাননি।'

'বডি আইডেন্টিফায়েড হয়েছে?'

'হ্যাঁ। প্রথমত, ফরেনসিক রিপোর্ট মৃতদেহের দাঁতের সঙ্গে ডেন্টিস্টের কাছে মণিময় গুপ্তর দাঁতের যে এক্সরে পাওয়া গেছে সেটা মিলিয়ে দেখেছে। ফরেনসিক রিপোর্ট বলছে দু'টো দাঁতের স্ট্রাকচার

আইডেন্টিকাল। অতএব আইডেন্টিটি বিয়ন্ড ডাউট এস্ট্যাব্লিশড হয়ে গেছে।'

'তার মানে মণিময় গুপ্ত যে মারা গেছেন, খুন হয়েছেন, সেটা আপনারা অফিশিয়ালি ডিক্লেয়ার করে দিয়েছেন, তাই তো?'

'ডিক্লেয়ার মানে ওর কোম্পানিকে জানিয়ে দিয়েছি। ওর কোনও উকিল-টুকিল ছিল কিনা আমরা জানি না।'

'ওকে, বুঝেছি। ফরেনসিক রিপোর্ট থেকে আর কী জানা গেল?'

'ফরেনসিকের দ্বিতীয় ফাইন্ডিংটা বেশ ইন্টারেস্টিং। ফরেনসিক রিপোর্ট বলছে যে ধরনের গুলিতে সৈকত চৌধুরির মৃত্যু হয়েছিল একই ধরনের গুলিতে তার পার্টনার মণিময় গুপ্তরও মৃত্যু হয়েছে। একই পিস্তল থেকে দুটো গুলি বেরিয়েছে এই সম্ভবনা মোটেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

'এটা তো খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। তার মানে সম্ভবত একই লোক দুজনকে খুন করেছে।' আদিত্য চিন্তিত গলায় বলল।

'তাই তো দাঁড়াচ্ছে স্যার।'

'আচ্ছা, মণিময়বাবুর হিসেবপত্তরগুলো ভাল করে দেখেছেন? ওর বাগানবাড়ি থেকে যে তাড়াতাড়া ব্ল্যাক মানি বেরোল তার কোনও একটা হদিশ তো হিসেবপত্রে পাওয়া যাবে।'

'পাওয়া গেছে, আবার পাওয়া যায়নিও বটে।' অচিন্ত্য সাহা হেঁয়ালি করে বলল।

'তার মানে কী?' আদিত্যর হেঁয়ালি ভাল লাগছে না।

'তার মানে হল, মণিময় গুপ্তকে জড়ানোর মতো কোনও সূত্র আমরা পাইনি। আমাদের অ্যাকাউন্টেন্ট কোম্পানির হিসেবপত্রগুলো খুব ভাল করেই দেখেছে। তবে এটা পরিষ্কার যে কোম্পানির হিসেবপত্রে বেশ বড় রকম গরমিল আছে। কিন্তু সমস্ত গরমিল কোম্পানির অন্য পার্টনার সৈকত চৌধুরির দিকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছে।'

'সৈকত চৌধুরির দিকে!' আদিত্যর মনে পড়ে গেল অনিতার মুখে শোনা সৈকতের কথা, মণিময় তাকে ঠকিয়েছে। বিশ্বজিৎ মজুমদার বলে সেই অ্যাকাউন্টেন্ট ছেলেটাও এই ধরনেরই একটা কিছুর ইঙ্গিত দিয়ে ছিল।

আদিত্য মুখে বলল, 'কী ধরনের গরমিল দেখা যাচ্ছে?'

'গরমিল নানা ধরনের। তবে যে জোচ্চুরিটা সব থেকে বেশি দেখা যাচ্ছে সেটা হল সরকারি প্রজেক্টে চুক্তি অনুযায়ী মালমশলা না দেওয়া। বা আরও পরিষ্কার করে বললে, যে মানের মালমশলা দেবার কথা তার থেকে নিম্নমানের মালমশলা দেওয়া। বলাই বাহুল্য, এর মধ্যে সরকারি অফিসাররাও জড়িত। কোটি কোটি টাকার বেআইনি লেনদেন হয়েছে।'

'এই জোচ্চুরি সৈকত করেছে?' আদিত্যর গলায় অবিশ্বাস।

'সমস্ত এভিডেন্স কিন্তু সেই কথাই বলছে। সরকারি চুক্তিপত্রে সৈকতের সই। মালমশলা কেনার পারচেজ অর্ডারে সৈকতের সই। সমস্ত দুনম্বরি ডিলে সৈকতের সই।'

সৈকতের পার্টনার মণিময় কি সই করতেই জানত না?' আদিত্য শুকনো গলায় বলল।

'জানত, জানত। কিছু কাগজপত্রে তার সইও আছে। কিন্তু সেগুলো সমস্ত পরিষ্কার ডিল। কোনও দুনম্বরি সেখানে নেই।'

'দেখুন অচিন্ত্যবাবু, আমরা তো জানি মণিময় গুপ্ত প্রভূত কালো টাকা উপার্জন করেছিল। তার থেকে এটাই কি মনে হয় না যে সৈকতকে সামনে রেখে মণিময় চুরিগুলো করেছিল? সৈকত চমৎকার ইঞ্জিনিয়ার ছিল, কিন্তু মানুষ চিনত না। বিশেষ করে মণিময়কে সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করত। মণিময় সেই বিশ্বাসের সুযোগ নিয়েছে।'

'আমারও তো স্যার এরকমই মনে হচ্ছে। কিন্তু সমস্ত এভিডেন্স সৈকত চৌধুরির বিরুদ্ধে।' অচিন্ত্য সাহা ঈষৎ কাঁচুমাচু।

'এইজন্যেই কি সৈকত চৌধুরির পেছনে সিবিআই লেগেছিল?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। তবে সিবিআই এনকোয়ারির বিষয়ে আমি কিছুই বলতে পারব না। বিদ্যুৎ বলে যে ছেলেটির কাছ থেকে সিবিআই-এর ব্যাপারটা জানতে পেরেছিলাম সেও আর কিছু বলতে পারল না। এই ব্যাপারটা স্যার আপনাকে একটু ইনফ্লুয়েন্স খাটিয়ে জানতে হবে। আমাদের মতো চুনোপুঁটিকে সিবিআই গ্রাহ্যই করবে না।'

'সেটা আমি দেখছি কী করা যায়। কিন্তু একটা কথা বলুন। আপনার তো থিয়োরি ছিল অনিতা চৌধুরি আর তার প্রেমিক মিলে সৈকতকে ইনশিয়োরেন্সের টাকার লোভে খুন করেছে। এখন কি আপনি বলবেন, ওরা মণিময়কেও মেরেছে?'

'আমার তো তাই মনে হচ্ছে। মণিময়ের কোনও ওয়ারিশ নেই। সে মরে গেলে পুরো কোম্পানির মালিকানাই অনিতার হাতে চলে যাবে। মানুষের টাকার লোভ যে ক্রমশ বাড়তেই থাকে এটা তো আমি পুলিশের চাকরি করতে এসে বারবার দেখেছি স্যার।'

'ঠিক আছে। আপাতত আপনার কথাটা না হয় মেনে নিলাম। আমার আর একটা দরকারি কথা বলার আছে। আপনি কি মণিময় গুপ্তর মিসট্রেসের সঙ্গে দেখা করার সময় পেয়েছেন?'

'আরে না, না। এখনও দেখা করিনি। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি। দুজনে একসঙ্গে মিলে একদিন ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করা যাবে, কী বলেন?'

'ভেরি গুড। সাধু প্রস্তাব। শিবপদর কাছ থেকে আপনি নিশ্চয় ফোন নম্বরটা জোগাড় করে রেখেছেন। ফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিন। আমি আপনার সঙ্গে চলে যাব।'

'ঠিক আছে। আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আপনাকে জানাব।'

'আর একটা রিকোয়েস্ট। ঠিক একটা নয়, দুটো রিকোয়েস্ট।'

'বলুন স্যার।'

'আমার ইচ্ছে একদিন কল্যাণী গিয়ে সৈকত চৌধুরির মা-বাবার সঙ্গে আলাপ করে আসি। আপনি সঙ্গে গেলে ব্যাপারটা একটু জোর পায়। যাবেন আমার সঙ্গে?'

'ঠিক আছে যাব। আপনি যখন বলছেন তখন অবশ্যই যাব। কল্যাণী পুলিশ স্টেশন থেকে আমাদের এক কলিগ অবশ্য ওদের সঙ্গে কথা বলে রিপোর্টটা আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। রিপোর্টে কিছুই নেই। তবু আপনি যখন বলছেন, নিশ্চয় যাব। সত্যি কথা বলতে কি, আপনার কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ স্যার। মণিময় গুপ্তর বাগানবাড়ি থেকে অতগুলো কালো টাকা উদ্ধার হল সে তো আপনারই জন্যে। অন্য কেউ না জানুক আমি তো জানি। ওটার জন্যে হয়তো একটা অ্যাওয়ার্ড-ট্যাওয়ার্ডও পেয়ে যেতে পারি। তাই বলছিলাম, আমাকে রিকোয়েস্ট করবেন না স্যার, অর্ডার করবেন।'

'আর এক দিন অনিতার বাপের বাড়ি গিয়ে একটু খোঁজখবর করার ইচ্ছে আছে। এখানেও আপনি সঙ্গে গেলে ভাল হয়। আপনি কি ওখানে আগে গেছেন?'

'হ্যাঁ স্যার, দু'বার ওখানে ইনভেস্টিগেশনে গেছি। লোকগুলো খুব একটা কোঅপরেট করেনি। ওদের একটাই কথা। অনিতার সঙ্গে ওদের আর কোনও সম্পর্ক নেই। তাই অনিতার বিষয় ওরা কিচ্ছু জানে না। সে যাই হোক, আপনি যদি ওখানে যেতে চান আমি অবশ্যই সঙ্গে যাব। আর কিছু আছে?'

'আপাতত এইটুকুই থাকুক। পরে কথা হবে।'

ফোনটা নামিয়ে রেখে আদিত্য ভাবল চেয়ারে বসেই একটু ঘুমিয়ে নেবে। সকালে উঠে ফ্লাইট ধরতে হয়েছিল বলে গত কাল রাত্তিরে ভাল ঘুম হয়নি। চোখ বন্ধ করতেই মনে পড়ে গেল আরও দু-একটা ফোন

করতে হবে।

সুভদ্র মাজিকে ফোনে পাওয়া গেল না। এনগেজড। পরের ফোনটা বিপ্লব সমাদ্দারকে। এই সেই ইনশিয়োরেন্স কোম্পানির ডিটেকটিভ যিনি সৈকত চৌধুরির কেসটা তদন্ত করছেন। অচিন্ত্য সাহা বলেছিল একে আদিত্যর নামটা বলে রাখবে।

'আমার নাম আদিত্য মজুমদার। আমি আপনারই মতন একজন ইনভেস্টিগেটার। তবে ফ্রি লান্স, প্রাইভেট। আপনাকে কি আমার কথা ইন্সপেক্টার অচিন্ত্য সাহা বলেছেন?'

'অচিন্ত্য? আমার ঠিক মনে পড়ছে না। কী ব্যাপার বলুন তো?' বিপ্লব সমাদ্দারের গলাটা কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ শোনালো।

'আপনার মতো আমিও সৈকত চৌধুরির কেসটা ইনভেস্টিগেট করছি।'

'ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। মনে পড়েছে। অচিন্ত্য আমাকে ফোন করে বলেছিল আপনাকে সাহায্য করতে। আমি ওকে হ্যাঁ-না কিছুই বলিনি। কিন্তু দেখুন আসল সত্যিটা হল আমি এখন একটা বেসরকারি কোম্পানিতে কাজ করি। তাই সেই কোম্পানির কিছু নিয়ম আমাকে মেনে চলতে হয়। আমাদের কোম্পানির নিয়ম অনুযায়ী আমি আমার তদন্ত থেকে পাওয়া কোনও ইনফর্মেশন বাইরের কারও সঙ্গে শেয়ার করতে পারি না। ইন ফ্যাক্ট, আমার তদন্তের ব্যাপারে কোনও কথাও আমি বাইরের কারও সঙ্গে বলতে পারি না। অতএব বুঝতেই পারছেন সৈকত চৌধুরির কেসটা নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'না, না। আপনার কাছ থেকে আমি কোনও ইনফর্মেশন জানতে চাইছি না। আমিই আপনাকে এমন দুএকটা তথ্য দিতে চেয়েছিলাম যাতে আপনার লাভ হত। আর দুএকটা জিনিস একটু ভেরিফাই করে নিতাম।'

'মাফ করবেন। আমার সাহায্যের কোনও প্রয়োজন নেই। আমি আপনার সাহায্য ছাড়াই চালিয়ে নিতে পারব। নমস্কার।' বিপ্লব সমাদ্দার ফোনটা কেটে দিল।

টেবিলের ওপর মোবাইলটা নামিয়ে রেখে আদিত্য ভাবছিল। একবার সে একটা লোকাল ট্রেনে এক অন্ধ গায়কের গলায় একটা গান শুনেছিল, চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়। সেই গানটার কথা তার মনে পড়ে যাচ্ছিল।

(২)

আদিত্যর কলেজ জীবনে বিধান সরণির ফুটপাতের ওপর যে বিখ্যাত সরবতের দোকানটা ছিল, সেটা এখনও রয়েছে। পুলিশের গাড়ি কৈলাস বোস স্ট্রিট পেরোনোর ঠিক আগে আদিত্য দোকানটা এক ঝলক দেখতে পেল। আগের মতোই আছে। এখনও লোকে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সরবত খাচ্ছে। আর একটু এগোলে বিবেকানন্দ রোড। বিশাল প্রস্থ নিয়ে সে শহরের ওপর তার শরীর বিছিয়ে দিয়েছে। পাড়াটা আদিত্যর খুব চেনা। পছন্দেরও বটে। সে এক সময় বিবেকানন্দ রোডের ওপর একটা মেসে থাকত। আর কয়েক মিনিট পরেই হেঁদো। আদিত্য ভাবল, এত দূর এসে কেয়ার জন্যে নকুড়ের সন্দেশ না নিয়ে গেলে মনে দুঃখ থেকে যাবে। কথাটা সে খানিক ইতস্তত করে সুভদ্র মাজিকে বলেই ফেলল। সুভদ্র বলল, তাহলে আগে সন্দেশটা কিনে নেওয়া যাক। না হলে এদিকে ফেরার জন্যে অনেক ঘুরতে হবে। অনেকগুলো রাস্তা ওয়ান-ওয়ে আছে তো।

সন্দেশ কেনা হল। আদিত্যর দেখাদেখি সুভদ্রও কিনে ফেলল অ্যাসর্টেড গোটা কুড়ি সন্দেশ। সন্দেশের বাক্সগুলো গাড়িতেই রেখে গন্তব্যস্থলে যেতে হবে। গন্তব্যস্থল বেথুন রো-এর একটা ঠিকানা। রামদুলাল

সরকার স্ট্রিট থেকে সন্দেশ কিনে খানিক এগিয়ে ডানদিকে ঘুরতেই বেথুন রো পাওয়া গেল। এখনও তেমন গরম পড়েনি। তাই ধরে নেওয়া যায় সন্দেশগুলো খারাপ হয়ে যাবে না।

বাড়িটা পুরোনো। দোতলা। যত্নের অভাবে জায়গায় জায়গায় ভেঙে পড়েছে। একটা দেয়াল-ফোঁড় অশথগাছ ছাদের পাঁচিল ভেদ করে ঊর্ধ্বমুখী, আকাশ ছুঁতে চায়। বাড়ির নকশাটা সাবেকি, ঢুকেই একটা শ্যাওলা ধরা উঠোন, চৌবাচ্চা, একটা কলঘর। এক ধার দিয়ে সরু একপ্রস্থ সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে। একতলায় তিনটে ঘর, দুটো খোলা, একটা বন্ধ। খোলা ঘরগুলোর একটাতে দুটো লোক উবু হয়ে বসে স্তূপাকার হাতওলা গেঞ্জির ওপর কী যেন একটা যন্ত্রের সাহায্যে ক্রমাগত ছাপ দিয়ে চলেছে। অন্য ঘরটাতে ছাপ দেওয়া গেঞ্জিগুলো দড়িতে শুকোচ্ছে। আদিত্য উঁকি মেরে দেখল, ছাপ-দেওয়া গেঞ্জিগুলোর বুকে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে 'আই লাভ নিউ ইয়র্ক'। বন্ধ ঘরটার দরজায় 'কোয়ালিটি ক্যাটারার' বলে একটা নেমপ্লেট লাগানো। আদিত্য আন্দাজ করল, কাজের দিনে কেটারিং-এর লোক এই ঘরটাতে যজ্ঞিবাড়ির রান্নাবান্না করে।

'এখানে রাহুল মজুমদার, সোমা মজুমদার থাকেন?' সুভদ্র মাঝি খোলা দরজার সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করল।

পুলিশের ইউনিফর্ম দেখে লোক দুটো ঘাবড়েছে।

'বাড়িওলা ওপরে থাকে। ওই সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতে হবে।' একজন ঈষৎ কাঁপা গলায় বলল।

'রাহুল মজুমদার কি আপনাদের বাড়িওলা?'

'সে তো জানি না বাবু। আমরা এখানে গেঞ্জি কলে কাজ করি। আমাদের মালিক বলতে পারবে বাড়িওলার নাম। তা তিনি তো একটু বেরিয়েছেন।'

'ঠিক আছে। আমরা দেখছি।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলা। কোলাপসিবল গেট। তালা লাগানো। গেটের বাইরে সিঁড়ির দেয়ালে রং-চটা লেটারবক্স। তালা নেই। ছিটকিনিতে মরচে ধরেছে। খুব নজর করে দেখলে বোঝা যাবে লেটারবক্সের গায়ে খুব হালকা করে 'রাহুল মজুমদার' 'সোমা মজুমদার' দুটো নামই লেখা আছে। প্রথমটার নীচে দ্বিতীয়টা। লেটারবক্সের ওপরে একটা কলিং বেলও রয়েছে। সুভদ্র মাজি পরপর দু-বার কলিং বেল বাজাল।

যে মহিলা এসে কোলাপসিবল গেটের তালা খুলছেন, তাঁর দিকে এক ঝলক তাকিয়ে আদিত্যর মনে হল তাঁর বয়েস পঞ্চাশ পেরোলেও ষাট পেরোতে বাকি আছে। ফেটে পড়া ফরসা রং, ছিপছিপে শরীর এখনও টানটান, মুখেও বিশেষ মেদ জমেনি। দীপশিখা তার মায়ের রং পায়নি এটা স্পষ্ট। সন্দেহ নেই, যৌবনে সোমা মজুমদার তাঁর মেয়ের থেকেও সুন্দরী ছিলেন।

'আপনারা অনেকটা দেরি করে ফেললেন। আমার এক জায়গায় বেরোনোর ছিল।' সোমা মজুমদার তাঁর বিরক্তিটা লুকোবার চেষ্টা করলেন না। 'যদি একটু তাড়াতাড়ি করেন ভাল হয়।'

অন্য কোনও পুলিশ অফিসার হলে ধমক লাগাত। কিন্তু সুভদ্র মাজি তার নামের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে বিনীতভাবে বলল, 'সত্যিই আমাদের বড় দেরি হয়ে গেল। তার জন্যে ক্ষমা চাইছি। আমরা খুব বেশি সময় নেব না।'

দেরি হওয়া নিয়ে আদিত্যর একটু পাপবোধ ছিল। সে ভাবছিল, বেরোতেই যখন দেরি হয়ে গেল, তখন নকুড়ের দোকানে দাঁড়িয়ে অতটা সময় ধরে সন্দেশ না বাছলেই ভাল হত।

কোলাপসিবল গেট দিয়ে ঢুকে টানা বারান্দা, বারান্দা দিয়ে নীচে তাকালে নোংরা উঠোনটা দেখা যায়। গৃহকর্ত্রী তাদের প্রথম ঘরটাতে বসালেন। এটাই মনে হয় এই পরিবারের বৈঠকখানা। ঘরটা বেশ বড়। তবে তিনটে বেতের চেয়ার, একটা বেতের সেন্টার টেবিল আর এক কোণে একটা মান্ধাতার আমলের দেরাজ বাদ দিলে বাকি ঘরটা ন্যাড়া-ন্যাংটা। আদিত্য আর সুভদ্র মাজি দুজনে দুটো চেয়ার দখল করে বসল। তৃতীয়

চেয়ারটা ফাঁকা রেখে 'এক্ষুনি আসছি' বলে গৃহকর্ত্রী সেই যে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, মিনিট পাঁচেক হয়ে গেল তাঁর আর দেখা নেই।

'উনিই তো দেরি করছেন। আমাদের তা হলে তাড়াতাড়ি করার কোনও দায়িত্ব রইল না।' সুভদ্র খানিকটা উষ্মার সঙ্গে বলল।

আদিত্য তার কথার উত্তর দেবার আগেই সোমা মজুমদার ফিরে এসেছেন।

'আমার স্বামীর এই সময় কয়েকটা ওষুধ খাওয়ার কথা। ওষুধগুলো খাইয়ে এলাম। নার্স একজন আছে। কিন্তু তদারকি না করলে দু-একটা ওষুধ মিস করে যাবেই। তাই একটু সময় লাগল।' মনে হল, পুলিশকে পাঁচ মিনিট বসিয়ে রাখার জন্য সোমা মজুমদারের বিশেষ বিবেক দংশন নেই। যেন পুলিশই তাঁর ব্যক্তিগত পরিসরে ঢুকে একটা মস্ত অন্যায় করে ফেলেছে।

'এবার বলুন, কী বলবেন।' সোমা মজুমদার চেয়ারে বসতে বসতে বললেন।

'আপনি তো জানেন আপনার স্বামীর বন্ধু অসীম দত্ত খুন হয়েছেন। সেই প্রসঙ্গে আপনাকে দু-একটা প্রশ্ন করতে চাই।' সুভদ্র শুরু করল।

সোমা মজুমদার নিরুত্তর থেকে সুভদ্র মাজির দিকে তাকিয়ে রইলেন। চোখে জিজ্ঞাসা।

'আপনি অসীম দত্তকে কতদিন ধরে চেনেন?'

'আমার বিয়ে হয়েছে তেত্রিশ বছর। বিয়ের পর থেকেই অসীম দত্তকে চিনি। অসীমদা আমার স্বামীর স্কুলের বন্ধু।'

'আমরা শুনেছি আপনার স্বামী অসুস্থ। শয্যাশায়ী। আপনার স্বামী কবে থেকে অসুস্থ?'

'প্রায় কুড়ি বছর আগে আমার স্বামীর একটা ম্যাসিভ সেরিব্রাল স্ট্রোক হয়। তার পর থেকে উনি প্যারালাইজড।' সোমা মজুমদারের গলায় ক্লান্তি ফুটে উঠেছে।

'এখন আপনার স্বামীর বয়েস কত হবে?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'আগামী জুন মাসে ছেষট্টি হবে।'

'তার মানে, আপনার স্বামী যখন অসুস্থ হন তখন তাঁর বয়েস বছর ছেচল্লিশ। তাই তো?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'অসুস্থ হবার আগে আপনার স্বামী কী করতেন? মানে ওঁর প্রফেশনটা কী ছিল?'

'উনি ব্যাঙ্ক অফিসার ছিলেন। ওই বয়সেই ডিজিএম হয়ে গিয়েছিলেন।'

'আপনারা কি তখন এই বাড়িতেই থাকতেন?'

'না, না। সল্ট লেকে আমার স্বামীর কোয়ার্টার ছিল। আমরা সেখানে থাকতাম। এই বাড়িটা তখন ফাঁকাই পড়ে থাকত। মানে দোতলাটা। একতলার ঘরগুলো চিরকালই ভাড়া দেওয়া ছিল।'

'বাড়িটা কে বানিয়েছিলেন?'

'এই বাড়িটা আসলে আমার শাশুড়ির। আমার শাশুড়ি তাঁর বাবার কাছ থেকে এই বাড়িটা পেয়েছিলেন। শাশুড়ির বাবা বাড়িটা বানিয়েছিলেন। দেখতেই তো পাচ্ছেন বাড়িটা কত পুরোনো।'

'তার মানে, আপনার স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়ার পর থেকে আপনারা এই বাড়িতে থাকতে আরম্ভ করেন। ঠিক বলছি?'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলছেন।'

'আপনার স্বামী আর বাড়ি করেননি? ব্যাঙ্ক থেকে তো অল্প সুদে লোন পাওয়া যায়।'

'আমার স্বামী একটা ফ্ল্যাট কেনার জন্যে কিছু টাকা জমা দিয়েছিলেন। বাকিটা মাসে মাসে দিতে হত। আমার স্বামী অসুস্থ হবার পর আর সেটা সম্ভব হয়নি। ফ্ল্যাটটা আমরা ছেড়ে দিয়েছিলাম।'

'আপনার স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়ার পর ব্যাঙ্ক থেকে আপনাকে কমপ্যাশানেট গ্রাউন্ডে চাকরি দেয়নি?'

'দিয়েছিল। আমার স্বামী নিতে দেননি। সত্যিটাই বলছি। হায়ার সেকেন্ডারির পর আমার আর পড়া হয়নি। তাই কমপ্যাশানেট গ্রাউন্ডে চাকরি নিলে আমাকে নিচু কোনও পদে চাকরি করতে হত। আমার স্বামীর তাতে আপত্তি ছিল। আমার স্বামী বলতেন, ডিজিএম-এর বউ বেয়ারার চাকরি করবে এটা হতে পারে না। আর আমার মেয়ে তো তখন খুবই ছোট। তার চাকরি করার প্রশ্নই ওঠে না।'

'তাহলে আপনাদের চলত কী করে?'

'আমার স্বামী একটা অতি সামান্য পেনশন পেতেন। এখনও পান। কিন্তু তা দিয়ে সংসার চালানো সম্ভব নয়। কিছুদিন জমা টাকা ভেঙে চলল। তারপর জমা টাকাও ফুরিয়ে গেল।' এইটুকু বলে সোমা মজুমদার চুপ করে রইলেন।

'তাহলে আপনাদের চলত কী করে?' সুভদ্র মাজি তার প্রশ্নটা পুনরাবৃত্তি করল।

'অসীমদা সাহায্য না করলে আমাদের সংসারটা ভেসে যেত। আমার স্বামী অসুস্থ হবার দুচার বছর পর থেকেই অসীমদা প্রত্যেক মাসে আমাদের আর্থিকভাবে সাহায্য করতেন।'

'অসীম দত্ত খুন হবার ফলে সেই সাহায্য তো বন্ধ হয়ে গেল। এখন আপনাদের চলবে কী করে?' প্রশ্নটা করেই আদিত্যর মনে হল কথাটা রূঢ় হয়ে গেল।

ভাগ্যক্রমে সোমা মজুমদার সেই রূঢ়তাটা গায়ে মাখলেন না। বললেন, 'অসীমদার আর্থিক সাহায্যটা বন্ধ হয়ে গেলে আমাদের খুবই অসুবিধে হবে। তবে এখন তো আমাদের মেয়ে আমাদের সঙ্গেই থাকে। ও একটা স্কুলে পড়ায়। ওর আয়ে সংসারটা কোনও রকমে চলে যাবে।' কথাটা বলে সোমা মজুমদার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'আপনার মেয়ের বিয়ের প্রসঙ্গে আসছি।' কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে আদিত্য আবার শুরু করল। 'অসীম দত্তর ছেলের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাবটা কি আপনাদের তরফ থেকে গিয়েছিল, নাকি অসীমবাবুর দিক থেকে এসেছিল?'

'দুটোর কোনওটাই নয়। বিয়েটা আমার স্বামী এবং অসীমদা দু'জনে মিলে ঠিক করেছিলেন।'

'আমরা দেখেছি, দীপশিখা মুম্বই থেকে চলে আসার পরেও অসীমবাবুর সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাল ছিল। শুনেছি, অনির্বাণবাবুর সঙ্গে যদি দীপশিখার ফর্মালি ডিভোর্স হয়ে যেত, তাহলেও সে অসীমবাবুর সম্পত্তির একটা অংশ পেত। আপনারা কি এই ব্যাপারটা জানতেন?'

সোমা মজুমদার খানিকটা চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, 'অসীমদা আমাদের বলেছিলেন দীপশিখার জন্যে কিছু টাকা তিনি তাঁর উইলে রেখে যাবেন। কিন্তু টাকার অঙ্কটা কত সেটা তিনি বলেননি। তবে অনির্বাণের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে তিনি মাঝে মাঝে বলতেন, ভাবছি, আমার উইলে অনির্বাণের অংশটা পুরোটাই দীপশিখাকে দিয়ে যাব। আমার ছেলের বেয়াড়াপনায় মেয়েটা বড় কষ্ট পেয়েছে।'

'আপনার কি মনে হয় এটা শুধু কথার কথা, নাকি বাস্তবে এরকম ঘটতেও পারত?'

'আমি ঠিক বলতে পারব না।'

'এবার একটা খুব অপ্রিয় প্রশ্ন করব। তদন্তের স্বার্থে প্রশ্নটা আমাদের করতেই হবে।' আদিত্য একটু থেমে সাহস সঞ্চয় করে নিল।

'আমাদের প্রশ্ন, অসীম দত্তর সঙ্গে আপনার কি কোনও সম্পর্ক ছিল?'

'আপনি কী ইঙ্গিত দিচ্ছেন? অসীমদা আমার স্বামীর ছোটবেলার বন্ধু। আমাদের পরিবারেরও বন্ধু। শুধু বন্ধু বললে ভুল হবে। উনি প্রতি মাসে টাকা দিয়ে সাহায্য না করলে আমাদের সংসারটা ভেসে যেত। ওঁর ঋণ আমরা কোনও দিন শোধ করতে পারবো না।' সোমা মজুমদারের ফরসা রং ক্রমশ রক্তিম হচ্ছে।

'দেখুন, আপনার স্বামী রাহুল মজুমদার যখন পক্ষাঘাতে পঙ্গু এবং শয্যাশায়ী হয়ে গেলেন তার কয়েক বছর আগে অসীমবাবুর স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে। অসীমবাবু আপনাদের বাড়িতে তখন নিয়মিত আসছেন,

আপনাদের পরিবারটিকে আগলে রাখছেন। এই অবস্থায় আপনার সঙ্গে তাঁর একটা ঘনিষ্ঠতা হওয়াটাই কি স্বাভাবিক নয়?'

'কী ধরনের ঘনিষ্ঠতার কথা আপনি বলছেন, স্পষ্ট করে বলুন?' সোমা মজুমদারের মুখমণ্ডল আরও রক্তিম।

'একজন নারীর সঙ্গে একজন পুরুষের যেরকম ঘনিষ্ঠতা হয় আমি সেরকম ঘনিষ্ঠতার কথাই বলছি। কথাটা এর থেকে স্পষ্ট করে বলা সম্ভব নয়।'

'আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না। এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই।' সোমা মজুমদার মাথা নিচু করে বললেন। 'আপনার প্রশ্নে আমি খুব অপমানিত বোধ করছি।' তাঁর চোখে জল টলটল করছে।

আদিত্য আর সুভদ্র কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর সুভদ্র কিছুটা পুলিশি গলায় বলল, 'অসীম দত্ত তাঁর উইলে আপনাকে একটা মোটা টাকা দিয়ে গেছেন। দীপশিখাকে নয়, আপনাকে। এর কারণ কী বলতে পারেন?'

'অসীমদা আমাকে টাকা দিয়ে গেছেন?' সোমা মজুমদার যেন বিস্মিত।

'হ্যাঁ, বেশ মোটা একটা টাকা। অসীমবাবুর উকিল খুব শিগগির আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।'

'হয়তো আমাদের পরিবারটার কথা ভেবে অসীমদা এই টাকাটা দিয়ে গেছেন। যদি অবশ্য সত্যিই দিয়ে থাকেন।'

'ঠিক আছে। আপনাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করব না। আপনার স্বামীর সঙ্গে একটু কথা বলা যাবে?' আদিত্য বলল।

'প্যারালিসিস হয়ে যাবার পর আমার স্বামীর কথা কেউ বুঝতে পারে না। আমিও পুরোটা পারি না। তাছাড়া কোনওরকম উত্তেজনা ওঁর শরীরের পক্ষে মারাত্মক হতে পারে। আমি আপনাদের করজোড়ে অনুরোধ করছি আমার স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে চাইবেন না।'

'তাহলে আর একটাই জিনিস বাকি রইল। আপনার যে কটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে তার প্রত্যেকটার পাশবই আমাদের দেখা দরকার। আর ফিক্সড ডিপোজিট থাকলে তার সার্টিফিকেটগুলো। বেশি সময় লাগবে না। আজ পেলে আগামী কালই ফেরত দিয়ে যাব। পাশবই আর সার্টিফিকেটগুলো পেতে পারি?'

'আমার ব্যাঙ্কের পাশবই সার্টিফিকেট নিয়ে আপনারা কী করবেন? পাশবই আমি দেব না। তাছাড়া ওগুলো আপডেটও করা নেই।' সোমা মজুমদারের গলায় বিদ্রোহ।

'ম্যাডাম, আপনি যদি স্বেচ্ছায় পাশবই সার্টিফিকেটগুলো না দেন তা হলে আপনার বাড়িটা আমাদের সার্চ করতে হবে। আমাদের সঙ্গে সার্চ ওয়ারেন্ট আছে। আপনার অসুস্থ স্বামী জানতে পারবেন বাড়ি সার্চ করা হচ্ছে। জেনে উত্তেজিত হয়ে পড়বেন। ওঁর আরও শরীর খারাপ হবে। তার থেকে পাশবই আর সার্টিফিকেটগুলো স্বেচ্ছায় দিয়ে দেওয়াই ভাল নয় কি? আর আপডেট করা না থাকলে ওগুলো আমরা আপডেট করিয়ে নেব।' সুভদ্র ঠাণ্ডা গলায় বলল।

'আর, যদি কোনও পাশবই বা সার্টিফিকেট আপনি লুকিয়ে রাখেন, আমরা পরে ঠিক টের পেয়ে যাব। তখন কিন্তু আপনি পুলিশের সঙ্গে অসহযোগিতা করার দায়ে পড়ে যাবেন।' আদিত্য যোগ করল।

সোমা মজুমদার তখনও ইতস্তত করছেন।

'আমার মনে হয় আপনার মেয়ের স্কুল থেকে ফেরার সময় হয়ে যাচ্ছে। ওর সামনে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হোক আমরা চাই না। পাশবই আর সার্টিফিকেটগুলো পেলেই আমরা চলে যাব।' আদিত্য আবার বলল।

'ঠিক আছে। একটু বসুন, দিচ্ছি।' সোমা মজুমদার উঠে গেলেন।

আধঘণ্টা পরে, বাড়ি ফেরার পথে, পুলিশের গাড়ি যখন মৌলালির সিগনালে আটকে রয়েছে, সুভদ্র মাজি আদিত্যকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ব্যাঙ্কের পাশবই দেখতে চাইলেন কেন?'

'কারণ আমি জানতে চাই অসীম দত্ত সোমা মজুমদারকে মাসে মাসে কত টাকা দিতেন। দেখুন, অসীম দত্ত এবং তার ছেলে অনির্বাণ দত্ত মারা যাওয়া ফলে দীপশিখা এবং তার মা দুজনেরই লাভ হয়েছে। তাই উড়িষ্যার পুলিশ মনে করছে দীপশিখাই তার শ্বশুর এবং স্বামীকে খুন করেছে। এটা অসম্ভব নয়। কিন্তু যদি দেখি অসীম দত্ত দীপশিখার মা-কে বেশ মোটা একটা টাকা মাসোহারা দিতেন, যেটা অসীম দত্তর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল, তাহলে দীপশিখাই খুনগুলো করেছে কিনা তা নিয়ে সংশয় দেখা দেবে। খুন করার তো একটা বিরাট রিস্ক আছে। একান্তই দরকার না হলে কেউ খুন করে না। যদি এমনিতেই মাসে মাসে মোটা টাকা ঘরে আসে তা হলে আমি সোনার ডিম পাড়া হাঁসটাকে খুন করে খামোকা রিস্ক নিতে যাব কেন? তাই অসীম দত্তর কাছ থেকে কত টাকা মাসোহারা আসত সেটা জানা জরুরি।'

'বুঝতে পারছি।' সুভদ্র মাজিকে চিন্তামগ্ন দেখাল।

'আপনি তাহলে পাশবইগুলো দেখে আমাকে একটু জানাবেন কোন জায়গা থেকে সোমা মজুমদারের অ্যাকাউন্টে নিয়মিত টাকা আসত?'

'নিশ্চয় জানাব। কালকের মধ্যেই জানিয়ে দিচ্ছি।'

গাড়ি ট্র্যাফিক সিগনালের কবল থেকে উদ্ধার পেয়ে আবার চলতে শুরু করেছে।

(৩)

পরের দিন সকাল থেকেই আদিত্য সুভদ্র মাজির টেলিফোনের জন্যে অপেক্ষা করছিল, এমন সময় সায়ন্তনের ফোন।

'তোর খবরটা কী? সেই যে মেট্রোতে দেখা হল তারপর আর কোনও পাত্তাই নেই। একটা ফোন-টোন করবি তো।'

উত্তরে আদিত্য বলতে পারত, তুইও তো ফোন করিসনি। তার বদলে সে বলল, 'একটা কাজ নিয়ে খুব ঝামেলায় রয়েছি রে। তাই ফোন করতে পারিনি। তুই কেমন আছিস?'

'আমি তো ভালই আছি। আপিস যাচ্ছি, ইলাসট্রেশন করছি, বাড়ি ফিরছি, বউকে আদর করছি, আবার বউএর সঙ্গে লাঠালাঠিও হচ্ছে। এর থেকে আর কত ভাল থাকব?'

'তোর গলা শুনেই বুঝতে পারছি ভাল আছিস। তোর শরীরটা মনে হচ্ছে পুরোপুরি সেরে উঠেছে।'

'আমার শরীর এখন ফার্স্টক্লাস।'

'বেশ। বেশ। তা হলে তো একদিন বসে আড্ডা দেওয়া যেতে পারে।'

'আরে সেই জন্যেই তো ফোন করেছি। আমার সেই কলিগের কথা বলেছিলাম, মনে আছে? অর্ণব ব্যানার্জী?'

'মনে আছে। সেই ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্ট। তোর সঙ্গে কথা হবার পরে ওর দুএকটা লেখা পড়লাম।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তা, তোর সঙ্গে আলাপ করার জন্য অর্ণবের প্রবল আগ্রহ। রোজই বলে তোর কথা। তাই ভাবলাম তাড়াতাড়ি একটা আড্ডা অরগানাইজ করা দরকার। জাস্ট তিনজন, তুই, আমি আর অর্ণব। আজ তো শুক্রবার, উইকএন্ড। সন্ধেবেলা তোর সময় হবে?'

আদিত্য ভাবছিল। আজ সন্ধেবেলা কেয়া আর তার ইস্কুলের কয়েকজন দিদিমণি মিলে দক্ষিণ কলকাতার কোন একটা মলে গিয়ে কেনাকাটা করার প্ল্যান করেছে। কেয়া বলেছে, ফিরতে দেরি হবে। আজই সায়ন্তনের সঙ্গে আড্ডা দেবার প্রকৃষ্ট দিন।

'আজ সন্ধেবেলা ক'টার সময়?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'এই ধর ছ'টা?'

'কোথায় দেখা করব?'

'আমাদের অফিসটা তো তুই চিনিস। আমাদের অফিসের গলিটাতে ঢোকার ঠিক মুখে একটা নতুন বার হয়েছে। ভাল কাবাবও পাওয়া যায়। ওখানে বসা যাক। তুই মেট্রোতেই চলে আসতে পারবি। আসছিস তো তা হলে?'

'আসছি। ছ'টায় দেখা হচ্ছে।'

কেয়া স্কুলে বেরিয়ে যাবার পর আদিত্য বাড়ির মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারি করল। আসলে সে গভীরভাবে চিন্তা করছে। তার মাথায় এখন দুজোড়া খুন ঘুরছে। আদিত্য মোটামুটি নিশ্চিত, যে অসীম দত্তকে খুন করেছে সে অনির্বাণ দত্তকেও মেরেছে। তাই ওই দুটো খুনকে আদিত্য একটাই রহস্য হিসেবে দেখছে। অন্য রহস্যটা অবশ্যই সৈকত চৌধুরি খুন হওয়া সংক্রান্ত। সৈকত চৌধুরিকে যে মেরেছে সেই কি সৈকতের পার্টনার মণিময় গুপ্তকেও মেরেছে? সৈকত চৌধুরির খুনটাই তাকে বেশি ভাবাচ্ছে। সব থেকে বড় ধাঁধা, কেন সৈকত মৃত্যুর ঠিক আগে অত টাকার ইনশিয়োরেন্স করেছিল? তার কি মনে হয়েছিল কেউ তাকে মারার চেষ্টা করছে?... ফোন বাজছে। সুভদ্র মাজি।

'বলুন। সোমা মজুমদারের পাশবুক থেকে কিছু পেলেন?'

'হ্যাঁ, পেয়েছি। সোমা মজুমদারের একটা অ্যাকাউন্টে প্রত্যেক মাসে পঞ্চাশ হাজার করে টাকা জমা পড়ে। কম কথা নয়। পুরো পঞ্চাশ হাজার টাকা।'

'টাকাটা কে জমা দেয়?'

'মাসের প্রথমে সোমাই টাকাটা ক্যাশে জমা দেয়। তারপর সারা মাস ওখান থেকে টাকা উইথড্র করে। মাসের শেষে আর বিশেষ কিছু থাকে না।'

'তার মানে, টাকাটা অসীম দত্ত ক্যাশে সোমার হাতে তুলে দেন। মনে হচ্ছে টাকাটা দুনম্বরি।'

'পঞ্চাশ হাজারে তো ওদের ভালই চলে যাওয়া উচিত।'

'নিশ্চয় চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু ওদের বাড়ি ঘর দেখে তো সেটা মনে হল না।'

'এত টাকা ওরা করে কী তাহলে?'

'সেটা তো অ্যাকাউন্ট দেখে বলা শক্ত।'

'হয়তো রাহুল মজুমদারের চিকিৎসায় অনেকগুলো টাকা খরচ হয়ে যায়।' আদিত্য চিন্তা করে বলল। 'একটা ভাল নার্স রাখলেই তো মাসে-মাসে হাজার তিরিশেক বেরিয়ে যাবে।'

'একটা কথা। মাসে মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিশ্চয় অনেক টাকা, কিন্তু অসীম দত্ত এবং অনির্বাণ দত্ত মারা যাবার পর যে টাকাটা মা-মেয়ের হাতে আসবে সেটা কিন্তু অনেক অনেক বেশি। এতটাই বেশি যে তার জন্যে খুন করাই যায়।'

'মানলাম। তবে কি জানেন, খুন করতে গেলে এক ধরনের মানসিকতা লাগে। সেটা এদের আছে কিনা এখনও স্পষ্ট নয়।'

'আপনার কি তাহলে মনে হয় অন্য কেউ খুনগুলো করেছে?'

'জানি না। এখনও কিছুই জানি না।' আদিত্য অনিশ্চিত গলায় বলল। 'আচ্ছা, অন্য অ্যাকাউন্টগুলো থেকে কিছু বোঝা গেল?'

'না। অন্য দুটো অ্যাকাউন্টে অনেকদিন কোনও ট্রাঞ্জাকশান হয়নি। দুটোই ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্ট।'

'আর ফিক্সড ডিপোজিট?'

'এক লাখ করে দুটো ফিক্সড ডিপোজিট আছে। ব্যাস। আর কিছু নেই। কয়েকবার রিনিউড হয়েছে। কিন্তু বাড়েনি। কারণ, বছরে বছরে সুদটা তুলে নেওয়া হয়েছে। তাই বলছিলাম, সোমা মজুমদারের টাকার জোর একেবারেই নেই।'

সুভদ্র মাজির সঙ্গে কথাবার্তা সেরে অনেকক্ষণ চান করল আদিত্য। কলকাতা থেকে শীতটা চলেই গেছে বলা যায়। শীতের গোড়ায় কেয়া বাথরুমে একটা গিজার বসিয়েছিল। সেটা না চালিয়ে ঠান্ডা জলেই আদিত্য চান করল। শরীরটা জুড়িয়ে গেল। তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে মুছতে হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল মণিময়ের কালো টাকার কথা। সে-ও নিশ্চয় একটা মোটা টাকা তার বান্ধবীর জন্য খরচ করে।

আদিত্য আজ আর তার আপিসে যাবে না। লাঞ্চটা ফ্রিজে আছে, গরম করে নিতে হবে। কিন্তু তার আগে আর একটা ফোন করা দরকার। আদিত্য নম্বরটা লাগাল। কিশোরকুমার গান শোনাচ্ছেন, দুখী মন মেরে। গৌতম আবার কলার টিউন পাল্টেছে।

খানিকক্ষণ বাজার পর গৌতম ফোনটা ধরল। 'এই যে পোয়ারো সাহেব, খবরটা কি? বিয়ে করে একেবারে বেপাত্তা হয়ে গেলি?'

'কলার টিউনটা আবার কবে পাল্টালি?' গৌতমের কথার উত্তর না দিয়ে আদিত্য বলল।

'আরে এটা হল ফান্টুস সিনেমায় কিশোরকুমারের দুর্দান্ত গান। ক্লাস ইলেভেনে পড়ার সময় স্কুল কেটে দেখেছিলাম। নাজ সিনেমা হলে। ওখানে পুরোনো সিনেমাগুলো আবার আসত। এখন বোধহয় সিনেমা হলটা আর নেই। মনে দাগ কেটে বসে আছে। তা হঠাৎ সেদিন গানটার কথা মনে পড়ে গেল। অমনি কলার টিউনটা বদলে ফেললাম। তোর খবর-টবর বল।'

'আমি দুটো কেস নিয়ে ল্যাজেগোবরে হয়ে আছি। তোর সাহায্য দরকার। আচ্ছা, সিবিআই-এর সঙ্গে তোদের কেমন সম্পর্ক?'

'সিবিআই! ওরেব্বাবা! আমাদের সঙ্গে সিবিআই-এর সম্পর্ক এখন একেবারে তলানিতে। এসব পলিটিকাল ব্যাপার। সেন্টার-স্টেট খেয়োখেয়ি। তার মধ্যে পড়ে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। সিবিআই-এর সঙ্গে তোর কীসের দরকার? তুই তো সেই পুরীতে একটা মার্ডার কেস নিয়ে ব্যস্ত ছিলি?'

'আরে, সেটা অন্য একটা কেস। এটা আর একটা। এই কেসটাতে সিবিআই একজনের এগেন্সটে ইনভেস্টিগেট করছিল। কিছুদিন আগে সেই লোকটা খুন হয়। আমার জানা দরকার ওই খুন হওয়া লোকটার এগেন্সটে সিবিআই-এর ঠিক কী অ্যালিগেশন ছিল।'

'সেটা তো সিবিআই-ই বলতে পারবে। কিন্তু আমি সরাসরি জিজ্ঞেস করলে সিবিআই কিচ্ছু বলবে না। তোর যদি খুব দরকার হয় তা হলে অন্যভাবে ট্রাই করতে পারি। দিল্লিতে জানাশোনা বার করে তাদের দিয়ে বলাতে হবে। পারব কিনা জানি না। আর পারলেও অনেকটা সময় লেগে যাবে।'

'তুই একটু চেষ্টা করে দ্যাখ। যদি কিছু জানা যায়। তবে আউট অফ দ্য ওয়ে গিয়ে কিছু করার দরকার নেই। আমি কেসটার ডিটেলটা তোকে মেল করে দিচ্ছি।'

'ওক্কে। তুই ডিটেলটা পাঠিয়ে দে। কিছু জানতে পারলে তোকে জানাব। তবে, অ্যাজ আই সেড, চান্সেস আর স্লিম। আর শোন। একটা উইকএন্ডে তোদের নিয়ে কোথাও একটা খেতে যাবার ইচ্ছে আছে। আমি মালিনীর সঙ্গে কথা বলে তোকে ফোন করব।'

'ঠিক আছে। করিস। এখন রাখলাম।'

কলটা ডিসকানেক্ট করে আদিত্য বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। সে খুব আশা করেছিল গৌতমের কাছ থেকে সৈকত চৌধুরির বিরুদ্ধে সিবিআই কেসটার ব্যাপারে কিছু জানা যাবে।

বারের নাম 'হেলিওট্রোপ'। নামের সঙ্গে সংগতি রেখে ভিতরটা বেগুনি রঙের। ভিতরের আলোগুলো এমনিতেই কম, তার ওপর বেগুনি দেয়াল অনেকটা আলো খেয়ে নিয়েছে। তাই ভিতরটা বেশ অন্ধকার। বারের ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে আদিত্যর মনে পড়ে গেল বহুদিন আগে পড়া জীবনানন্দের লাইন 'আকাশ উঠেছে ভরে হেলিওট্রোপের মতো রূপে'।

একটা কোণ থেকে সায়ন্তন হাত তুলে তার উপস্থিতি জানাল। সে আর একজনের সঙ্গে বসে আছে। হাত না তুললে অন্ধকারে আদিত্য তাদের দেখতেই পেত না। অন্ধকারটা তার চোখে এখনও সয়ে আসেনি।

'বোস, বোস। দেরি হল কেন?' সায়ন্তন জিজ্ঞেস করল।

'ওই পুরোনো প্রবলেম। কোনও একটা স্টেশনে মেট্রো খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সেটা না সারানো অবধি সব মেট্রো বন্ধ। তুই বুঝবি। তুই তো মেট্রোতে যাতায়াত করিস।' আদিত্য বসতে বসতে বলল।

'হ্যাঁ, জানি তো। এই মেট্রো জিনিসটা চললে দারুণ, আর খারাপ হয়ে গেলে ওর থেকে খারাপ আর কিছু হয় না। দাঁড়া, আগে আলাপ করিয়ে দিই। আমার ইস্কুলের বন্ধু আদিত্য মজুমদার, এইস ডিটেকটিভ, আর এ হচ্ছে আমার কলিগ অর্ণব ব্যানার্জী, এইস ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টার। আদিত্য, অর্ণব কিন্তু তোর বিরাট ফ্যান।'

'আমিও অর্ণবের ফ্যান। আমি আপনার লেখা পেলেই পড়ে ফেলি। ভেরি থরো ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং।' আদিত্য অর্ণবের দিকে তাকিয়ে হাসল। অর্ণবও হাসল।

আদিত্যকে দেখে বেয়ারা এসে দাঁড়িয়েছে।

'বল কী খাবি?' সায়ন্তন আদিত্যর দিকে তাকাল।

'তোরা কী খাচ্ছিস?'

আদিত্য সায়ন্তনদের গেলাসের দিকে তাকাল। সায়ন্তন এবং তার সঙ্গীর গেলাসে জল-রঙা যে তরল পদার্থটা রয়েছে সেটা ভদকা বা জিন দুটোর যে কোনও একটা হতে পারে। কোনটা আদিত্য বুঝতে পারছিল না।

'আমরা বাকার্ডি খাচ্ছি। তুই বাকার্ডি খাবি?'

বাকার্ডির কথাটা আদিত্য ভাবেনি। সে বলল, 'নাঃ, রাম জিনিসটা খেলেই আমার পেটের গণ্ডগোল হয়। আমি বরং বিয়ার খাই।'

'এই সন্ধেবেলা বিয়ার খাবি? তোর সেই ক্লাসিক্যাল পছন্দগুলো বদলে গেল কেন? সেই সান-ডাউনের পর হুইস্কি, দুপুরে পিঙ্ক জিন কিংবা জিন অ্যান্ড টনিক, রাত্তিরে ডিনারের পর ব্র্যান্ডি বা কনিয়াক?' সায়ন্তন মুচকি হাসল। বারের ভেতরের অন্ধকারটা আদিত্যর চোখে সয়ে আসছে।

আদিত্যর মনে করতে পারল না ঠিক কবে সে তার এরকম সাহেবি পছন্দের কথা সায়ন্তনকে জানিয়েছিল। সম্ভবত সায়ন্তন ওর পেছনে লাগছে।

'আজকাল আমার হুইস্কি, পিঙ্ক জিন, বিয়ার, কনিয়াক কিছুই জোটে না রে। যেটা জোটে সেটা হল সান-রাইজ থেকে সান-ডাউন পর্যন্ত অনেকবার চা, কখনও কফি, আর সান-ডাউনের পরেও তাই।' আদিত্যও হাসল।

সাহেবরা অর্ডার না দিয়ে কথাবার্তা বলছে দেখে বেয়ারা উধাও হয়ে গিয়েছিল। দু'প্লেট কাবাব নিয়ে সে ফিরে এসেছে। চিকেন রেশমি এবং চিকেন মালাই। এগুলো নিশ্চয় আদিত্য আসার আগেই অর্ডার দেওয়া হয়েছিল। বেয়ারা বিয়ারের অর্ডার নিয়ে চলে গেল।

'তোর খুব কাজের চাপ বলছিলি না? কোনও ইন্টারেস্টিং অ্যাসাইনমেন্ট, নাকি ডিভোর্স মামলার প্রমাণ সংগ্রহের কাজ?' সায়ন্তন কথাবার্তা শুরু করল। 'আসলে, কী জানিস তো, তোর কাজটা আমাদের খুব এক্সাইটিং লাগে। অর্ণব আর আমার দুজনেরই লাগে। তাই শুনতে ইচ্ছে করে। অবশ্য কিছু কাজে নিশ্চয়

কনফিডেন্সিয়ালিটি মেনটেন করতে হয়। সেরকম কিছু হলে আমাদের বলতে হবে না।' সায়ন্তন বাকার্ডির গেলাশে চুমুক দিল।

আদিত্য উত্তর দেবার আগেই বিয়ার এসে গেছে। বেয়ারা গ্লাসে বিয়ার ঢেলে অর্ধেক ভর্তি বোতলটা টেবিলে রেখে দিল।

সায়ন্তন বলল, 'বিয়ার দেখলেই আমার দুটো লাইন মনে পড়ে যায়— আমি আর গুরুদেব দুজন ইয়ার/ বিনির বাড়িতে যাই খাইতে বিয়ার—বলত কার লেখা?' সায়ন্তন মিটিমিটি হাসছে। তার দেখাদেখি অর্ণবও হাসছে।

ভাগ্যক্রমে প্রশ্নের উত্তরটা আদিত্য জানত। সে মুচকি হেসে বলল, 'রসরাজ অমৃতলাল বসু।'

'ব্রাভো, ব্রাভো। এই না হলে আমাদের আদু!' সায়ন্তন চেঁচিয়ে উঠল। তার গলার আওয়াজে কেউ কেউ পেছন ফিরে দেখছে।

আদিত্যর মনে হল সায়ন্তনের সামান্য নেশা ধরেছে। সে বলল, 'তোরা কখন এসেছিস?'

'আমরা আজ পাঁচটার সময় অফিস থেকে বেরিয়েই এখানে ঢুকে পড়েছি। দু'রাউন্ড হয়ে গেছে। তৃতীয় রাউন্ড চলছে। আচ্ছা বল তো, এখানে, মানে এই দুটো লাইনে, গুরুদেব বলতে কবি কাকে বোঝাচ্ছে আর বিনিই বা কে?'

'গুরুদেব হলেন গিরিশ ঘোষ আর বিনি, বলাই বাহুল্য, নটী বিনোদিনী।' আদিত্য নিচু গলায় বলল।

'সুপার্ব, সুপার্ব। দশে দশ, একশ তে একশ, হাজারে হাজার।' সায়ন্তন আবার গলা চড়াল। সামনের টেবিল থেকে আবার সেই লোকগুলো ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে।

অস্বস্তির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য অর্ণব বলল, 'সায়ন্তনদা আপনাকে আপনার কাজের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছিলেন। কথাটা চাপা পড়ে গেল। আপনার কেসগুলো খুব জানতে ইচ্ছে করে কিন্তু।' অর্ণব ব্যানার্জীর কথা বলার ভঙ্গিটা খুব পরিশীলিত।

'একটা কথা কিন্তু সায়ন্তন ঠিক বলেছে। আমার বেশিরভাগ কেসই খুব আনইনটারেস্টিং। ওই স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া, একজন অন্যজনের বিরুদ্ধে মামলা করবে, আমাকে প্রমাণ জোগাড় করে দিতে হবে। আবার কিছু ফ্রড কেস পেয়েছি, ব্যাঙ্ক-ট্যাঙ্ক থেকে। সেগুলোও বেশ বোরিং। বোর না হয়ে ডকুমেন্টগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে সত্যটা আবিষ্কার করতে হবে। কাজটা সোজা নয়, কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিংও নয়। সত্যিকারের ইন্টারেস্টিং কেস খুব বেশি পাইনি। তবে এখন দুটো খুনের মামলা ইনভেস্টিগেট করছি। ফেয়ারলি ইন্ট্রিগিং।'

আদিত্য থামল। বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিল। একটা কাবাব তুলে মুখে পুরল।

'সেই গল্পগুলো একটু বল না। ভাল গল্প না হলে আড্ডা জমে?' সায়ন্তন কিছুটা শান্ত হয়েছে।

'কেস দুটো খুব কনফিডেন্সিয়াল বলা যায় না। দুটোর কথাই এক্সটেনসিভলি মিডিয়াতে রিপোর্টেড হয়েছে। দ্বিতীয়টা প্রথমে বলছি। বেশ রিসেন্ট ঘটনা। গত সপ্তাহে পুরীতে তাঁর নিজের রিসর্টে খুন হয়েছেন অসীম দত্ত আর তার একদিন পরে তাঁর ছোট ছেলে অনির্বাণ দত্ত। অসীম দত্তকে আগেও একবার খুন করার চেষ্টা হয়েছিল। সেটার ব্যাপারে তদন্ত করতে অসীম দত্ত আমাকে নিয়োগ করেছিলেন। বলেছিলেন, তিনি যদি খুন হন তাহলে আমি যেন আমার ইনভেস্টিগেশন চালিয়ে যাই। আমি সেটাই করছি। এর বেশি কিন্তু আর কিছু বলতে পারব না। কারণ আমি নিজেই ব্যাপারটা এখনও বুঝতে পারিনি।'

'অসীম দত্ত খুনের ব্যাপারটা তো রোজই কাগজে বেরোচ্ছে। কিছু কাগজ লিখেছে, পুলিশ নাকি শিগগিরই কাউকে এ-ব্যাপারে অ্যারেস্ট করবে। কেসটা নাকি সলভড হয়ে গেছে। আপনার কি মনে হয় এটা ভুল খবর?' অর্ণব তার সাংবাদিকের টুপিটা পরে নিয়েছে।

'জানি না ভুল খবর কিনা। এটুকু বলতে পারি, আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর এখনও পাইনি। কিন্তু দয়া করে এটা আপনাদের কাগজে লিখবেন না। আমার কথা কিছুই লিখবেন না প্লিজ।'

'না, না। লেখার প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া আমি তো কেসটার দায়িত্বেও নেই।' অর্ণব আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে বলল।

'আর অন্য কেসটা যেটা তুই ইনভেস্টিগেট করছিস?' এবার সায়ন্তনের গলা।

'সেটা আরও অদ্ভুত। সৈকত চৌধুরি বলে মাস দেড়েক আগে একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার খুন হয়েছিল। খুন হবার আগে বউকে নমিনি করে সে একটা অবিশ্বাস্য বেশি টাকার ইনশিয়োরেন্স করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই ইনশিয়োরেন্স কোম্পানি প্রমাণ করার চেষ্টা করছে টাকার লোভে বউটাই সৈকত চৌধুরিকে খুন করেছে। যদি প্রমাণ করতে পারে তাহলে আর তাদের টাকাটা দিতে হবে না। বউটার আবার একটা পুরুষ বন্ধু আছে। ইনশিয়োরেন্স কোম্পানির গোয়েন্দা প্রমাণ করার চেষ্টা করবে সেই পুরুষ বন্ধুটাও এর মধ্যে রয়েছে। এখন, সৈকত চৌধুরির বউ অনিতা চৌধুরি আমার কাছে সাহায্যের জন্যে এসেছিল। তাই আমি কেসটার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি। ইনশিয়োরেন্স কোম্পানির সহজ ব্যাখ্যা আমি মানতে পারছি না।

দুটো জিনিস কেসটাকে জটিল করে দিয়েছে। এক, আমি বুঝতে পারছি না সৈকত অত টাকার ইনশিয়োরেন্স করতে গেল কেন? দুই, সৈকতের পার্টনার মণিময়কেও কেউ খুন করে পুকুরে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। কিছুদিন আগে সেই বডি পাওয়া গেছে। আমার স্থির বিশ্বাস দুটো খুনের মধ্যে সম্পর্ক আছে। কিন্তু আসল রহস্যটা আমি কিছুতেই ধরতে পারছি না।'

অর্ণব হাঁ করে আদিত্যর কথা শুনছিল। আদিত্যর কথা শেষ হতে সে ব্যগ্র হয়ে বলল, 'এই সৈকত চৌধুরি কি গুপ্ত অ্যান্ড চৌধুরি সিভিল কন্সট্রাকশানস-এর পার্টনার ছিল?'

আদিত্য খানিকটা অবাক হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ছিল তো। আপনি এর কথা জানেন নাকি?'

'খানিকটা জানি। একে নিয়ে বছর খানেক আগে আমি একটা লম্বা আর্টিকাল লিখেছিলাম। তিনটে পার্টে বেরিয়েছিল।'

'লেখাটা আমার নজর এড়িয়ে গেছে। সৈকত চৌধুরির ব্যাপারটা আপনি যেটুকু জানেন আমাকে বলবেন? আমার তা হলে খুব উপকার হয়।' আদিত্যর গলায় প্রায় অনুনয়।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি যেটুকু জানি বলছি। দাঁড়ান একটু গুছিয়ে নিই।'

বেয়ারা এসে আবার দাঁড়িয়েছে। আরও এক রাউন্ড বাকার্ডি অর্ডার দেওয়া হল। সঙ্গে আরও কিছু কাবাব। আদিত্যর সেই এক বোতল বিয়ার এখনও শেষ হয়নি।

'আমার যতদূর মনে পড়ছে, কয়েক বছর আগে ন্যাশানাল হাইওয়ে ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অজয় নদীর ওপর একটা ব্রিজ বানানোর সিদ্ধান্ত নেয়। জায়গাটার নাম সিমজুড়ি। চিত্তরঞ্জনের কাছে, অজয় নদী যেখানে ঝাড়খণ্ড থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসে ঢুকেছে, সেখানে। ব্রিজটা তৈরি হলে, ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গকে একটা নতুন রাস্তা দিয়ে জুড়ে দেওয়া যাবে। নিয়ম মাফিক টেন্ডার করে এই ব্রিজটা তৈরি করার বরাত দেওয়া হয় গুপ্ত অ্যান্ড চৌধুরি সিভিল কন্সট্রাকশানসকে। বেশ বড় টাকার কাজ। কিন্তু টাকার থেকেও সৈকত চৌধুরির কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয় ছিল কাজটার ইঞ্জিনিয়ারিং চ্যালেঞ্জ।'

আদিত্যর বিয়ারের বোতলটা অবশেষে ফুরিয়েছে। সায়ন্তন হাত নেড়ে বেয়ারাকে ডাকল। আরেক বোতল বিয়ারের অর্ডার নিয়ে বেয়ারা চলে গেল।

'আমি টেকনিকাল দিকটা ভাল বলতে পারব না, কিন্তু ইনভেস্টিগেট করতে গিয়ে জানতে পেরেছিলাম ব্রিজটা বানানো খুব সহজ কাজ ছিল না। বিশেষ করে একটা জায়গায় ব্রিজটাকে বাঁক নিতে হবে। সেই জায়গাটায় ভারসাম্য রাখাটা ছিল বিশাল চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জটা সৈকত চৌধুরির খুব এক্সাইটিং মনে হয়েছিল। অন্তত গুপ্ত অ্যান্ড চৌধুরি সিভিল কন্সট্রাকশানস-এ সৈকতের সহযোগী ইঞ্জিনিয়াররা আমাকে এটাই বলেছিল। বলে রাখা দরকার, ন্যাশানাল হাইওয়ে অথরিটির সঙ্গে ডিলটা সই করেছিল সৈকত। তার

পার্টনার মণিময় গুপ্ত পুরোটাই নেপথ্যে ছিল, যদিও টাকা-পয়সার হিসেব থেকে শুরু করে, কন্ট্রাক্টার নিয়োগ, তাদের বিল চেক করা, পেমেন্ট করা সবটাই ছিল মণিময়ের হাতে।'

আদিত্যর বিয়ার এসে গেছে। সঙ্গে দু'প্লেট কাবাব। বেয়ারা গ্লাসে বিয়ার ঢেলে দিতে যাচ্ছিল। আদিত্য তাকে ইঙ্গিতে জানাল দরকার নেই, তার পানীয় সে নিজেই ঢেলে নেবে।

'পাঞ্চলাইন হল, তৈরি হবার কয়েকদিনের মধ্যেই ব্রিজটা ভেঙে পড়ে। সৌভাগ্যক্রমে, তখনও ব্রিজটা সাধারণ মানুষের যাতায়াতের জন্যে চালু হয়নি। হলে বড় রকমের অ্যাক্সিডেন্টের সম্ভাবনা ছিল। ঠিক হয়েছিল এক সপ্তাহ পরে কেন্দ্রিয় মন্ত্রী এসে ব্রিজটা উদ্বোধন করার পর ওটা চালু করা হবে। এক দিক থেকে ভাল যে তার আগেই দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল। কিন্তু একটা দুর্ভাগ্যের দিকও ছিল। তখন শীতকাল, অজয় নদীতে জল নেই, শুধু বালি। বালির ওপর, সদ্যনির্মিত ব্রিজের নীচে, তাঁবু খাটিয়ে মিস্ত্রিরা পরিবার নিয়ে থাকছিল। ব্রিজটা মিস্ত্রিদের সেই অস্থায়ী থাকার জায়গাগুলোর ওপর ভেঙে পড়ল। ফলে আটজনের মৃত্যু হল, আর জনা কুড়ি আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হল। তাদের মধ্যেও তিনজন পরে মারা যায়। এগারজন নিহতর মধ্যে তিনজন মহিলা, দুজন শিশু।'

আদিত্য উত্তেজিত হয়ে সিগারেট ধরাতে চাইছিল। কিন্তু বার-রেস্টোরেন্টে আজকাল সিগারেট খেতে দেয় না। অগত্যা বিয়ারের গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে আদিত্য বলল, 'তারপর?'

'প্রথমে পুলিশ এবং পরে সিবিআই এটা নিয়ে বিস্তারিত তদন্ত করেছিল। আমি যতদূর জানি সিবিআই-এর তদন্ত এখনও শেষ হয়নি, তবে সাময়িকভাবে বন্ধ আছে। যাইহোক, তদন্তে এটা প্রমাণিত হয়েছিল যে ব্রিজটার ডিজাইনে বিন্দুমাত্র ত্রুটি ছিল না, উল্টে তদন্তকারি ইঞ্জিনিয়াররা সকলেই ব্রিজটার প্রভূত প্রশংসা করেছিল। কিন্তু স্যাংশানড প্ল্যান অনুযায়ী ব্রিজটা তৈরি হয়নি। তাছাড়া যে মালমশলা দিয়ে ব্রিজটা বানানো হয়েছিল সেটাও ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। বস্তুত, তদন্তকারি অফিসাররা এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে নিম্নমানের মালমশলা দিয়ে ব্রিজ বানিয়ে গুপ্ত অ্যান্ড চৌধুরি সিভিল কন্সট্রাকশানস অসাধু উপায়ে একটা বিরাট টাকা উপার্জন করেছে। কোম্পানিটা তো ব্ল্যাক লিস্টেড হয়ে গেল। এবং যে কনট্রাকটার ব্রিজটা বানিয়েছিল, তার কোম্পানিও রেহাই পেল না।'

'কন্ট্রাকটারের কোম্পানিটার নাম মনে আছে?'

'হ্যাঁ, নামটা সম্ভবত দত্ত কনস্ট্রাকশানস।'

নামটা হজম করতে আদিত্যর একটু সময় লাগল। তার মুখ দেখে সায়ন্তন বলল, 'কী ব্যাপার? তুই এদের চিনিস নাকি?'

'কিছুটা চিনি। হুঁ, তারপর কী হল?'

'আমাকে এই পুরো এপিসোডটা নিয়ে লেখার জন্যে বলা হল। আমি ইনভেস্টিগেট করে দেখলাম ঘটনার পুরো দায়টা সৈকত চৌধুরির ওপর চাপানো হচ্ছে, যেহেতু সমস্ত কাগজপত্রে শুধু তার সই রয়েছে। এমনকি কনট্রাকটারও আইনের ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে গেল, কিন্তু সৈকত বেরোতে পারল না। সিবিআই তার জীবন অতিষ্ট করে তুলল। তার পেশাদার সুনাম ভূলুণ্ঠিত হল। সব থেকে বড় কথা, যারা সৈকতকে চেনে তারা সকলেই বুঝতে পারছিল যে সৈকত আসল দোষী নয়, তাকে ফাঁসানো হয়েছে। এবং কনট্রাকটারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তাকে ফাঁসিয়েছে তার পার্টনার মণিময় গুপ্ত। কিন্তু কিছু করার ছিল না। সব প্রমাণ সৈকতের বিরুদ্ধে। আমি এই স্ক্যামটা নিয়ে লিখলাম। সৈকত যে আসল দোষী নয় সেটাও লিখলাম। কিন্তু আসল দোষীর নাম লিখতে পারলাম না, যেহেতু আমার কাছে কোনও প্রমাণ ছিল না।'

'আপনি সৈকত চৌধুরির সঙ্গে দেখা করেছিলেন?'

'একাধিকবার দেখা করেছিলাম। অনেকক্ষণ কথা বলেছিলাম। সৈকত ভীষণ ডিপ্রেসড থাকত। দেখুন, একটা ব্যাপার আমার ভীষণ পাজলিং লাগে। সৈকতের যা মানসিক অবস্থা ছিল তাতে সে যদি আত্মহত্যা

করত, আমি অবাক হতাম না। কিন্তু সে নিজেই খুন হয়ে গেল। এটা কেন?'

'এই মুহূর্তে জানি না। হয়ত শিগগির জানতে পারব'। আদিত্য অন্যমনস্কভাবে বলল। তারপর একটু থেকে বলল, 'আপনি আমার অশেষ উপকার করলেন। আপনাকে আর একটা অনুরোধ করব। আপনার ওই লেখাটার একটা কপি আমাকে দিতে পারবেন?'

'অবশ্যই পারব। আপনার মেল আইডিটা টেক্সট করে দিন, বাড়ি গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনাকে একটা মিসড কল দিই?'

(৪)

'তোমাদের হানিমুন কেমন কাটল?' মালিনী কেয়াকে জিজ্ঞেস করল। সে আজকাল সুন্দর বাংলা বলে।

মালিনীর প্রশ্নে কেয়া ঈষৎ উত্তেজিত। বলল, 'হানিমুন আবার কী? আদিত্য কাজে গিয়েছিল, আমি সঙ্গে গিয়েছিলাম। ওখানে গিয়ে বিরাট গণ্ডগোল হল। রিসর্টের মধ্যে দু-দুটো খুন। ফলে আদিত্য সারাদিন পুলিশের সঙ্গে ইন্টারোগেশনে ব্যস্ত। আমি ঘরের মধ্যে একা একা বোর হয়েছি। একে হানিমুন বলে?'

'মন্দিরে গেছিলে?'

'অনেক কষ্টে আদিত্য একদিন সময় করতে পেরেছিল। সেদিন একবার মন্দিরে গিয়েছিলাম।'

'আর কোথাও যাওনি? কোনার্ক, চিলকা, উদয়গিরি?'

'কোনারক আর চিলকা গিয়েছিলাম। কিন্তু আদিত্য সঙ্গে যেতে পারেনি। ওখানে গিয়ে একটা এলডারলি কাপল-এর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। তাদের সঙ্গে গিয়েছিলাম।'

'কেয়ার কথায় মনে পড়ে গেল।' আদিত্য গৌতমের দিকে তাকিয়ে বলল। 'তোদের আর্কাইভে নিশ্চয় পুরোনো নকশালদের ফাইলগুলো আছে। তাদের দুজনের সম্বন্ধে জানতে পারলে ভাল হত। একটু জেনে দিতে পারবি? একজনের নাম প্রদীপ চক্রবর্তী। সিক্সটিজে প্রেসিডেন্সি কলেজে ফিজিক্স পড়তেন। অন্যজন রাখি চক্রবর্তী, প্রদীপের স্ত্রী, ক্লাসমেট এবং কমরেড। এদের দুজনের সঙ্গেই কেয়া কোনারক আর চিলকা গিয়েছিল।'

'প্রদীপদা, রাখিদিকে নিয়ে পড়লে কেন? ওরা তো ওদের অতীত নিয়ে কোনও কথাই বলে না। তোমার কীসের দরকার?' কেয়া ঝাঁজিয়ে উঠল।

'ওই নিছক কৌতূহল। তুমি তো জান, নকশাল আন্দোলন নিয়ে আমার একটা ইন্টারেস্ট আছে। আমার জন্মের আগেই আন্দোলন খতম হয়ে গেছে। রক্তমাংসের কোনও নকশাল নেতাকে এত কাছ থেকে আগে দেখিনি। তাই কৌতূহল আর কী।' আদিত্য খানিকটা মিনমিনে গলায় বলল।

'তোর কি সিরিয়াসলি ওই দুজনের ফাইলটা দরকার নাকি ক্যাজুয়ালি বলছিস? আর তুই ঠিক জানিস তো ওদের নামে ফাইল আছে?' গৌতম সন্দেহের গলায় বলল।

'না, না। সত্যিই দরকার। আমি একদিন ফোন করে তোর অফিসে চলে যাব। গিয়ে দেখে আসব। আর ফাইল মনে হয় ওদের নামে আছে, কারণ দু'জনেই এক সময় জেলে ছিল।'

'হুঁ। তাহলে তো ফাইল থাকবে।'

মালিনী আর গৌতম আদিত্যদের বাইরে খাওয়াতে এনেছে। বালিগঞ্জ সারকুলার রোডে একটা নতুন গোয়ান রেস্টোরান্ট হয়েছে, সেখানে। আদিত্য শুনেছিল, এখানে একেবারে অথেন্টিক গোয়ান ক্যাথলিকদের কুইজিন পাওয়া যায়। সাবেকি পর্তুগিজ রান্নার সঙ্গে পশ্চিম উপকূলের কঙ্কন রান্নার মিশেল। গৌতমরা আগে দুবার খেয়েছে, আদিত্য আর কেয়া এই প্রথম। এই মুহূর্তে ক্ষুধা-উদ্রেককারি দুটি পদ টেবিলে শোভা পাচ্ছে —ক্রকেট এবং চোরিজো। প্রথমটি দেলখোশ কেবিনের মটন চপের মতো দেখতে, তবে খেতে অন্যরকম।

গোয়ান ক্যাথলিকরা এটির ভেতরে মিন্সড বিফ বা কুচোনো গোমাংস ব্যবহার করে। কিন্তু হিন্দুবাদীদের বৈরিতার ভয়ে এই রেস্টোরান্ট গোমাংসের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। ফলে তাদের মিন্সড বিফের বদলে মিন্সড ল্যাম দিয়ে পদটি বানাতে হয়েছে। দ্বিতীয় পদটি গোয়ান কায়দায় প্রস্তুত পোর্ক সসেজ।

'মেন ডিশ অর্ডার দেবার সময় ভিণ্ডালু এবং সাবেকি গোয়ান ফিশ কারি অর্ডার দিতেই হবে। আমরা আগে খেয়েছি। দুটোই অসাম।' মালিনী একটা ক্রকেট নিজের প্লেটে তুলতে তুলতে বলল।

'এরা ফিশ কারিতে নিশ্চয় তেঁতুল এবং নারকোল দেয়?' কেয়া মালিনীকে জিজ্ঞেস করল।

'সে তো অবশ্যই দেয়। কিন্তু তা ছাড়াও নানারকমের স্পাইস দেয়। দুর্দান্ত টেস্ট।'

'ভিণ্ডালুতে কিন্তু আলু নেই। এরা পোর্ক দিয়ে ভিণ্ডালু করে।' গৌতম তার বিদ্যে জাহির করে বলল। 'আর সেটাই করার কথা। পর্তুগিজ ভাষায় ভিনিয়া কথাটার অর্থ ওয়াইন, ডি মানে অফ এবং আলু মানে গারলিক অর্থাৎ রসুন। সব মিলিয়ে, ভিণ্ডালু। অর্থাৎ ওয়াইন এবং রসুনে ম্যারিনেট করা মাংস।' কথাটা বলে একটা 'কেমন দিলুম' ভাব নিয়ে গৌতম সবার মুখের দিকে তাকাল।

সবাই অবাক। বিশেষ করে মালিনী। 'ডিড ইউ সারেপটিশাসলি স্টার্ট লার্নিং পোর্টুগিজ?' বিস্ময়ে তার মুখ দিয়ে ইংরেজি বেরিয়ে গেছে।

গৌতম এবার হেসে ফেলেছে। 'তোমাদের ইমপ্রেস করব বলে আজ সকালে ইন্টারনেটে ভিণ্ডালুর মানেটা দেখে এসেছি। জানতাম ওটা অর্ডার দেওয়া হবেই।' গৌতম তার বউ-এর দিকে তাকিয়ে বলল।

ঘণ্টা দেড়েক পরে যখন মেন ডিশ খাওয়া হয়ে গেছে, ডেসার্ট আসব আসব করছে, তখন আদিত্য গৌতমকে জিজ্ঞেস করল, 'তুই একটু খোঁজ নিয়ে তিনজনের কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট সম্বন্ধে আমাকে একটু জানাতে পারবি? তিনজনই কলকাতা পুলিশের। একজনের নাম অচিন্ত্য সাহা, গড়িয়াহাট থানায় ইন্সপেক্টর, ইনি সৈকত চৌধুরির কেসটার চার্জে আছেন। দ্বিতীয় জনের নাম সুভদ্র মাজি, ইনি বালিগঞ্জ থানার ইন্সপেক্টর, অসীম দত্তর ওপর প্রথম যে অ্যাটেম্পটটা হয়েছিল, সেটা ইনভেস্টিগেট করছেন। এদিক থেকে অসীম দত্ত এবং অনির্বাণ দত্তের খুনগুলোও। আর তৃতীয় জন বিপ্লব সমাদ্দার। গহিয়াহাট থানা থেকে রিটায়ার করেছেন। রিটায়ার করে একটা বিদেশি ইনশিয়োরেন্স কম্পানিতে চাকরি করেন। কেন এদের সম্বন্ধে জানতে চাইছি, তোকে পরে বিস্তারিত বলব।'

'নামগুলো আমার মনে থাকবে না। তুই হোয়াটস অ্যাপ করে দিস।'

আদিত্য লালবাজারে গৌতমের ঘরে বসে পুরোনো ফাইল থেকে নোট নিচ্ছিল।

প্রদীপ চক্রবর্তী— দমদম সেন্ট্রাল জেলে বিচারাধীন (১৯৭১-৭৭) নক্সাল নেতা। এর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল মূলত চারটে। (১) ১৯৭০ সালের জুন মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজের ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রি ল্যাবোরেটারি ভাঙচুর করা। (২) ১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে বিরুদ্ধ দল সিপিএম-এর এক কর্মিকে (নাম সন্দীপন মাইতি) গুলি করে খুন। (৩) ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে এক ইন্সপেক্টার (নাম সমর সরকার)-কে চার-পাঁচজন মিলে খুন করে তার বন্দুক ছিনতাই করেছিল। দলনেতা প্রদীপ চক্রবর্তী। (৪) ১৯৭১ সালের মে মাসে পুরুলিয়ায় তিনজন জোতদার খুনের সঙ্গে যুক্ত। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে বরাহনগরের হাইড-আউট থেকে গ্রেপ্তার। ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকারের বন্দিমুক্তি নীতির ফলে জেল থেকে মুক্ত এবং অভিযোগ থেকে অব্যাহতি। পরবর্তীকালে নক্সালদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছে কিনা জানা নেই।

রাখি চক্রবর্তী— আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বিচারাধীন (১৯৭১-৭২) নকশাল নেত্রী। অভিযোগ, ১৯৭০ সালের জুন মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজের ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রি ল্যাবোরেটারি ভাঙচুর করা এবং নিষিদ্ধ বিপ্লবী কাগজপত্র, পুস্তিকা সঙ্গে রাখা ও বিলি করা। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে প্রদীপ চক্রবর্তীর সঙ্গে গ্রেপ্তার,

১৯৭২এর জুন মাসে জামিনে মুক্তি। পরে ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বন্দিমুক্তি নীতির ফলে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি। ১৯৭৯ সালে প্রদীপ চক্রবর্তীর সঙ্গে বিয়ে। পুলিশের ধারণা, রাখি চক্রবর্তী নকশালদের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখে না।

আদিত্য সোফায় বসে নোট নিচ্ছিল। গৌতম তার টেবিলে বসে ফাইল দেখছে। নোট নেওয়া শেষ করে আদিত্য বলল, 'চা খাওয়াবি না?'

'এই রে, চা-টা তো বলতেই ভুলে গেছি। আগে মনে করাবি তো।' গৌতম বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকল।

কিছুক্ষণ বাদে চা আসার পর গৌতমও সোফায় এসে বসেছে। আদিত্য চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'তোদের চা-টা কিন্তু সত্যিই ভাল।'

'লালবাজারের উল্টোদিকে একটা বিখ্যাত চা-পাতার দোকান আছে। তারা সাপ্লাই দেয়। পুলিশের বড় কর্তাদের ঠকাবার সাহস তাদের নেই।' গৌতমও চায়ের কাপে চুমুক দিল।

হঠাৎ মনে পড়ে যাবার ভঙ্গি করে আদিত্য বলল, 'তোকে সেই তিনজন পুলিশ অফিসারের সম্বন্ধে জানার জন্যে রিকোয়েস্ট করেছিলাম, মনে আছে? তাদের ইন্টারনাল রিপোর্টগুলো পাওয়া গেছে?'

'গেছে, গেছে। আদিত্য মজুমদার হুকুম করলে সব পাওয়া যাবে। দাঁড়া, বলছি।'

গৌতম সোফা থেকে উঠে তার টেবিলে গিয়ে ডাঁই করা ফাইলের ভেতর থেকে খুঁজে খুঁজে একটা কাগজ বার করে আবার সোফায় এসে বসল।

'মন দিয়ে শোন। প্রথমে অচিন্ত্য সাহা। অচিন্ত্য সাহার রেকর্ড এমনিতে ভালই ছিল, কিন্তু বছর দুয়েক আগে একটা করাপশান কেস-এ ওর নামটা জড়িয়ে গিয়ে দুধে একটু চোনা পড়ে গেছে। তবে শেষপর্যন্ত কিছুই প্রমাণিত হয়নি। অচিন্ত্য সাহা সসম্মানে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেয়ে গেছে। অতএব ও এখন ক্লিন।'

'কী ধরনের করাপশান চার্জ?'

'গড়িয়াহাটের মোড়ে ড্রাগ পেডলারদের একটা গ্যাং অপরেট করত। তারা গড়িয়াহাট থানার কাউকে কাউকে নিয়মিত হপ্তা দিত। অভিযোগ উঠেছিল, যারা টাকা পেত তাদের মধ্যে অচিন্ত্য সাহাও ছিল। গ্যাংটা বাস্টেড হবার পর কিন্তু টাকা পেত বলে যাদের নাম জানা গিয়েছিল তাদের মধ্যে অচিন্ত্য সাহার নাম ছিল না। ফলে অচিন্ত্য বেকসুর খালাস। অনেকেই মনে করে অচিন্ত্য সাহার কোনও শত্রু ইচ্ছে করে ড্রাগ পেডলারদের সঙ্গে ওর নামটা জড়িয়ে দিতে চেয়েছিল।'

'অন্য দুজন?'

'হ্যাঁ। পরের নাম বিপ্লব সমাদ্দার। এ একেবারে নাম-কাটা সেপাই। তবে অতি ধূর্ত। এর নামে বেশ কয়েকটা অ্যালিগেশন ছিল। কিন্তু কোনওটাই ঠিক মতো প্রমাণ করা যায়নি। বিপ্লব সমাদ্দার ভলান্টারি রিটায়ারমেন্ট নিয়ে এখন বেশি মাইনেতে প্রাইভেট কোম্পানির কাজ নিয়েছে।'

'বাকি রইল সুভদ্র মাজি।' আদিত্য মনে করিয়ে দিল। সে খুব মন দিয়ে শুনছে।

'ঠিক। বাকি রইল সুভদ্র মাজি। সুভদ্র মাজির রেকর্ড যাকে বলে ইম্পিকেবল। অনায়াসে বলা যায়, সুভদ্র আমাদের ফোর্সের একটা অ্যাসেট। দুবার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। ওর অনেস্টি নিয়ে কোনও প্রশ্ন তো ওঠেই না, ওর এফিশিয়ান্সিও প্রশ্নাতীত। সংক্ষেপে এই হল তিনজন অফিসারের কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট।' গৌতম চায়ের কাপে আরেকটা চুমুক দিল।

'আর ওই বলেছিলাম না, সিবিআইতে যদি কাউকে চেনা বার করা যায়। সেটা কি সম্ভব হয়েছে?' আদিত্য একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল।

'ঠিক সম্ভব এখনও হয়নি, তবে আমাদের ব্যাচমেট একজনকে বার করতে পেরেছি যে এখন সিবিআইতে আছে। আমার সঙ্গে এক সময় ভালই খাতির ছিল। কিন্তু ওর ফোন নম্বরটা এখনও জোগাড় করতে পারিনি। চেষ্টাও ছাড়িনি। হয়তো তোর কাজটা হয়ে যাবে, কিন্তু সময় লাগবে।' কথাটা শেষ করে গৌতম চায়ের তলানিটুকু গলায় ঢেলে দিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

(১)

মণিময় গুপ্তর বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করাটা দরকার হয়ে পড়েছে। কথা ছিল অচিন্ত্য সাহা ভদ্রমহিলার সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আদিত্যকে জানাবে। কিন্তু অচিন্ত্য সাহা অন্য কাজে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যে তাকে ধরাই যাচ্ছে না। ফোন করলে বলছে, এখন বড্ড চাপ যাচ্ছে। আর চার-পাঁচদিনের মধ্যে ফ্রি হয়ে গিয়ে ভদ্রমহিলাকে ফোন করবে।

কেয়া স্কুলে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। একটু আগে স্নানঘরে ঢুকে বেসুরো গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছিল। স্নান সেরে বেরিয়ে এখন আয়নায়। গানটা কিন্তু এখনও গুনগুন করে যাচ্ছে। আদিত্য রান্নাঘরে টিপিন বানাচ্ছে। চিকেন স্যান্ডউইচ। কাজের মাসি ব্রেকফাস্টের বাসন ধুচ্ছে।

সেদ্ধ করা চিকেনের টুকরো থেকে মাংস ছাড়াতে ছাড়াতে আদিত্য ভাবছিল মণিময় গুপ্তর বান্ধবীর ফোন নম্বরটা যদি পাওয়া যেত সে নিজেই একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টের চেষ্টা করতে পারত। মণিময় গুপ্তর বান্ধবীর ফোন নম্বরটা তার কাছে নেই বটে, কিন্তু শিবপদর নম্বরটা খুব সম্ভবত আছে। শিবপদকে ফোন করে নম্বরটা চেয়ে নিলেই তো হয়।

কেয়া স্কুলে বেরোবার আগে হলিউডের কায়দায় আদিত্যর গালে ঠোঁট ছুঁইয়ে চলে গেল। আদিত্য অবাক। কেয়ার হলটা কী? প্রথমে বাথরুমে গুনগুন গান, তারপর এই হলিউডি কায়দায় টা টা। নিশ্চয় ফুর্তির কোনও কারণ ঘটেছে। কিন্তু কারণটা নিয়ে আদিত্য আপাতত মাথা ঘামাচ্ছে না। ওটা পরে নিজের থেকেই জানা যাবে। এই মুহূর্তে তার চিন্তা শিবপদ এবং মণিময়ের বান্ধবীর ফোন নম্বর নিয়ে।

আদিত্য তার মোবাইল থেকে শিবপদর নম্বরটা খুঁজে বার করে ডায়াল করল। ওদিক থেকে সাড়া পেয়ে সে বলল, 'শিবপদ বলছ নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, শিবপদ বলছি। আপনি কে বলছেন?'

'আমি আদিত্য মজুমদার বলছি। সেদিন তোমার মালিকের বাগানবাড়িতে দারোগাবাবুকে নিয়ে তল্লাশি করলাম, মনে আছে?'

'মনে আছে। আপনি তো সেই পেলেন ডেরেস পুলিশ। দারোগাবাবুর বড় কর্তা।'

আদিত্য আপত্তি করল না। শিবপদ তাকে অচিন্ত্য সাহার বস ভাবলে ক্ষতি কি? সে বলল, 'শোনো, যে মেমসাহেব তোমার মালিকের কাছে আসত তার ফোন নাম্বারটা আমায় দিতে পারবে?'

'পরে যেদিন দারোগাবাবু অনেক লোকজন নিয়ে এলেন, সেদিন তো নম্বরটা ওনাকে দিয়ে দিলুম। আমার কাছে তো নম্বরটা সেভ করা নেই।'

'সেরেছে। তা হলে নম্বরটা পাব কী করে?'

'কেন? দারোগাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেই তো পেয়ে যাবেন।'

'আরে, দারোগাবাবু যে নম্বরটা হারিয়ে ফেলেছেন। না হলে তোমার কাছে চাইতে যাব কেন?'

'হারিয়ে ফেলেছেন? তা হলে কী হবে?' শিবপদ খানিকটা থতমত খেয়ে গেছে। 'আমার কিন্তু কোনও দোষ নেই বাবু।'

'না, না। তোমার দোষ থাকতে যাবে কেন?' আদিত্য শিবপদকে আশ্বস্ত করল। 'নম্বরটা তোমার মোবাইলে নিশ্চয় এখনও আছে। আচ্ছা, তুমি এর মধ্যে কোনও দিন কলকাতায় আসছ?'

'কলকাতায়? আজকেই তো যাচ্ছি। আজ শেয়ালদা কোর্টে আমার একটা মামলা ওঠার কথা। উকিলবাবু যেতে বলেছে।'

'কখন আসবে?'

'এই তো এবার বেরিয়ে ট্রেন ধরব।'

'শোনো, আমি আধঘণ্টার মধ্যে শেয়ালদা পৌঁছে যাচ্ছি। তুমি সাউথ স্টেশনের টিকিট কাউন্টারের সামনে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। বুঝলে? আর অবশ্যই তোমার মোবাইলটা সঙ্গে রাখবে। ওটার থেকে আমি ওই মেমসাহেবের ফোন নম্বরটা বার করে নেব। বুঝতে পেরেছ?'

'বুঝতে পেরেছি, দাদাবাবু।'

আদিত্য চান না করেই, কোনও রকমে জামাপ্যান্ট বদলে বেরিয়ে পড়ল।

'হালো?'যে মহিলা ফোনটা ধরেছেন তাঁর গলাটা রিনরিনে।

'আমার নাম আদিত্য মজুমদার। আমাকে আপনি চিনবেন না। আমি মণিময় গুপ্তর খুনের ব্যাপারে আপনাকে ফোন করছি।'

ওপারে খানিকক্ষণ নীরবতা। তারপর মহিলা কণ্ঠ বলল, 'আপনি কার কথা বলছেন বুঝতে পারছি না। ওই নামে আমি কাউকে চিনি না।' ফোন কেটে গেল।

আদিত্য আবার ফোনটা লাগাল। মহিলা কণ্ঠ এবার ফোন তুলে বলল, 'আপনি কেন আবোলতাবোল কথা বলে আমাকে বিরক্ত করছেন? বললাম তো ওই নামে আমি কাউকে চিনি না।' আবার ফোনটা কেটে গেল।

আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেছে! আদিত্য এবার মহিলার নম্বরে একটা লম্বা মেসেজ করল—ম্যাডাম, মণিময় গুপ্তর সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা প্রমাণ করা শক্ত হবে না। মণিময়ের লেক রোডের বাড়িতে আপনার হাতে লেখা একটা চিঠি এবং বেশ কিছু ইনটিমিডেটিং ফোটোগ্রাফ পাওয়া গেছে। মণিময়ের নরেন্দ্রপুরের বাড়ির কেয়ারটেকার সাক্ষী দেবে আপনার সেখানে নিয়মিত যাতায়াত ছিল। আপনার নাম এবং ঠিকানা আপনার ফোন নম্বর থেকে বার করা পুলিশের এক মিনিটের কাজ। পুলিশ আপনাকে খুঁজে বার করার আগে আপনি আমার সঙ্গে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন। আমি পুলিশ নই। আপনাকে সাহায্য করতে পারব।

মেসেজটা পাঠিয়ে আদিত্য অপেক্ষা করে রইল। এই মুহূর্তে তার আর কিছু করার নেই। টিপিনবাক্স থেকে নিজের তৈরি করা স্যান্ডউইচ খেতে খেতে জানলা দিয়ে বউবাজার স্ট্রিটের জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া। কফির জল ফুটে গিয়েছিল। আদিত্য উঠে গিয়ে কফি বানাল। তারপর আবার জানলার ধারে এসে বসল। শীতের রোদ্দুর আর নেই। তার বদলে এক রাশ স্থবির, ধূসর মেঘ আকাশটা ঢেকে রেখেছে। উল্টো ফুটপাতে একটা চালু ঘুগনির দোকান আছে। এখন এই মধ্যাহ্নভোজনের সময় সেখানে খুব ভিড়। স্যান্ডউইচে একটা কামড় দিয়ে আদিত্যর মনে হল সে স্যান্ডউইচটা মন্দ বানায়নি। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল আড়াইটে বাজে। কেয়াও হয়তো এখন লাঞ্চ করছে। জিজ্ঞেস করলে হত স্যান্ডউইচটা কেমন হয়েছে? সকালে কেয়া খুব খুশি-খুশি ছিল। কেয়াকে ফোন করবে? কে জানে হয়তো এখন ক্লাসে আছে। আদিত্য কেয়াকে একটা মেসেজ করল স্যান্ডউইচ কেমন লাগল? উত্তর এল কিছুক্ষণের মধ্যেই। এখন খাচ্ছি। দুরন্ত হয়েছে। একটা স্যান্ডউইচের দোকান দিতে পার। কেয়ার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে।

আদিত্য কেয়াকে প্রায় ফোন করতে যাচ্ছিল এমন সময় তার ফোনটা বেজে উঠল। সেই মহিলা নাকি? না বিমল।

'বিমল বলছি স্যার।'

'হ্যাঁ, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। খবর কী?'

'ওই ছেলেটা একটু সুস্থ হয়েছে। এখন জেনারেল বেডে দিয়েছে। অনিতা চৌধুরি রোজ দেখা করতে যায়। হাত ধরে বসে থাকে। আপনি একদিন গিয়ে কথা বলুন না।'

'ঠিক আছে যাব। দেখি কবে সময় করতে পারি।'

'একটু তাড়াতাড়ি আসবেন স্যার। না হলে হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে বাড়ি চলে যাবে।'

'ঠিক আছে। তাড়াতাড়িই যাব। ওই লোক দুটোর কিছু খবর পেলে?'

'হ্যাঁ স্যার, সেটাই বলতে যাচ্ছিলাম। যে দুজনের ওপর নজর রাখতে বললেন, তারা তো হরিহর আত্মা। রেসের মাঠ বলুন, নাইট ক্লাবের জুয়ার ঠেক বলুন, সব জায়গায় দুজন এক সঙ্গে যায়। আমার তো স্যার কাজের সুবিধে হয়ে গেল। আর কাউকে লাগছে না। দুজন এক সঙ্গে কুকর্ম করতে যায় বলে আমি একাই ওদের ওপর নজর রাখতে পারছি। কুকর্ম মানে জুয়া। এখন অব্দি এইটুকুই বুঝতে পেরেছি যে দুটোই রাম জুয়াড়ি। তবে মনে হয় লম্বাটা পালের গোদা।'

'ঠিক আছে তুমি নজর রেখে যাও। আর কিছু বলবে?'

'তেমন আর কিছু বলার নেই, শুধু আমার মেয়ের বিয়ের কথাটা ভুলবেন না স্যার। আপনাদের দুজনকেই কিন্তু আসতে হবে।'

'মনে আছে। মনে আছে। এখন রাখছি। আমার একটা দরকারি ফোন আসতে পারে।'

মোবাইলটা কেটে দিয়ে আদিত্য হাপিত্যেস করে বসে আছে, এক ঘণ্টা হয়ে গেল, দরকারি ফোনটা এল না।

অপেক্ষা করতে করতে দুটো সিগারেট খাওয়া হয়ে গেল। আর একবার কফি। ভদ্রমহিলা সময় নিচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু আদিত্যর মনে হচ্ছে, ফোন তাঁকে করতেই হবে। গান শুনলে হত। আদিত্য ল্যাপটপে উলহাস কাসালকরের ললিতাগৌরি লাগাল। চমৎকার গাইছে। খানিকটা ললিত, বাকিটা বোধহয় গৌরি। ললিতের অংশটা তো চেনা, কিন্তু গৌরি রাগটা আদিত্য চেনে না। গৌরি রাগটা কি খানিকটা পূরবীর মতো? ললিতাগৌরির চলনটা জায়গায় জায়গায় পূরবীর মতো লাগছে। এইসব সময় বাবার কথা আদিত্যর খুব মনে পড়ে। বাবা থাকলে ঠিক বুঝিয়ে দিত। শুধু যে বুঝিয়ে দিত তাই নয়, আলমারি থেকে বিভিন্ন স্পুল নামিয়ে বিভিন্ন ঘরানার ওস্তাদদের ইন্টারপ্রেটেশন কেমন আলাদা হতে পারে সেটাও শুনিয়ে দিত।

ফোন বাজছে। ওই নম্বরটা। আদিত্য গান বন্ধ করে দিয়ে ফোনটা ধরল।

'আপনার সঙ্গে দেখা করব। আপনি এখন কোথায় আছেন?' মহিলা কণ্ঠ কোনও ভনিতা না করে বলল।

'আমি আমার অফিসে আছি। আমার অফিসটা বউবাজার স্ট্রিটে। আপনি কি আমার অফিসে আসতে পারবেন?'

'আপনার অফিসে কি আপনি ছাড়া আর কেউ আছেন? আমি একটু প্রাইভেসি চাইছি।'

'আমার অফিসে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। প্রাইভেসি সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

'তা হলে আপনার অফিসের ঠিকানা এবং ডিরেকশানটা দিন। আমি পৌঁছে যাচ্ছি।' আদিত্য ভদ্রমহিলার গলায় একটা মরিয়া ভাব লক্ষ করল।

মিনিট চল্লিশ পরে দরজায় টোকা শুনে আদিত্য যাকে দরজা খুলে দিল তার ছবি আদিত্য আগেই মণিময় গুপ্তর লেক রোডের বাড়ির ড্রয়ারে দেখেছে। ঈষৎ চাপা রং, বয়েস চল্লিশ পেরিয়ে গেলেও শরীরের বাঁধুনি অটুট। পুরু ঠোঁট, আয়তচক্ষু, পীনোন্নত বুক। সব মিলিয়ে পুরুষকে কুপোকাত করার মতো সমস্ত মালমশলা শরীরে রয়েছে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে ভদ্রমহিলা একটু হাঁপাচ্ছিলেন। আদিত্য ভদ্রতা করে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল, যদিও তার কোনও দরকার ছিল না।

'এক গ্লাস জল হবে?' ভদ্রমহিলার গলায় বিন্দু বিন্দু ঘাম।

কিছুদিন আগে আদিত্য তার ঘরে একটা ওয়াটার পিউরিফায়ার বসিয়েছে। ভাগ্যিস বসিয়েছিল!

'আপনার নামটা কিন্তু এখনও জানা হয়নি।' আদিত্য নিজের চেয়ারে বসে বলল।

'আমার নামটা জানা কি খুব দরকার?'

'দেখুন পুলিশ আপনার নামটা ঠিকই জেনে যাবে। তাই আগেই জিজ্ঞেস করে নিচ্ছিলাম। অবশ্য মণিময়বাবুর ড্রয়ারে আপনার যে চিঠিটা পাওয়া গেছে তাতে আপনি মালা বলে সই করেছেন আমি দেখেছি। শুধু চিঠি কেন, কিছু ছবিও পেয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটা ফেয়ারলি ইনক্রিমিনেটিং।'

'আমার ছবি পুলিশ পেয়ে গেছে?' ভদ্রমহিলার মুখমণ্ডলে হঠাৎ অতিরিক্ত রক্ত-সঞ্চালন ঘটেছে। তবে, সেটা ভয়ে না লজ্জায় বলা শক্ত।'

'দেখুন ম্যাডাম, আমরা এখানে একটা মার্ডার কেস নিয়ে কথা বলছি। কাগজে নিশ্চয় পড়েছেন মণিময় গুপ্ত তাঁর নরেন্দ্রপুরের বাগানবাড়িতে মাস দেড়-দুই আগে খুন হয়েছেন। কেউ তাঁকে খুন করে ওই বাগানবাড়িরই একটা পুকুরে ফেলে দিয়েছিল। ওই বাগানবাড়ির কথা খুব বেশি লোক জানত না। যে দুএকজন জানত আপনি তাদের একজন। তাছাড়া আপনার সঙ্গে মণিময়বাবুর যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল সেটা তো পুলিশ জানতেই পেরেছে। আপনাকে কি পুলিশ ছেড়ে দেবে ম্যাডাম?'

'আপনি বারবার পুলিশের কথা বলছেন। আবার এটাও বলছেন আপনি নিজে পুলিশ নন। আপনি কে?' ভদ্রমহিলাকে খানিকটা আক্রমণাত্মক দেখাচ্ছে।

'আমার নামটা তো আগেই বলেছি। আমি পেশায় একজন বেসরকারি গোয়েন্দা। তবে পুলিশের সঙ্গে আমার সখ্য আছে। কিছুদিন আগে একজন পুলিশ ইন্সপেক্টারকে সঙ্গে নিয়ে আমি মণিময় গুপ্তর খুনটা আবিষ্কার করেছিলাম। আপনার একটা চিঠি এবং বেশ কিছু ছবি সেই সময় বেরিয়ে পড়েছিল। তাই এই বিষয়ে আমার কিছু বিশেষ খবর জানা আছে।'

'আপনারা হঠাৎ মণিময়ের নরেন্দ্রপুরের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন কেন?'

'ও হ্যাঁ। আপনাকে সেটা বলা হয়নি। আমি যে একজন বেসরকারি গোয়েন্দা সেটা তো বললাম। আমি বেসরকারিভাবে মণিময় গুপ্তর পার্টনার সৈকত চৌধুরি খুনের কেসটা তদন্ত করছি। সৈকত খুনের সময় থেকেই মণিময়কে পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই ওকে খুঁজতে খুঁজতে প্রথমে লেক রোডের বাড়ি এবং পরে নরেন্দ্রপুরের বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। আমি তো আমার কথা আপনাকে বললাম। এবার আপনি আপনার কথা বলুন। প্রথমে আপনার নাম।'

'আপনাকে আমার কথা বলে আমার লাভটা কী?' ভদ্রমহিলা এখনও বেশ আক্রমণাত্মক।

আদিত্যর মনে হল এই মহিলা তার কাছ থেকে শুধু কথা বার করতে এসেছেন। নিজের কথা বলার ইচ্ছে ওঁর খুব একটা নেই। আদিত্যর হঠাৎ খুব রাগ হয়ে গেল। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ম্যাডাম, আমার মনে হয় আই অ্যাম ওয়েস্টিং মাই টাইম, অ্যান্ড প্রব্যাবলি ইউ আর ওয়েস্টিং ইয়োরস।'

কথা বলতে বলতে আদিত্য দরজা অব্দি হেঁটে গিয়ে দরজাটা খুলে রুক্ষভাবে বলল, 'আপনি আসুন। আপনার সঙ্গে কথা বলে নষ্ট করার মতো সময় আমার নেই। তবে এটা আপনি জেনে রাখুন, দুএকদিনের মধ্যে পুলিশ নিয়ে আপনার বাড়িতে আমি যাব। আপনার কীর্তিকলাপ তখন আপনার পাড়ার লোকের অজানা থাকবে না।'

ভদ্রমহিলা চেয়ারে বসেই আছেন। আদিত্য আর একবার বলল, 'এবার আপনি আসুন। আপনাকে অনুরোধ করছি, প্লিজ, আসুন।'

ভদ্রমহিলার ওঠার কোনও লক্ষণ নেই। হঠাৎ আদিত্য দেখল দুহাতে মুখ ডুবিয়ে তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। আদিত্য দরজাটা বন্ধ করে আবার নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল। সে ভাবল ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ কেঁদে হালকা হয়ে নিক।

'আমার নাম ঊর্মিমালা মিত্র। আমার স্বামী শান্তনু মিত্র মেরিন ইঞ্জিনিয়ার, বর্তমানে একটা মার্চেন্ট শিপ-এর ক্যাপ্টেন।' মিনিট কয়েক পরে একটু ধাতস্থ হয়ে ভদ্রমহিলা বলতে শুরু করলেন। 'আমার স্বামী বছরে দুমাসের বেশি দেশে থাকেন না, জাহাজে জাহাজে ঘুরে বেড়ান। আমার ছেলে,আমাদের একমাত্র সন্তান, নৈনিতালে একটা বোর্ডিং স্কুলে পড়ে। আমার খুব একা লাগত। খুব একা। যদিও শান্তনু আমার জন্যে একটা বুটিক কিনে দিয়েছিল। গড়িয়াহাট মোড়ের কাছে হিন্দুস্থান পার্কে আমার বুটিক। নাম শাওনি। ওটা আমার ডাকনাম। মেয়েদের শাড়ি, ঘাগরা, টপ, চুড়িদার, ছেলেদের পাজামা-পাঞ্জাবি সবই পাওয়া যায়। ওখানেই মণিময়ের সঙ্গে আমার আলাপ।'

আদিত্যর মনে হল সে কোথায় যেন বুটিকটার নাম শুনেছে। কফির জল হয়ে গেছে। সে উঠে গিয়ে দু'কাপ কফি করে নিয়ে এল।

ঊর্মিমালা তার কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'আমার স্বামী আমাকে জাহাজে নিয়ে ঘুরতে চাইত না। তার কারণ, প্রকৃত নাবিকের মতো তার বন্দরে বন্দরে একটি করে স্ত্রীলোক ছিল। আমিও আমার স্বামীর সঙ্গে জাহাজে ঘুরতে চাইতাম না। দিনের পর দিন চারদিকে জল দেখলে আমার পাগল পাগল লাগত। তাই আমার পক্ষে স্বামীর সঙ্গে ঘোরা সম্ভব ছিল না। ছেলেটাও সঙ্গে নেই। আমার স্বামীর ইচ্ছা অনুযায়ী তাকে প্রথম শ্রেণির বোর্ডি স্কুলে পাঠানো হয়েছে। আমার কথার তো কোনও দাম নেই। ফলে নিদারুণ একাকিত্ব। এই সময় মণিময় গুপ্তর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে।

'এখন মনে হয়, না ঘটলেই ভাল ছিল। তখন কিন্তু তা মনে হয়নি। স্বীকার করছি, তিন বছর আমরা উদ্দাম প্রেম করেছিলাম। আমার ছেলের সিক্স, সেভেন, এইট, এই তিনটে ক্লাস। তারপর আমার আস্তে আস্তে ঘোর কাটতে শুরু করে। আমি মণিময়ের কবল থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিলাম। হাজার হলেও আমার তো একটা সংসার আছে। কিন্তু মণিময় আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল। ভালবাসা দিয়ে নয়, ভয় দেখিয়ে। মণিময়ের কাছে আমার কয়েকটা ছবি ছিল। মণিময়ের সঙ্গে তোলা সেলফি। ওগুলো শান্তনুর হাতে পড়লে নির্ঘাত ও আমাকে ডিভোর্স করে দিত। ডিভোর্স করে দিলে অ্যালিমনিও আমি পেতাম না। ছবিগুলো হাতে পেলে শান্তনু নিশ্চয় আমার বিরুদ্ধে অ্যাডাল্ট্রি চার্জ আনত। অ্যাডাল্ট্রি চার্জ প্রমাণিত হলে অ্যালিমনি পাওয়া শক্ত।

'এই রকম করে আরও দু'বছর চলল। শান্তনু যখন জাহাজে থাকে আমি এক-দেড় মাস মণিময়ের নরেন্দ্রপুরের বাগানবাড়িতে কাটিয়ে আসি। ছেলে হস্টেলে। পাড়া প্রতিবেশিকে বলি বুটিকের জন্য এথনিক জামাকাপড় কিনতে নানা জায়গায় ঘুরব। আমার বুটিকটা ভালই চলে। তাই আমার কথা লোকে বিশ্বাস করে নেয়।

'এইভাবেই চলছিল। মাস দেড়েক আগে মণিময়ের বাড়িতে গিয়ে আমার কিছুদিন কাটিয়ে আসার কথা ছিল। গিয়ে দেখি মণিময় নেই। এরকম আগে কখনও হয়নি। মণিময়ের ফোনও বন্ধ। যোগাযোগের কোনও উপায়ই নেই। ওর লেক রোডের বাড়িতে যেতে মণিময় বারবার বারণ করেছিল। তাই সেখানে আর খোঁজ নিইনি। বাড়ি ফিরে এসে মাঝে মাঝে কেয়ারটেকারকে ফোন করতাম। ও বলত সাহেব এখনও ফেরেনি। তারপর গত সপ্তাহে দেখলাম নরেন্দ্রপুরের বাগানবাড়ির পুকুর থেকে মণিময়ের বডি উদ্ধার হয়েছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হত এই বুঝি পুলিশ আমার বাড়িতে চলে আসবে। আজ আপনার ফোন এসে আমার আশঙ্কা সত্যি করে দিল। এই আমার গল্প। আমি কিন্তু কিচ্ছু লুকোইনি। আপনি এবার যা করার করুন।'

'মণিময় গুপ্তর খোঁজ করার জন্যে পুলিশকে বেনামী চিঠিগুলো আপনারই লেখা, তাই না?'

'হ্যাঁ, ওগুলো আমিই লিখেছিলাম। মণিময়ের জন্যে কিছুটা চিন্তা তো অবশ্যই হচ্ছিল।'

'তার মানে মণিময় গুপ্তকে আপনি পুরোপুরি মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেননি।'

ঊর্মিমালা উত্তর দিল না, মাথা নিচু করে রইল।

আদিত্য খুব গভীরভাবে ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে কখন সিগারেট ধরিয়ে ফেলেছে খেয়াল করেনি। ঊর্মিমালা মিত্রর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে সিগারেট ধরানো উচিত ছিল।

'আপনাকে আমি দুএকটা প্রশ্ন করব। খুব ভাল করে ভেবে উত্তর দেবেন।' আদিত্য চিন্তান্বিত গলায় বলল। 'মণিময় গুপ্তর নরেন্দ্রপুরের ওই বাগানবাড়িটার কথা কেয়ারটেকার শিবপদ এবং আপনি ছাড়া আর কেউ কি জানত?'

'জানত।' ঊর্মিমালা না ভাবেই উত্তর দিল। 'ওই বাগানবাড়িটার কথা মণিময়ের পার্টনার সৈকত চৌধুরি জানত।'

'কী করে বুঝলেন?'

'এটা মাস ছয়েক আগের ঘটনা। নাকি মাস পাঁচেক হবে। আমি আর মণিময় তখন কিছুদিনের জন্যে নরেন্দ্রপুরে রয়েছি। একদিন সকালে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছি, এমন সময় কলিং বেল। শিবপদ ছাড়া কলিং বেল আর কেউ বাজায় না, আর শিবপদ একটু আগেই বাজারের ফর্দ নিয়ে বাজার করতে গেছে, এত তাড়াতাড়ি তার ফেরার কথা নয়, তাই মণিময়ের কপালে চিন্তার ভাঁজ দেখা দিল। কী-হোল দিয়ে এক ঝলক তাকিয়েই মণিময় আমাকে বেডরুমে ঢুকে যেতে বলল। বলে দিল আমি যেন না বার হই। আমি বেডরুম থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম যে এসেছে তার সঙ্গে মণিময়ের প্রচণ্ড কথা কাটাকাটি হচ্ছে। প্রায় আধঘণ্টা পরে লোকটা চলে গেল। মণিময় ঘরে ঢুকতে আমি জিজ্ঞেস করলাম, লোকটা কে? মণিময় বলল, লোকটা ওর পার্টনার সৈকত চৌধুরি। আমি বললাম, লোকটা রাগারাগি করছিল কেন? মণিময় বলল, সৈকতকে কেউ ভুল বুঝিয়েছে যে আমি ওকে ঠকিয়েছি। আমি তো এখন ছুটিতে আছি। তাই ও আমাকে খুঁজতে খুঁজতে এখানে চলে এসেছে। আমি ওকে অনেক করে বললাম, ওকে কেউ আমার ব্যাপারে ভুল বুঝিয়েছে। ও বুঝল কিনা জানি না। তারপর আর এ-নিয়ে মণিময়ের সঙ্গে আমার আর কোনও কথা হয়নি।'

'আর একটা প্রশ্ন। আপনার কাছে কি নরেন্দ্রপুরের বাড়িতে ঢোকার চাবি থাকত?'

'থাকত। একটা চাবি আমার কাছে থাকত। কখনও কখনও এমন হয়েছে যে আমি আগে ওখানে পৌঁছে ঘরবাড়ি গুছিয়ে রেখেছি, মণিময় কয়েক ঘণ্টা পরে এসে পৌঁছেচে।'

'পরের প্রশ্ন। মণিময়ের ওয়ারিশ কে আপনি জানেন?'

প্রশ্নটা শুনে ঊর্মিমালা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'মণিময়ের নিকট আত্মীয় বলতে কেউ ছিল না। আমিই মণিময়ের একমাত্র ওয়ারিশ। মণিময় যে উইলটা করেছিল তার একটা কপি আমাকে দিয়েছিল। এর পরে আর কোনও উইল করেছিল বলে জানি না।'

'এই ব্যাপারে কি মণিময়বাবুর উকিল আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে?'

'এখনও করেনি।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ঊর্মিমালা বলল, 'আদিত্যবাবু, আমি মণিময়কে ঘৃণা করতাম, এটা ঠিক। কিন্তু, বিশ্বাস করুন, টাকার লোভে আমি মণিময়কে খুন করিনি।' শেষ কথাগুলো বলতে গিয়ে ঊর্মিমালার গলা কান্নায় বুজে এল।

আদিত্য তাকে একটু স্বাভাবিক হতে সময় দিল। তারপর বলল, 'আমার শেষ প্রশ্ন। আপনি কি জানতেন সৈকত চৌধুরি খুন হয়েছেন?'

'কাগজে পড়েছিলাম। ঠিক কবে পড়েছিলাম, মনে নেই।'

'আমার আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই।' আদিত্য ঊর্মিমালার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল। 'তবে আপনি খুব বিপদে পড়ে গেছেন ম্যাডাম। দুটো বিপদ। এক, মণিময়বাবুর সঙ্গে আপনার সম্পর্কের কথাটা আপনি আর লুকিয়ে রাখতে পারবেন না। ওটা এবার সবাই জেনে যাবে। আপনার স্বামী এটা জানতে পারলে কী হবে সেটা আপনিই ভাল বলতে পারবেন। এ-ব্যাপারে আমি আপনাকে কোনও সাহায্য করতে পারব না। দ্বিতীয় বিপদ, পুলিশ আপনার বিরুদ্ধে মণিময় গুপ্তর খুনের চার্জ আনতে পারে। সে ব্যাপারেও আমি

কতটা কী করতে পারব জানি না। আমার মনে হয়, এখন আপনি চুপচাপ বসে থাকুন। আগে পুলিশ আপনার কাছে যাক। তখন দেখা যাবে কী করা যায়।'

ঊর্মিমালা মিত্র চলে যাবার পর আদিত্য অনেকক্ষণ বসে বসে চিন্তা করল। তার মনে হল, একটু একটু করে কিছু জট খুলে আসছে।

রাত্তিরবেলা খাবার টেবিলে বসে কেয়া বলল, 'আজ দারুণ একটা ব্যাপার হয়েছে, জান?'

'জানি না। তবে আজ দারুণ একটা ব্যাপার যে হতে চলেছে সেটা সকালে তোমার মুড দেখেই বুঝেছিলাম। ব্যাপারটা কী বলত?' আদিত্য রুটি চিবোতে চিবোতে বলল।

'ব্যাপারটা হল, সেদিন আমরা সেই মলে গিয়েছিলাম না? ওখানে আমার মানিব্যাগটা পড়ে গিয়েছিল। ওটার মধ্যে ছিল প্রায় ন'হাজার টাকা, ব্যাঙ্কের ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, প্যান কার্ড, আধার কার্ড সব কিছু। তোমাকে ভয়ে বলিনি। বললেই তো তুমি প্রচণ্ড ধমক দেবে।' কেয়া ক্লাস ফোরের দোষ করা মেয়ের মতো মুখ করল।

'ব্যাগটা হারিয়ে যাবার পরেও তুমি ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ডগুলো ক্যানসেল করলে না?' আদিত্য আতঙ্কিত।

'না গো। আমি তো নিজে নিজে ওসব করতে পারি না। সেই তোমাকেই করতে হত। তোমাকে বলতে খুব ভয় করছিল। ঠাকুরকে খুব ডাকলাম। আমার মন বলছিল, ঠাকুর ঠিক আমার কথা শুনবে।'

'তারপর কী হল?' আদিত্য গল্পের শেষটা জানতে চায়।

'আজ ভোরবেলা, তুমি তখনও ওঠোনি, এক ভদ্রমহিলা ফোন করেছিলেন। বললেন, আমার ব্যাগটা উনি কুড়িয়ে পেয়েছেন। আমার ফোন নম্বরটা জানতেন না বলে ফোন করতে পারছিলেন না। তারপর দেখেন আধার কার্ডে আমার ফোন নম্বরটা রয়েছে। দুপুরে স্কুলে এসে উনি ব্যাগটা ফেরত দিয়ে গেছেন। এই পৃথিবীতে ভাল লোকও আছে গো।' কেয়ার চোখে প্রায় জল এসে গেছে।

(২)

'আমার কোনও উপায় নেই। ওপর থেকে নির্দেশ এসেছে। আমাকে সেই নির্দেশটা পালন করতেই হবে। উড়িষ্যা থেকে একটা টিম আসছে। আমাকে ওদের সঙ্গে থাকতে বলেছে। আমার ওপর নির্দেশ উড়িষ্যার টিমটার সঙ্গে সব রকম ভাবে সহযোগিতা করা। আমি সেটাই করছি। দীপশিখাকে ওরা এখান থেকে অ্যারেস্ট করে উড়িষ্যা নিয়ে যাবে। ওখানকার কোর্টে প্রোডিউস করবে। কারণ খুনগুলো ওখানেই হয়েছিল।'

সুভদ্র মাজি একটু থামল। আদিত্য বলল, 'উড়িষ্যার পুলিশ কি দীপশিখার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পেয়েছে? মানে হাতের ছাপ, মার্ডার ওয়েপন বা ওই ধরনের কিছু যা দিয়ে ওকে ইমপ্লিকেট করা যাবে?'

'আমি যতদূর জানি পায়নি। ওরা শুধু বলছে দীপশিখার খুব স্ট্রং একটা মোটিভ আছে। ভাল করে ইন্টারোগেট করলে হয়ত ওর মুখ দিয়ে বেফাঁস একটা-দুটো কথা বেরিয়ে যেতে পারে। তাই ওরা দীপশিখাকে ওদের কাস্টডিতে নিয়ে জেরা করতে চায়।'

'শুধু মোটিভ দিয়ে তো হবে না। এভিডেন্স চাই। আমার মনে হয় ওরা দীপশিখাকে ধরে রাখতে পারবে না। দীপশিখা জামিন পেয়ে যাবে। দীপশিখা বলবে, ইন্টারোগেশনের জন্যে ও সব সময় অ্যাভেলেবল। ডাকলেই আসবে। তাহলে ওকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে কেন?'

'সেখানেই মুশকিল হয়ে গেছে। আপনি যে কথাগুলো বললেন সেগুলো একজন ভাল উকিলের মুখ দিয়ে বলানো দরকার, যে কোর্টে দাঁড়িয়ে দীপশিখার হয়ে সওয়াল করতে পারে। কিন্তু একজন ভাল উকিলকে পয়সা দিয়ে দাঁড় করানোর মতো পয়সা তো দীপশিখাদের নেই।'

'এটা আমার আনফেয়ার মনে হচ্ছে। আইন অনুযায়ী সকলেরই আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থাকা উচিত। উড়িষ্যার টিমটা কবে আসবে মনে হয়?'

'সম্ভবত কালই ওরা এসে পড়বে।'

'আমাকে বলে খুব ভাল করলেন। দেখি আমি কী করতে পারি। সময় তো একেবারেই নেই। যা করার আজই করতে হবে।'

আদিত্য ফোনটা কেটে দিয়ে তার পুরোনো বন্ধু ক্রিমিনাল লইয়ার সুনন্দ সরকারের নম্বরে কানেক্ট করল। সুনন্দর সঙ্গে মিনিট পনের কথা বলার পর সে দীপশিখাকে ফোনে ধরল। দীপশিখাকে সুনন্দর ফোন নম্বরটা জানিয়ে কিছু দরকারি নির্দেশ দেবার পর আদিত্য ঘড়ির দিকে তাকাল। বেলা এগারোটা বাজতে খুব বেশি দেরি নেই। এবার বেরোতে হবে।

আজ শনিবার। কেয়ার ইস্কুল ছুটি। কলঘরে কেয়া সময় নিয়ে চান করছে। বোধহয় শ্যাম্পুও করছে। শনিবারটা কেয়ার শ্যাম্পু করার দিন। কেয়া চান করে বেরোনো অবধি অপেক্ষা করতে হবে। ওকে না বলে বেরোনো যাবে না। আদিত্য কফির জল বসাল। কফি তৈরি করে সিগারেট ধরাল। ল্যাপটপে কিশোরী আমনকরের একটা পুরোনো নন্দ লাগাল, যদিও এখন নন্দ শোনার সময় নয়। কেয়া এখনও কলঘরে।

বাথরুম থেকে কেয়া বেরিয়েই আদিত্যকে বলল, 'শোনো কথা আছে।'

আদিত্য কেয়ার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতে কেয়া বলল, 'একটু আগে রাখিদি ফোন করেছিল। প্রদীপদার সঙ্গেও কথা হল। তুমি অন্য ফোনে ছিলে বলে তোমাকে ডাকিনি।'

আদিত্য এখনও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কেয়ার দিকে তাকিয়ে আছে। কথাটা কী, কেয়া এখনও বলেনি।

কেয়া বলল, 'রাখিদির অপরেশন। আজ বিকেলে হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে। এটাই জানাতে রাখিদি ফোন করেছিল। প্রদীপদা খুব নার্ভাস হয়ে গেছে। আমার মনে হয়, আমাদের একবার দেখা করে আসা উচিত। যাবে গো?'

'নিশ্চয় যাব। আমি তো ওদের বাড়ির দিকেই যাচ্ছিলাম। অনিতা চৌধুরির সঙ্গে কিছু কথা ছিল। আমি অনিতার বাড়িতে বারোটা নাগাদ যাব বলেছি। তুমি আমার সঙ্গে চল। তুমি রাখিদিদের বাড়ি ঢুকে যাবে। আমি অনিতার সঙ্গে কথা সেরে রাখিদিদের ওখানে চলে যাব। তারপর একসঙ্গে দুজনে ফিরে আসব।'

'সোজা বাড়ি ফিরব না। বাইরে লাঞ্চ খেয়ে ফিরব। তুমি আমাকে আজ বাইরে লাঞ্চ খাওয়াবে।' কেয়া আদুরে গলায় বলল।

আদিত্যরা একটা উবার নিয়েছিল। শনিবার রাস্তায় ভিড় কম। হাওয়া আপিস বলেছে, হালকা দু এক পশলা বৃষ্টি হতে পারে। দশ-পনেরো বছর আগেও হাওয়া আপিসকে বিশ্বাস করা যেত না, আবার অবিশ্বাসও করা যেত না। আজকাল কিন্তু তাদের ভবিষ্যদবাণী প্রায়শই মিলে যাচ্ছে। আদিত্যদের উবার শেয়ালদা পেরোনোর আগেই বৃষ্টি নামল। উবার যখন ফ্লাইওভারের ওপরে ট্র্যাফিক লাইটে আটকে আছে, আদিত্য দেখল নীচে স্টেশন চত্বরে হাজার হাজার খোলা ছাতা। আর যাদের ছাতা নেই তারা মরিয়া হয়ে স্টেশনের দিকে দৌড়চ্ছে। একসঙ্গে অত ছাতা আদিত্য বোধহয় আগে কখনও দেখেনি। নবফাল্গুনের অকালবর্ষণ শব্দহীন অনর্গল শহরের ওপর ঝরে পড়ছে।

বালিগঞ্জ পৌঁছতে পৌঁছতে আরও মিনিট পঁয়ত্রিশ লেগে গেল।

'দেখুন আপনাকে আমি বলতে গেলে বিনা পয়সায় সাহায্য করছি। আমার আরও অনেক কাজ আছে যেগুলো করলে আমার পেট ভরবে। সেগুলো না করে আমি আপনার কাজটা করছি। এখন আপনি যদি আমাকে সব কথা খুলে না বলেন তাহলে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব না। আমি আপনাকে

খোলাখুলি বলে দিলাম, কারণ এখন স্পষ্ট কথা বলার সময় এসেছে।' আদিত্য কথাগুলো বলে সিগারেট ধরাল। সে এতটাই বিরক্ত যে সিগারেট ধরাবার আগে অনিতার অনুমতি নেবার কথাও ভুলে গেছে।

'আমি আপনাকে আগেও তো বললাম, এখনও বলছি, আমি যা যা জানি, মানে যা কিছু সৈকতের খুন হবার ব্যাপারে রেলেভেন্ট, সবই আপনাকে বলেছি।' অনিতা মৃদু স্বরে বলল।

'ঠিক আছে। আমি আপনাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করছি। সমীর প্যাটেল বলে যে ছেলেটি নিয়মিত আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসে, যে এখন হাসপাতালে ভর্তি আছে, তার সঙ্গে আপনার কী শুধু বন্ধুত্বের সম্পর্ক নাকি তার বেশি কিছু?'

অনিতা মনে হয় এই ধরনের একটা প্রশ্ন আশঙ্কা করছিল। সে আক্রমণাত্মকভাবে বলল, 'সমীরের সঙ্গে আমার যেরকম সম্পর্কই থাকুক না কেন সেটা আমার ব্যাক্তিগত ব্যাপার। এটা নিয়ে আমি আপনার বা অন্য কারও সঙ্গে আলোচনা করতে রাজি নই। তাছাড়া সমীর আর আমার বন্ধুত্বের সঙ্গে সৈকত খুন হওয়ার কোনও সম্বন্ধ আছে বলে আমি মনে করি না।'

'আপনি কী মনে করেন, কী করেন না তা নিয়ে পুলিশের এবং ইনশিয়োরেন্স কোম্পানির বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা নেই। এই মুহূর্তে পুলিশ এবং ইনশিয়োরেন্স কোম্পানি আপনার এবং আপনার প্রেমিক সমীর প্যাটেলের বিরুদ্ধে জোরদার একটা কেস সাজিয়ে ফেলেছে। পুলিশ বলছে ইনশিয়োরেন্সের টাকার লোভে আপনি এবং আপনার প্রেমিক মিলে সৈকতকে খুন করেছেন। ইনশিয়োরেন্স কোম্পানিও তাই বলছে। এটা তো মানতেই হবে সৈকত চৌধুরির মৃত্যুতে সব থেকে বেশি লাভ আপনার। এর ওপর যদি দেখানো যায় সৈকত বেঁচে থাকতে থাকতেই আপনার একটা পরকীয়া প্রেম হয়েছিল তা হলে তো স্বামীকে খুন করার পেছনে আপনার মোটিভটা আরও জোরদার করে দেখানো যায়। সব মিলিয়ে ম্যাডাম আপনি আপাদমস্তক ফেঁসে গেছেন। আপনার বাঁচার একমাত্র উপায় আমাকে সব কথা খুলে বলা।'

অনিতা এখনও ভেবে যাচ্ছে কী করবে। আদিত্য অসহিষ্�ভাবে ঘড়ির দিকে তাকাল। এখান থেকে প্রদীপ চক্রবর্তীদের বাড়ি যেতে হবে। তারপর বাড়ি ফেরার পথে কোথাও গিয়ে লাঞ্চ। দেরি হয়ে যাচ্ছে। সে বলল, 'আমার হাতে অনন্তকাল সময় নেই ম্যাডাম। আপনার দোসর সমীর প্যাটেল একটু সুস্থ হলেই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করবে। তার পর থার্ড ডিগ্রি করে তার কাছ থেকে কথা বার করতে পুলিশের বেশিক্ষণ লাগবে না। আমি চললাম, আর এটাও বলে যাই যে আজ থেকে আপনার কেসটার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক রইল না। আপনাকে বাঁচাবার কোনও দায়িত্বও আর আমার নেই।'

আদিত্য উঠে দাঁড়াল। সে দরজার দিকে হাঁটা শুরু করতে যাবে এমন সময় অনিতা কান্নাভেজা গলায় বলল, 'আদিত্যবাবু আপনি প্লিজ যাবেন না। আপনি ছাড়া আর কেউ আমাদের বাঁচাতে পারবে না। আসলে সমীর বলেছিল তার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথাটা কাউকে না বলতে। বললে নাকি ওটা আমাদেরই বিরুদ্ধে যাবে। তাই আমি আপনাকেও বলিনি।'

'আশ্চর্য কথা। আপনি না বললে কেউ জানতে পারবে না? এই যে সমীর প্যাটেল সপ্তাহে তিন-চারবার করে আপনার বাড়িতে আসছে। আপনার সঙ্গে সময় কাটাচ্ছে। এটা তো সবাই দেখতে পাচ্ছে। আপনাদের বাড়িতে ঢোকার সময় সিকিউরিটির কাছে তাকে নাম লেখাতে হচ্ছে। আপনাদের প্রতিবেশিনী তো একবার তার ছবি তুলে আপনার স্বামীকে পাঠিয়েছিলেন। তার মানে আপনার স্বামীও ব্যাপারটা জানতেন। তা, সকলেই যখন জানে তখন ব্যাপারটা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে অসুবিধে কোথায়?'

অনিতা চুপ করে রইল। আদিত্যর মনে হল সকলে যে তার পরকীয়া প্রেমের ব্যাপারটা জানে এ-ব্যাপারে সে অবহিত। কিন্তু নিজের মুখে সেটা স্বীকার করতে তার সংকোচ হয়। অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব। আদিত্যর মনে পড়ে গেল প্রথম যেদিন অনিতা তাদের বাড়ি এসেছিল সেদিন স্বামীর খুনের কথা বলতে বলতে কী আকুল হয়ে

সে কাঁদছিল। সেটা কিন্তু অভিনয় বলে আদিত্যর মনে হয়নি। অথচ সেই একই মানুষ স্বামী বর্তমান থাকতেই পরকীয়া করত। অনিতার মনের ভিতরটা আদিত্য এখনও ঢুকতে পারেনি।

'আপনি হয়তো ভাবছেন আমি ভীষণ খারাপ একটা মেয়ে, স্বামী থাকতেও যারা অন্য ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক করে তাদের তো সকলে খারাপ মেয়েই বলবে। আমি জানি না আমার ব্যাপারটা কেউ বুঝবে কিনা, কিংবা আমিই ঠিক মতো বুঝিয়ে বলতে পারব কিনা, তাই আপনাকেও ব্যাপারটা বলিনি। আপনি বিশ্বাস করুন, সত্যি কথা এটাই যে সৈকত নিজেই আমাকে আস্তে আস্তে সমীরের দিকে ঠেলে দিয়েছিল।'

আদিত্য আবার সোফায় বসে পড়েছে।

'সৈকত চলে যাবার সাত-আট মাস আগে থেকে সৈকতের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ভাঙতে শুরু করে।' অনিতা বলতে শুরু করেছে। 'প্রথম দিকে কারণটা আমি কিছুই বুঝিনি। কিন্তু এইটুকু বুঝতে পারছিলাম সৈকত আমাকে অ্যাভয়েড করছে। তারপর একদিন খবরটা কাগজে বেরোল। ঝাড়খণ্ড-ওয়েস্ট বেঙ্গলের বর্ডারে সৈকতদের বানানো একটা ব্রিজ ভেঙে পড়েছে এবং ব্রিজ ভেঙে পড়ার ফলে বেশ কিছু লোকের মৃত্যু হয়েছে। যারা মারা গেছে তাদের মধ্যে কিছু মহিলা এবং শিশুও ছিল। আমি ভাবলাম, এটা নিয়েই নিশ্চয় সৈকত খুব পারটার্বড হয়ে আছে। তাই বাড়িতে ভাল করে কথা বলে না।'

'আপনি তখন সৈকতকে কিছু জিজ্ঞেস করেননি?'

'করেছিলাম। জিজ্ঞেস করতে সৈকত আরও ভয়ঙ্কর কথা বলল। সৈকত বলল, ওর পার্টনার মণিময় গুপ্ত এবং ওদের মূল কনট্রাকটার অসীম দত্ত, দুজনে ষড়যন্ত্র করে সমস্ত দোষ ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। এটা সৈকতের কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে ওই দুজন মিলে খারাপ মেটিরিয়াল দিয়ে ব্রিজটা বানিয়েছিল বলে ব্রিজটা ভেঙে পড়েছে। প্রচুর টাকা প্রজেক্টটা থেকে সরিয়েছে ওরা। এটাই অবশ্য ওদের প্রথম চুরি নয়, সৈকতের সন্দেহ বেশ কিছুদিন ধরে ওরা এই কাজটা করছে। বলতে বলতে সৈকতের চোয়াল শক্ত হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল ও ওই দুজনকে ছাড়বে না। এক্সপোজ করে দেবে।'

'তারপর?'

'তারপরের ঘটনা কিন্তু অন্যরকম। মণিময় এবং অসীম দত্ত এত আটঘাট বেঁধে চুরিটা করেছিল যে সৈকত ওদের ছুঁতেও পারল না। উল্টে সিবিআই সৈকতের পেছনে লাগল। কতভাবে যে সিবিআই ওকে হ্যারাস করেছে আমি বলে বোঝাতে পারব না। সৈকতের মতো প্রাণবন্ত, উদার, হাসিখুসি মানুষটা দেখতে দেখতে একটা জ্যান্ত মড়ায় পরিণত হল। দেখলে চেনাই যায় না।'

'আপনি এইসব কথা প্রথম দিন বলেননি কেন?'

'বলিনি কারণ আমার মনে হয়েছিল সৈকতের পেছনে সিবিআই লেগেছে বললে সৈকতের এগেন্সটে আপনি বায়াসড হয়ে যাবেন।'

'কথাগুলো প্রথম দিন বলে দিলে আমার কাজের অনেক সুবিধে হত। যাগগে, যা হবার হয়ে গেছে। আপনি বলুন তারপর কী হল।'

'এই সময় নাগাদ সমীর আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। সমীর আমার কলেজের বন্ধু, বহুদিন দেখাসাক্ষাৎ নেই, এতদিন পরে হঠাৎ ফোন করতে আমি একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমার অন্য বন্ধুরা বলে কলেজে পড়ার সময় আমার ওপর সমীরের একটা ক্রাশ ছিল। কিন্তু সে তো অনেকদিনের কথা। এতদিন পরে ফোন কেন?

'আমি তখন একটা মারাত্মক ডিপ্রেশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। সৈকত অনেক রাত্তির করে বাড়ি ফেরে। আমরা পরস্পরের সঙ্গে কোনও কথা না বলে নিঃশব্দে ডিনার খেয়ে শুয়ে পড়ি। মাঝরাতে মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে গেলে দেখি সৈকত জানলার ধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ঘুমোবে না? জিজ্ঞেস করলে বলে তুমি শুয়ে পড়। বাড়িতে আর কেউ নেই যার সঙ্গে কথা বলতে পারি। বাপের বাড়ি বলতে কিছু নেই। একমাত্র

যে ভাইএর সঙ্গে কথা বলতাম সেও অস্ট্রেলিয়ায়। এই অবস্থায় সমীর আমাকে একদিন ফোন করল। বলল, অনেক কষ্ট করে আমার ফোন নম্বর জোগাড় করেছে।

'স্বীকার করছি, আমি ওকে ফিরিয়ে দিতে পারিনি। বরং একটু বেশি প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছিলাম। সত্যি বলতে কি, একজন কথা বলার মানুষ পেয়ে আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলাম। জানতে পারলাম ও বিয়ে করেনি। ওদের পরিবারের একটা ইলেক্ট্রিকাল গুডস-এর দোকান আছে ও সেখানেই বসে। ইকনমিকালি খুব বেশি দাঁড়ায়নি। কিন্তু আমার তাতে কী?

'প্রথম দিকে ও রোজ ফোন করত। তারপর বাড়িতে আসতে শুরু করল। দুপুরে যখন সৈকত বাড়ি থাকে না ও তখন আসত। ঘণ্টা দু তিন থাকত। মাঝে মাঝে আমরা এক সঙ্গে লাঞ্চ করতাম। টিভি দেখতাম। ওর সঙ্গে সময় কাটাতে আমার খুব ভাল লাগত। ওদিকে সৈকত আরও আরও ডিসট্যান্ট হয়ে যাচ্ছিল। আস্তে আস্তে আমাদের নেবাররা সমীরকে লক্ষ করতে শুরু করল। তার মধ্যে মলয়া বিশ্বাস, ওই অবনক্সাস মহিলা, সমীরের ছবি তুলে সৈকতকে হোয়াটসঅ্যাপ করে জানাল এই সব অসভ্যতা এই হাউসিং-এ চলবে না। যেন হাউসিং-এর সবার মরাল দায়িত্ব একা মলয়া বিশ্বাসকে কেউ দিয়ে রেখেছে।'

সৈকত ছবিগুলো পেয়ে কী বলল?'

'ছবিগুলো এবং তার সঙ্গে ওই খারাপ মহিলার হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজটা পেয়ে সৈকতের যে রিঅ্যাকশানটা হল সেটাই আমার কাছে সব থেকে স্ট্রেঞ্জ এবং হার্টব্রেকিং। সৈকত যদি আমাকে গালি দিত, এমনকি দু একটা চড়-থাপ্পড়ও মারত, আমি অবাক হতাম না। মেনেও নিতাম। কারণ দোষটা তো আমার। কিন্তু তার বদলে সৈকত বলল, আমি জানি তোমার থেকে আমি অনেক দূরে সরে গেছি। সারাদিন তোমার সঙ্গে কথাই হয় না। যদি তুমি কোনও পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে খানিকটা সময় কাটিয়ে ভাল থাকতে পার, আমি খুশিই হব। তোমাকে আমি নেগলেক্ট করছি বলে আমার ভীষণ খারাপ লাগে। সেই খারাপ লাগাটা খানিকটা কম হবে যদি আমি জানি তুমি ভাল আছ।

সৈকতের কথাগুলো শুনে আমি কেঁদে ফেললাম। কারণ আমি বুঝতে পারলাম সৈকতের সঙ্গে আমার মেন্টাল সেপারেশনটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমাকে কাঁদতে দেখে সৈকত কোনও সান্ত্বনা দিল না। কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এর পরে আমার সঙ্গে সমীরের সম্পর্কটা আরও ক্লোজ হতে শুরু করে। অদ্ভুত ব্যাপার এটা নিয়ে সৈকতের কোনও বিটারনেস ছিল না। বরং মাঝে মাঝে আমাকে জিজ্ঞেস করত সমীর কেমন আছে? সে কি এসেছিল? আমি সৈকতকে বুঝতে পারতাম না।'

'আপনি আমাকে প্রথম দিন একটা মিথ্যে কথা বলেছিলেন। আপনি বলেছিলেন, সৈকত যে অত টাকার ইনশিয়োরেন্স করেছে এটা আপনি জানতেন না। কিন্তু আমি পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছি সৈকত আপনাকে ইনশিয়োরেন্স-এর কথাটা জানিয়েছিল।'

অনিতা চুপ করে রইল। তারপর নিচু গলায় বলল, 'যে কারণে সেদিন সমীরের কথা আপনাকে বলিনি সেই একই কারণে ইনশিয়োরেন্স-এর ব্যাপারেও মিথ্যে বলেছিলাম। হ্যাঁ, সৈকত আমাকে ইনশিয়োরেন্স-এর ব্যাপারটা বলেছিল। কিন্তু আমি যদি বলতাম ইনশিয়োরেন্স-এর ব্যাপারটা আমার জানা ছিল, তা হলে আমার ওপর সন্দেহ পড়ত না কি?'

আদিত্য বলল, 'সন্দেহ তো এখনও পড়ছে। মিথ্যে কথা বললে সন্দেহ বাড়বে বই কমবে না। যাক সে কথা। এবার বলুন সমীরকে মারল কারা?'

'কারা মারল আমি জানি না। সমীরও কিছু বলতে পারছে না। এটা আমার কাছে একটা মিস্ট্রি।'

'হুঁ।' বলে আদিত্য কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবল। তারপর বলল, 'আপনাকে আর একটা প্রশ্ন করব।'

আদিত্য পকেট থেকে তার মোবাইলটা বার করে হোয়াটসঅ্যাপে কিছু একটা খুঁজছে। যেটা খুঁজছিল সেটা একটা ছবি। একটা নয় গোটা চারেক। এই সেই ছবি যেগুলো বিমল রাস্তা থেকে তুলে আদিত্যকে

পাঠিয়েছিল। সমীর প্যাটেলের সঙ্গে আর একজন।

আদিত্য ছবিগুলো অনিতাকে দেখাল। বলল, 'রোগা ছেলেটা তো সমীর প্যাটেল। কিন্তু তার সঙ্গে যে রয়েছে তাকে কি আপনি চেনেন?'

ছবিগুলো দেখতে দেখতে অনিতার মুখের অভিব্যক্তি দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে ছবির অন্য লোকটিও তার চেনা। কিন্তু সমীর প্যাটেলের সঙ্গে এই লোকটিকে সে দেখবে ভাবেনি। সে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'কোথায় তোলা এই ছবিটা?'

'দিন পনেরো আগে পার্ক স্ট্রিটের একটা বারের সামনে তোলা। দুজনে একসঙ্গে বার থেকে বেরোচ্ছিল।'

অনিতা আদিত্যর মোবাইলটা ফেরত দিয়ে দিল। তার হাতটাও কাঁপছে।

আদিত্য বলল, 'আপনার রিঅ্যাকশান থেকে বুঝতে পারছি আপনি লোকটিকে চেনেন। লোকটির মুখের সঙ্গে আপনার মুখের আদল খানিকটা মেলে। লোকটি কি আপনার দাদা সঞ্জয়?'

অনিতা কথা বলতে পারছে না। অনেক পরে সে বলল, 'হ্যাঁ, লোকটা আমার দাদা সঞ্জয়। কিন্তু সমীর আমার দাদার সঙ্গে কী করছে? আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। আমার খুব অসুস্থ লাগছে। একটু একা থাকতে চাই। ছবিগুলো আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবেন?'

অনিতার ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আদিত্য ভাবছিল, সেদিন প্রদীপ চক্রবর্তী যেভাবে অনিতা-সমীরের ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করল, অনিতা নিজে তার থেকে একেবারে আলাদা একটা ব্যাখ্যা দিচ্ছে। কে ঠিক বলছে? অবশ্য মিথ্যে কথা বলে আপাতদৃষ্টিতে প্রদীপ চক্রবর্তীর কোনও লাভ নেই, কিন্তু অনিতার আছে। তাহলে কি অনিতা মিথ্যে কথা বলছে? মিথ্যে বলুক বা সত্যি, এটা ঠিক যে সমীরের সঙ্গে তার দাদা সঞ্জয়ের যোগাযোগের কথা অনিতা জানত না। হয়তো আজ হাসপাতালে গিয়ে সমীরকে জিজ্ঞেস করবে।

'বাবা, কী দেরি, কী দেরি! আমরা তো বলাবলি করছিলাম অনিতা তোমাকে লাঞ্চ খাইয়ে দিচ্ছে।' কেয়া আদিত্যকে ঢুকতে দেখে বলল।

আদিত্য আর কী উত্তর দেবে? সে একটু বোকা বোকা হাসল। বসার ঘরে প্রদীপ আর রাখির সঙ্গে কেয়া গল্প করছে।

'কখন ভর্তি হতে হবে?' আদিত্য রাখি চক্রবর্তীর দিকে তাকিয়ে বসতে বসতে বলল।

'আজ বিকেলে ভর্তি হব। কাল আর পরশু অবজারভেশনে রাখবে। মঙ্গলবার সকালে অপরেশন। তার মানে, আড়াই দিন হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে বোর হতে হবে। এটা নিয়ে যাচ্ছি।' রাখি চক্রবর্তী সামনে টেবিলের ওপর রাখা একটা মোটা বইএর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে হাসলেন। আদিত্য দেখল শিবরাম চক্রবর্তীর গল্প সমগ্র।

'চমৎকার, চমৎকার।' কথাগুলো একেবারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আদিত্যর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। 'অপরেশনের আগে শিবরাম চক্রবর্তীর থেকে ভাল সঙ্গী আর কিছু হতে পারে না।' বইটা দেখে তার নিজেরই পড়তে ইচ্ছে করছিল।

'রাখিদি তো খুশ মেজাজে আছে। কিন্তু প্রদীপদা ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছে।' কেয়া সিরিয়াস গলায় বলল।

'আরে না, না। আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না। আমি ঠিক আছি।' কথাগুলো যতই জোর দিয়ে বলুক প্রদীপ চক্রবর্তীর গলায় আত্মবিশ্বাসের অভাবটা পরিষ্কার।

'আসলে প্রদীপদা-রাখিদিদের কেউ নেই। রাখিদিকে অপরেশন টেবিলে নিয়ে যাবার পর প্রদীপদা একেবারে একা পড়ে যাবে। অনিতা থাকতে পারবে না বলেছে। তাই আমি বলেছি অপরেশনের সময় আমি সঙ্গে থাকব। আমার তো স্কুল থেকে ছুটি নেওয়াই হয় না। সেদিন একটা ছুটি নিয়ে নেব না হয়। তুমি কি আমাদের সঙ্গে থাকতে পারবে?'

'নিশ্চয় পারব, অবশ্যই থাকব।' আদিত্য তাড়াতাড়ি বলল। সে অন্য কথা ভাবছিল। অনিতা তো এই বিপদের সময় প্রদীপ চক্রবর্তীর সঙ্গে থাকতেই পারত। সে থাকবে না কেন? কেয়ার মনটা সত্যিই খুব ভাল। প্রদীপ-রাখিকে সে কতটুকুই বা চেনে? আদিত্যর হঠাৎ নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে হল।

আরও আধঘণ্টা পরে সে আর কেয়া যখন পার্ক স্ট্রিটে লাঞ্চ খাচ্ছে, অচিন্ত্য সাহার ফোন।

'কাল সকালে কল্যাণী যেতে পারবেন স্যার? সৈকত চৌধুরির বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্যে? ওঁরা সকাল এগারোটায় একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন।'

'নিশ্চয় যেতে পারব। আপনি আমাকে তুলে নেবেন?'

'আপনাকে আপনার বাড়ি থেকে সাড়ে ন'টা নাগাদ তুলে নেব। শ্যামবাজার থেকে বি টি রোড ধরে ব্যারাকপুর। সেখান থেকে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে ধরে নেব। টেনে চালালে ঘণ্টা দেড়েকে পৌঁছে যেতে পারব।'

'খুব ভাল। তা হলে কাল দেখা হচ্ছে।'

(৩)

প্রত্যেক রবিবার আদিত্যদের গলি দিয়ে বেরিয়ে বড়রাস্তার ওপর একটা বড় বাজার বসে। শুধু শাকসবজি, মাছ-মাংসের কাঁচা বাজার নয়। হাওড়ার হাট থেকে আসে শাড়ি-জামা, প্যান্ট-শার্ট, লুঙ্গি-গেঞ্জি। বড়বাজার থেকে স্টেনলেস স্টিলের বাসনপত্র। তাছাড়া হাতা-খুন্তি, বঁটি-ছুরি, কাঠের বেলন-চাকি, প্লাস্টিকের মগ-বালতি-গামলা, কত কী যে আসে—দেখতে দেখতে আদিত্যর মনে পড়ে যায় খুব ছেলেবেলায় সে জহরদাদার কাঁধে চড়ে রথের মেলা দেখতে যেত। এখনও বাজার দেখতে আদিত্যর খুব ভাল লাগে। কত বিচিত্র মানুষ বেসাতি করতে আসে। যারা কিনতে আসে তারা বেশিরভাগই গরিব মানুষ, নইলে ফুটপাতের দোকান থেকে কিনবে কেন? আদিত্যরও মাঝে মাঝে এই রবিবারের বাজার থেকে এটা-ওটা কিনতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কেয়া কী বলবে ভেবে কেনে না। তবে জিনিস কেনার থেকে কেনাবেচা, লোকজনের যাওয়া-আসা দেখতেই আদিত্যর বেশি ভাল লাগে।

অচিন্ত্য সাহাকে আদিত্য বলে দিয়েছিল সে গলির মোড়ের উল্টোদিকের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকবে। কারণ, গলির ভিতর ঢুকলে বাজারের জ্যামে ফেঁসে যেতে পারে গাড়ি। সেই কথা অনুযায়ী, আদিত্য একটু আগে বেরিয়ে উল্টোদিকের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মানুষের ভিড় দেখছিল।

অচিন্ত্য সাহার গাড়ি সময়ের আগেই এসে পড়েছে। সম্ভবত রবিবার রাস্তা ফাঁকা পেয়েছে বলে।

'আমরা ভাবছি এবার অনিতা চৌধুরি এবং তার বন্ধুকে অ্যারেস্ট করে ফেলব। খবর কাগজগুলো এমন হয়েছে, পুলিশের অকর্মণ্যতার কথা ছাড়া আর তাদের কিছু লেখার নেই। সৈকত চৌধুরি মার্ডার কেসে এই অ্যারেস্ট দুটো হলে খবর কাগজওয়ালাদের মুখ কিছুটা বন্ধ হবে।' গাড়ি চিঁড়িয়ার মোড় ছাড়িয়ে একটু ফাঁকা রাস্তায় পড়তে অচিন্ত্য সাহা বলল।

'আপনি কি জানেন অনিতার বন্ধু সমীর প্যাটেলকে কারা সব মারধোর করে রাস্তায় ফেলে রেখে গেছিল? গুরুতর আহত হয়ে সমীর অনেকদিন হাসপাতালে ভর্তি ছিল। এখন বোধহয় ছাড়া পাবার সময় হয়েছে।'

'সমীর প্যাটেল হাসপাতালে ভর্তি? আমরা তো কিছুই জানি না। আপনি কী করে জানলেন? আমাকে বলেননি তো?' অচিন্ত্য সাহাকে খানিকটা উত্তেজিত দেখাল।

'দাঁড়ান, দাঁড়ান। এতগুলো প্রশ্ন এক সঙ্গে করলে আমার গুলিয়ে যাবে।' আদিত্য অল্প হাসল। 'আপনার প্রশ্নের একটা একটা করে উত্তর দেবার চেষ্টা করি। পাটুলি পেরিয়ে বাইপাসের ধারে যে নতুন হাসপাতালটা হয়েছে সমীর সেখানে ভর্তি আছে। আমার একজন ব্যক্তিগত ইনভেস্টিগেটার আছে, তার কাছ থেকে খবরটা

জেনেছি। আপনারা জানেন না কারণ সমীর এখনও কোনও এফ আই আর করেনি। আর আপনাকে বলিনি কারণ আপনি জিজ্ঞেস করেননি।

'বুঝতে পারলাম স্যার। কিন্তু আপনার কি মনে হয় না অনিতাকে এবার অ্যারেস্ট করা উচিত? ওর এগেন্সটে কেস তো আমরা ভালই সাজাতে পেরেছি। আর সত্যি কথা বলতে কি, অনিতা ছাড়া সৈকত চৌধুরিকে মারার মোটিভ কিন্তু আর কারও নেই।'

'দেখুন আমার মনে হয়, অনিতার যেমন সৈকতকে খুন করার খুব স্ট্রং একটা মোটিভ আছে, তেমনি আবার কিছু কিছু প্রশ্ন আছে যেগুলোর সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়া অবধি আপনি জোর দিয়ে বলতে পারবেন না অনিতা বা তার সহযোগীই খুনটা করেছে।'

'কী রকম প্রশ্ন?'

'প্রথম কথা হচ্ছে, মণিময়ের খুনের সঙ্গে যদি সৈকতের খুনের সম্পর্ক থাকে তাহলে প্রশ্ন উঠবে মণিময়কেও কি অনিতা খুন করেছে? করলে, কেন করেছে?'

'আমার মনে হয়, মণিময়কে তার বান্ধবী ঊর্মিমালা মিত্র সম্পত্তির লোভে খুন করেছে। আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি মণিময় তার সমস্ত সম্পত্তি ঊর্মিমালাকে দিয়ে গেছে। ঊর্মিমালা সেটা জানত। আপনাকে বলা হয়নি, কাল সন্ধেবেলা আমি ঊর্মিমালার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। মণিময়ের সলিসিটারের সঙ্গেও ফোনে কথা হয়েছে।'

'কিন্তু সৈকত আর মণিময়ের খুন দুটো যদি আলাদা আলাদা ঘটনা হয় তাহলে একই পিস্তলের বুলেট দিয়ে যে দুটো খুনই হয়েছে এটাকে আপনি কী করে ব্যাখ্যা করবেন?'

'একই পিস্তল দিয়ে হয়েছে এটা বলা যাবে না। একই ধরনের পিস্তল দিয়ে হয়েছে, বড়জোর এইটুকু বলা যায়। কিন্তু একই ধরনের পিস্তল তো একাধিক থাকতেই পারে।'

'অচিন্ত্যবাবু, আপনি জানেন কিনা জানি না, কিছুদিন আগে পুরীর কাছে একটা রিসর্টে রিসর্টের মালিক এবং তাঁর ছেলে খুন হয়েছেন। সৈকত বা মণিময় যে ধরনের পিস্তল দিয়ে খুন হয়েছে, বাবা এবং ছেলেও ওই একই ধরনের পিস্তল দিয়ে খুন হয়েছেন। রিসর্টের মালিক অসীম দত্ত, সৈকত এবং মণিময়ের ঘনিষ্ঠ একজন কনট্রাকটার। এর আগেও একবার অসীম দত্তকে খুন করার চেষ্টা হয়েছিল। ওই একই ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে। এগুলোকে কি আপনি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলবেন?'

'আমি জানি না। সত্যিই কিছু বুঝতে পারছি না।' অচিন্ত্য সাহাকে যুগপৎ বিভ্রান্ত এবং উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল।

'আর একটা বড় প্রশ্ন। খুন হবার আগে সৈকত অত মোটা টাকার ইনশিয়োরেন্স করতে গেল কেন?'

'স্যার, আমার মনে হয়, ওই ব্রিজ ভেঙে পড়ার কেলেঙ্কারিতে সৈকতের দুএকজন সঙ্গী ছিল। তারা ভয় পাচ্ছিল সৈকত সিবিআইকে তাদের নাম বলে দেবে। তারা সৈকতকে দুবার খুন করারও চেষ্টা করেছিল। সৈকত সেকথা তার পড়শি প্রদীপ চক্রবর্তীকে বলেছিল, উনি আমাকে সে কথা বলেছেন। তাই ভয় পেয়ে গিয়ে সৈকত জীবনবিমা করেছিল।'

'তার মানে আপনি বলছেন, যাদের ভয়ে সৈকত জীবনবিমা করল তারা সৈকতকে খুন করল না, করল তার বউ। তাও ওই বিমার টাকাটার লোভে।'

'আমার তো সেরকমই মনে হচ্ছে স্যার।'

'কাদের ভয়ে সৈকত ইনশিয়োরেন্সটা করেছিল সেটা কি আপনি বার করতে পেরেছেন?'

'না স্যার, এখনও পারিনি। তবে মনে হয়, পেরে যাব।'

'এখানেই কিন্তু শেষ নয়। অনিতার বন্ধু সমীরকে কারা মারধোর করল? কেন করল? সেটাও তো বোঝা দরকার।'

অচিন্ত্য সাহা চুপ করে আছে। ভাবছে। একটু পরে সে বলল, 'তাহলে কি আপনার মনে হয় এক্ষুনি অনিতাকে গ্রেপ্তার করাটা ঠিক হবে না?'

'আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন আমি বলব, না ঠিক হবে না। এখন গ্রেপ্তার করলে অনিতা ঠিক ছাড়া পেয়ে যাবে আর বদনাম হবে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট এবং আপনার। সেটা আপনার ভবিষ্যৎ কেরিয়ারের পক্ষেও ভাল হবে না।'

অচিন্ত্য সাহা গুম হয়ে বসে রইল। গাড়ি ডানলপ ব্রিজ পেরিয়ে গেছে।

ছোট একতলা বাড়ি। চারদিকে বাগান ঘিরে রয়েছে। দূর থেকে দেখেই আদিত্যর মনে পড়ে গেল গোপাল উড়ের পুরাতনী গান 'ওই দেখা যায় বাড়ি আমার/ চারিদিকে মালঞ্চ বেড়া/ ভ্রমরেতে গুনগুন করে/ কোকিলেতে দিচ্ছে সাড়া'। এখানে অবশ্য ভ্রমর কিংবা কোকিল কাউকেই দেখা গেল না। তাদের পরিবর্তে গোটা সাত-আট কাক ছাদের কার্নিশে বসে মিটিং করছে। এটাই ৩৩ নম্বর বাড়ি। এখানেই সৈকতের বাবা অনুপ চৌধুরি এবং তাঁর সহধর্মিণী অঞ্জনা চৌধুরির বাস করার কথা।

গেট বন্ধ থাকলেও তালা দেওয়া নয়। গোরু-ছাগল ঢুকতে পারবে না। কিন্তু হাত দিয়ে গেটের আগল তুলে মানুষের ঢুকতে বাধা নেই। বাগানের ভিতর দিয়ে সরু বাঁধানো রাস্তা গেট থেকে বাড়ির সদর দরজা অব্দি পৌঁছেছে। অচিন্ত্য সাহা বেল বাজাতে এক ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বলিষ্ঠ মহিলা দরজা খুললেন। তাঁকে এক ঝলক দেখেই আদিত্যর মনে হল ইনি নিশ্চয় অনুপ এবং অঞ্জনা চৌধুরির দেখাশোনা করেন। উর্দি পরা পুলিশ দেখে মহিলা ঈষৎ শঙ্কিত।

'আমরা অনুপ চৌধুরির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। উনি জানেন আমরা আসব। ওঁকে খবর দিন।' অচিন্ত্য কেজো গলায় বলল।

'আমি খবর দিচ্ছি। আপনারা ভিতরে আসুন।'

বসার ঘরটা দেখলেই বোঝা যাবে অধ্যাপকের বাড়ি। দুদিকের দেয়াল জুড়ে সিলিং অবধি বইএর র‍্যাক উঠে গেছে। ডিভানের ওপরেও উপুড়-চুপুড় বই। আদিত্য বসে বসে বইগুলো দেখছিল। প্রায় সবই সাহিত্যের বই। ইংরেজি সাহিত্য, ইউরোপের সাহিত্য, বাংলা সাহিত্য। ইনি সাহিত্যের অধ্যাপক না হয়ে যান না। আদিত্য ডিভানের ওপর জায়গা করে নিয়ে বসেছে। অচিন্ত্য বেতের চেয়ারে। অন্য একটা বেতের চেয়ার খালি রইল। অনুপ চৌধুরি এলে বসবেন। আর দুটো চেয়ারে স্তূপীকৃত বই রাখা, সেগুলোতে বসা সম্ভব নয়।

অনুপ চৌধুরি এসে চেয়ারেই বসলেন। দীর্ঘকায়, শীর্ণ, গাল বসে গিয়ে হনু দুটো উঁচু দেখাচ্ছে। বয়েস আশি-পঁচাশি পেরিয়ে গেলে এরকম হয়। কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে অনুপ চৌধুরির ততটা বয়েস হয়নি। সম্ভবত পঁচাত্তরের বেশি হবে না। আদিত্য আন্দাজ করল, ছেলের মৃত্যু অনুপ চৌধুরির চেহারার ওপর পাকাপাকি ছাপ ফেলে গেছে।

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আপনার বেশি সময় নেব না।' অচিন্ত্য সাহা বিনীতভাবে শুরু করল। 'আমি ইন্সপেক্টার অচিন্ত্য সাহা, সৈকত চৌধুরির কেসটার চার্জের আছি। আমিই আপনাকে ফোন করেছিলাম। আর ইনি আদিত্য মজুমদার, প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর, এই কেসটাতে পুলিশকে সাহায্য করছেন।'

'আমি ভেবেছিলাম আপনারা আরও আগে আসবেন। যাই হোক, বেটার লেট দ্যান নেভার।' অনুপ চৌধুরি থেমে থেমে কথা বলেন।

'আপনার বাগানটা কিন্তু চমৎকার। আপনি নিজেই কি ওটার পরিচর্যা করেন?' আদিত্য প্রসঙ্গ পাল্টে বলল।

'করতাম। সৈকত চলে যাবার আগে অব্দি। এখন আর শরীরে শক্তি পাই না। ইচ্ছেটাও চলে গেছে। একটা মালি আছে। সে-ই বাগানটা দেখাশোনা করে।' অনুপ চৌধুরি চুপ করে গেলেন। হয়তো নীরব হয়ে গিয়ে বলতে চাইলেন এই বৃদ্ধ বয়সে পুত্রশোক পেলে শরীর, মন সবই বিকল হয়ে যায়।

'আপনি তো এখানকার ইউনিভার্সিটিতেই পড়াতেন। সাহিত্য পড়াতেন, মনে হয়। এত সাহিত্যের বই আপনার ঘরে।' আদিত্য আবার অন্য প্রসঙ্গে যাবার চেষ্টা করল।'

'ইংরেজি সাহিত্য পড়াতাম। যখন পড়াতাম তখন কিন্তু এখানে থাকতাম না। ছেলেমেয়ের ইস্কুল-কলেজের জন্যে কলকাতায় থাকতে হত। জমিটা অবশ্য কেনাই ছিল।'

'তারপর ছেলেমেয়ে বড় হয়ে যেতে এখানে চলে এলেন?'

'ছেলে বড় হয়ে গেল। মেয়ের বিদেশে বিয়ে হয়ে গেল। আমার কলকাতায় থাকতে কোনও দিনই ভাল লাগত না। দেখলাম থাকার আর দরকারও নেই। তখন এই বাড়িটা করলাম। খুব শান্তিতে ছিলাম এখানে। হঠাৎ কী যে হয়ে গেল!' অনুপ চৌধুরির কথাগুলো কেঁপে কেঁপে গেল।

'আপনার ছেলের কি কোনও শত্রু থাকতে পারে? মানে, আমরা বোঝার চেষ্টা করছি সৈকত চৌধুরিকে কে খুন করতে পারে।' অচিন্ত্য সরাসরি জিজ্ঞেস করল।

'আমার ছেলেকে কে খুন করতে পারে আমার জানা নেই। তবে সৈকতের শত্রু থাকতে পারে না একথা বলব না।'

'কেন এরকম বলছেন?' অচিন্ত্য ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'দেখুন, ছোটবেলা থেকেই সৈকত খুব মারকুটে ছিল। ওর নামে মাঝে মাঝেই নালিশ আসত। আর ওর গায়ে ছিল অস্বাভাবিক একটা শক্তি। তিন-চারজনের সঙ্গে এক সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা ওর ছিল। আমি মাস্টার মানুষ। বুঝতে পারতাম না ওর মধ্যে এত শক্তি, সাহস এবং অ্যাগ্রেশন এল কী করে!'

'মাফ করবেন, আপনি কি বলতে চাইছেন, সৈকত মাস্তানি করে বেড়াত?' অচিন্ত্য সাহা বেশ বিভ্রান্ত।

'না, না। একেবারেই নয়। ঠিক তার উল্টো। সৈকতের স্বভাবটা অত্যন্ত মধুর ছিল। কিন্তু সে অন্যায় একেবারে সহ্য করতে পারত না। বিশেষ করে ইংরেজিতে যাদের বুলি বলে, অর্থাৎ বাংলায় যাদের বলে শক্তের ভক্ত নরমের যম, সৈকত সেই রকম মানুষদের ছোটবেলা থেকেই অপছন্দ করত। একটা ঘটনা বললে বুঝতে পারবেন।

'একবার, সৈকত তখন ক্লাস নাইনে পড়ে, ওদের ইস্কুলে বারো ক্লাসের দুতিনটে বকাটে ছোঁড়া ছোট ক্লাসের একটা বাচ্চার ওপর নানা রকম অত্যাচার করে মজা পাচ্ছিল। টিফিনের সময় ঘটছিল ব্যাপারটা। অনেকক্ষণ ধরেই ব্যাপারটা সৈকত লক্ষ করছিল। শেষে ও ছেলেগুলোকে ব্যাপারটা থামাতে বলল। তাতে ছেলেগুলো যেন আরও মজা পেয়ে গেল। তারা এবার বাচ্চাটাকে ছেড়ে সৈকতকে নিয়ে পড়ল। বোধহয় সৈকতকে ফিজিকালি অ্যাসল্টও করেছিল। এতদিন পরে ডিটেলটা আমার মনে নেই, শুধু এইটুকু মনে আছে, যে মিশনারি স্কুলে সৈকত পড়ত তার ফাদার প্রিফেক্ট পরের দিন আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, ক্লাস টুএলভের তিনটে ছেলেকে সৈকত এত মেরেছে যে তাদের তিনজনকেই স্কুলের ইনফারমারিতে নিয়ে গিয়ে রীতিমতো ফার্স্ট এড দিতে হয়েছে। সৈকতকে ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তার একটাই কথা। সে কোনও অন্যায় করেনি তাই সে ক্ষমা চাইতে পারবে না। ফলে তাকে ফাদারের হাতে প্রচণ্ড মার খেতে হয়েছে। সব মার সে মুখ বুজে হজম করেছে, কিন্তু ক্ষমা চায়নি।'

'ফাদার ওই বদ ছেলেগুলোকে ভালই চিনতেন। আর এটাও জানতেন যে সৈকত ছেলে খারাপ নয়। মন দিয়ে লেখাপড়া করে। খেলাধুলোতেও বেশ ভাল। তাই ব্যাপারটা আর বেশি দূর গড়ায়নি। কিন্তু আর একটা জিনিস এই ঘটনা থেকে বোঝা যাবে। সেটা হল সৈকতের অসম্ভব সহ্যশক্তি।

'বুঝতে পারছি। আপনি বলছেন, এমন লোকের শত্রু তো থাকতেই পারে।' অচিন্ত্য সাহা ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নিতে চায়।

আদিত্য খুব মন দিয়ে শুনছিল। সে এবার বলল, 'তাহলে সৈকতকে বেশ অন্য ধরনের একজন মানুষ বলতে হবে। তাই না?'

'হ্যাঁ। খুব আনিউজুয়াল। ওকে নিয়ে মাঝে মাঝে আমাদের খুব চিন্তা হত। এই নোংরা পৃথিবীটাতে বাস করতে গেলে যেসব দোষ থাকা দরকার, সেগুলো সৈকতের ছিল না। ফলে ও এমন সব কাজ করে বসত যেগুলো পরে ওর ওপরেই বোঝা হয়ে দাঁড়াত। খ্রিস্টান ধর্মটা ওকে খুব টানত। হয়তো মিশনারি স্কুলের ইনফ্লুয়েন্স। একবার বারো ক্লাসে পড়ার সময় ও তো ঠিকই করে ফেলল যে খ্রিস্টান হয়ে যাবে। অনেক বুঝিয়ে-টুঝিয়ে ওকে নিরস্ত করা গেল। তবে পাপ এবং তার শাস্তি খ্রিস্টানদের এই যে ধারণাটা সৈকতকে খুব নাড়া দিয়েছিল। পেনেন্স ব্যাপারটাতেও সৈকতের খুব বিশ্বাস ছিল। কখনও ভুল করে কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে ফেললে ও নিজেকেই শাস্তি দিতে চাইত।'

অচিন্ত্য সাহা পুরোটা বুঝতে পারছে বলে মনে হয় না। ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে। অনুপ চৌধুরির কথা শেষ হতে না হতে সে বলল, 'খুন হবার আগে সৈকত কি আপনাদের কিছু বলেছিল? মানে অস্বাভাবিক কোনও ঘটনা বা ওই রকম কিছুর কথা বলেছিল কি?'

'না সেরকম কিছু বলেছিল বলে মনে পড়ছে না। তবে বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ করছিলাম সৈকত একটু বিমর্ষ হয়ে আছে। এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেও কিছু বলত না। আসলে সৈকত খুব চাপা স্বভাবের ছিল। নিজের উদ্বেগ-টুদ্বেগগুলো কারও সঙ্গে শেয়ার করা ওর ধাতে ছিল না। মনে হয় ওর বউএর সঙ্গেও ও সব কিছু শেয়ার করত না।'

সৈকতের সঙ্গে আপনাদের কীরকম ফ্রিকোয়েন্টলি দেখা হত?'

'মাসে একবার তো দেখা হতই। আমরা আজকাল কোথাও যেতে পারি না। সৈকতই কলকাতা থেকে ড্রাইভ করে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে যেত।'

'শেষ কবে সৈকত আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?'

'যেদিন সৈকত খুন হয়, সেদিন সকালে। খুব বেশিক্ষণ ছিল না। দেড়টা নাগাদ ভাত-টাত খেয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। ও এখানে এলে ওর মায়ের হাতের রান্না খেয়ে যেত। আগের রাত্তিরেই জানিয়ে রেখেছিল যে ও আসছে।'

'সেদিন কি সৈকতের মধ্যে কোনও পরিবর্তন লক্ষ করেছিলেন?'

'আলাদা করে কিছু লক্ষ করিনি। ছ সাত মাস ধরে সৈকত যেরকম মনমরা হয়ে থাকত, সেদিনও সেই রকমই ছিল।'

'আচ্ছা, অনিতা, মানে সৈকতের বউএর সঙ্গে আপনাদের কেমন সম্পর্ক? সেও কি মাঝে মাঝে আসত?'

'ভালই তো। খারাপ বলার কোনও কারণ দেখি না। তবে অনিতা সৈকতের মতো অত ঘনঘন আসত না। মাঝে মাঝে আসত।'

'আপনি কি জানেন, খুন হবার আগে সৈকত একটা বিরাট মোটা টাকার জীবনবিমা করেছিল যার বেনিফিশিয়ারি ছিল তার স্ত্রী অনিতা চৌধুরি? আপনার কি মনে হয় টাকার লোভে অনিতা তার স্বামীকে খুন করতে পারে?' অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর অচিন্ত্য সাহা প্রশ্ন করল।

অচিন্ত্য সাহার ডবোল প্রশ্নের তির দৃশ্যতই অনুপ চৌধুরিকে আহত করেছে। তিনি চুপ করে গেছেন। উত্তর দিতে সময় নিচ্ছেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে অনুপ চৌধুরি বললেন, সৈকত এরকম কোনও জীবনবিমা করেছিল বলে আমার জানা ছিল না। আর আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন টাকার লোভে অনিতা সৈকতকে খুন করতে পারে কিনা, আমি জোর দিয়ে হ্যাঁ বা না কোনওটাই বলতে পারব না।'

'আর আপনাদের জানাই, আমি এবার একটু ক্লান্ত বোধ করছি। যদি আপনাদের প্রশ্ন করা হয়ে গিয়ে থাকে আমাকে ছুটি দিলে কৃতজ্ঞ বোধ করব।' একটু থেমে অনুপ চৌধুরি বললেন।

'ঠিক আছে। আপনাকে আর বিরক্ত করব না। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একটু কথা বলা যাবে?'

'দেখুন, আমার স্ত্রী মোটেই সুস্থ নেই। ছেলের মৃত্যুটা উনি এখনও মেনে নিতে পারেননি। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ ওঁর সঙ্গে কথা বলতে চাইবেন না। আমি ওঁকে এই পৈশাচিক ব্যাপারটা ভুলিয়ে রাখতে চাই। আপনারা যদি ওঁকে এসব নিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করেন আবার উনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়বেন। তাই হাত জোড় করে বলছি ওঁকে ছেড়ে দিন।'

'না, না এভাবে কেন বলছেন? আমরা আপনার স্ত্রীকে কখনোই বিরক্ত করব না। আমরা বরং আজ উঠি। আরও কিছু জানতে হলে ইন্সপেক্টার সাহা আপনাকে ফোন করে জেনে নেবেন।' আদিত্য তাড়াতাড়ি বলল।

অনুপ চৌধুরির বাড়ি থেকে বেরোতে বেরোতে আদিত্যর মনে হচ্ছিল অনুপ চৌধুরির স্ত্রী অঞ্জনা চৌধুরির সঙ্গে কথা বলতে পারলে অচিন্ত্য সাহা খুশি হত।

ফেরার পথে, গাড়ি যখন বি টি রোডে পড়েছে, অচিন্ত্য সাহা বলল, 'দেখলেন তো, অনুপ চৌধুরি কিন্তু অনিতা চৌধুরির দ্বারা সৈকত চৌধুরির খুন হবার সম্ভবনাটা একেবারে উড়িয়ে দিলেন না।'

সৈকত টের পেল অচিন্ত্য সাহা এখনও তার পুরোনো বিশ্বাসে আটকে রয়েছে।

(৪)

আদিত্য ভেবেছিল রবিবার সন্ধেবেলাটা কেয়ার সঙ্গে কাটাবে। কোথাও যাবে না। বাড়িতেই বসে বসে আবোল তাবোল গল্প করবে। কিংবা যদি ইচ্ছে হয় দুজনে মিলে ল্যাপটপে একটা সিনেমাও দেখে ফেলতে পারে। অথবা মুড হলে দুজনে মিলে একটা নতুন কিছু রান্নাও করতে পারে। সিনেমা দেখা কিংবা নতুন কিছু রান্না করাটা আসল নয়, আসল হল দুজনে এক সঙ্গে থাকা। এক সঙ্গে সময় কাটানো। যেটা, একবার সপ্তাহ শুরু হয়ে গেলে, আর হয়ে উঠবে না।

আদিত্য খেয়াল করেছে প্ল্যান অনুযায়ী তার কোনও কাজ করা হয় না। কিছু একটা কারণে প্ল্যান ভেস্তে যায়। এবারেও ঠিক তাই হল। বিকেলের মুখে গৌতমের ফোন।

'শোন, আমার ব্যাচমেট এবং বন্ধু অমিত সাক্সেনা কলকাতায় এসেছে। অমিত সিবিআইতে আছে। সৈকত চৌধুরি এবং মণিময় গুপ্ত খুনের মামলায় সিবিআই ইনটারেস্টেড। অমিত কেসটা লিড করছে। ওদের ইন্টারেস্টের কারণ, একটা ব্রিজ ভেঙে পড়া নিয়ে সৈকত চৌধুরির এগেন্সটে ওরা আগেই ইনভেস্টিগেট করছিল। যার এগেন্সটে ওরা ইনভেস্টিগেট করছিল সেই লোকটা হঠাৎ খুন হয়ে গেল, তার পার্টনার খুন হয়ে গেল, প্রজেক্টটার কনট্রাকটার খুন হয়ে গেল, সৈকতের পার্টনারের বাগানবাড়ি থেকে কলকাতা পুলিশ কাঁড়ি কাঁড়ি কালো টাকা উদ্ধার করল এগুলো তো আর আলাদা আলাদা ইন্সিডেন্ট হতে পারে না। সিবিআই এখন কলকাতা পুলিশের সঙ্গে মিলে কাজ করতে চায়। তাই অমিত কলকাতায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করেছে।'

'বেশ। কিন্তু এর মধ্যে আমি আসছি কোথায়?' আদিত্য একটু কুণ্ঠিতভাবে বলল।

'কোথায় আসছিস, বলছি। প্রথমত, ওই অচিন্ত্য সাহা বলে ইন্সপেক্টারটি যাই বলুক না কেন, সিবিআই কী করে যেন জেনে গেছে মণিময় গুপ্তর বাড়ি থেকে ব্ল্যাক মানি উদ্ধারের পেছনে তোর হাত বা ব্রেন, যেটাই হোক, সেটা আছে। দুনম্বর কথা, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের হয়ে তুই কয়েকটা কাজ করে দেবার ফলে দিল্লিতে তোর নামটা খানিকটা ছড়িয়েছে। ফলে সিবিআই-এর বড় এবং মেজ কর্তারা তোর নামটার সঙ্গে পরিচিত। তৃতীয়ত, তারা জানে তুই এই কেসটা নিয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছিস। সব মিলিয়ে সিবিআই যেমন

কলকাতা পুলিশের সাহায্য চায় তেমনি তোর কাছ থেকেও অ্যাসিস্টেন্স চায়। অমিত সাক্সেনা কাল দিল্লি ফিরে যাচ্ছে। ও আজ তোর সঙ্গে বসতে চায়। ওর সঙ্গে ওদের অ্যাকাউন্ট্যান্ট থাকবে, তার কিছু কিছু জিনিস বলার আছে। আর আমি তো থাকবই। এই মিটিংটার জন্যে আমি আমাদের ক্লাবে একটা চেম্বার বুক করে রেখেছি। তোকে আসতেই হবে।'

'হ্যাঁ, আসতে তো হবেই। ভেবেছিলাম সন্ধেটা বউএর সঙ্গে কাটাব, সেটা দেখছি আর কপালে নেই। তা কটার সময় আসব?'

'সাতটার বেশি আর দেরি করিস না। ক্লাবের রিসেপশনে পৌঁছে আমাকে একটা ফোন করিস। আমি তোকে এসে নিয়ে যাব।'

'ঠিক আছে, চলে আসছি।'

'ও হ্যাঁ। ডিনার খেয়ে যাবি কিন্তু।'

গৌতমের ক্লাবটা রাসেল স্ট্রিটে। বনেদি ক্লাব। ছোটবেলায় আদিত্য বাবার সঙ্গে প্রতি শনিবার এখানে ডিনার খেতে আসত। সেই সময় প্রত্যেক শনিবার এখানে কন্টিনেন্টাল বুফে ডিনার দেওয়া হত যেটা আদিত্য এবং তার বাবা দুজনেরই খুব পছন্দের ছিল। তারপর বাড়ি ফিরে অনেকক্ষণ গান শোনা হত। কারণ, পরের দিন রবিবার, আদিত্যর স্কুল ছুটি। পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনে ট্রেন থেকে নামতে নামতে আদিত্যর এইসব পুরোনো কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল।

গৌতমের বন্ধু অমিত সাক্সেনা অল্প কথার মানুষ। কথা বলার থেকে শোনাতেই তার আগ্রহ বেশি। আদিত্য ভাবল, লোকটা পুলিশের গোয়েন্দা হবার উপযুক্ত বটে। সাক্সেনার সঙ্গী রাজীব অগ্রবাল রোগা, বেঁটে, ফরসা। সাক্সেনার কালো লম্বা-চওড়া চেহারার ঠিক বিপরীত। সে আরও কম কথা বলে, বস অনুমতি না দিলে তার বোধহয় মুখ খোলা বারণ। অতএব কথাবার্তা যা বলার গৌতমই মূলত বলছিল, বেশিরভাগটাই ইংরেজিতে, মাঝে মাঝে হিন্দিতে।

'কিছুদিন আগে বেঙ্গল-ঝাড়খণ্ড বর্ডারে সিমজুড়ি বলে একটা জায়গায় অজয় নদীর ওপর সৈকত চৌধুরি, মণিময় গুপ্তর কোম্পানি গুপ্ত অ্যান্ড চৌধুরি সিভিল কনস্ট্রাকশান্স একটা ব্রিজ বানিয়েছিল। পাবলিকের জন্যে খোলার আগেই ভেঙে পড়েছিল ব্রিজটা। তার ফলে বেশ কয়েকজন মারাও গেছিল। শেষপর্যন্ত সিবিআই-এর হাতে কেসটা চলে আসে।' গৌতম আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বলছিল।

'তিনটে অ্যাকাউন্ট এরা ভাল করে দেখেছে।' একটা অ্যাকাউন্ট গুপ্ত অ্যান্ড চৌধুরি সিভিল কনস্ট্রাকশান্স-এর, অর্থাৎ সৈকত চৌধুরি এবং মণিময় গুপ্তর কোম্পানির। দ্বিতীয়টা এইস বিল্ডার্স অর্থাৎ অসীম দত্তর কোম্পানির এবং তৃতীয়টা দত্ত কনস্ট্রাকশান্স অর্থাৎ অসীম দত্তর বড় ছেলে অনিকেত দত্তর। তিনটে কোম্পানিই বেঙ্গল-ঝাড়খণ্ড বর্ডারের ওই ব্রিজটা ভেঙে পড়ার সঙ্গে যুক্ত। মিস্টার রাজীব অগ্রবাল একজন ফরেনসিক অডিটার। তিনি এই অ্যাকাউন্টগুলো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে কিছু সিদ্ধান্তে এসেছেন।'

আদিত্য রাজীব অগ্রবালের দিকে তাকিয়ে সৌজন্যমূলক হাসি হাসল। উত্তরে অগ্রবালের মুখেও একটা বিষণ্ণ হাসি দেখা দিল। আদিত্যর মনে হল লোকটার মুখের অভিব্যক্তিগুলোই বিষণ্ণ, নইলে এখন আলাদা করে বিষণ্ণ হবার কোনও কারণ তো ঘটেনি।

'প্রথম অ্যাকাউন্টটা যাদের সেই গুপ্ত অ্যান্ড চৌধুরি সিভিল কনস্ট্রাকশান্স ন্যাশানাল হাইওয়ে অথরিটির কাছ থেকে সিমজুড়ি ব্রিজটা বানানোর বরাত পেয়েছিল। গুপ্ত অ্যান্ড চৌধুরি সিভিল কনস্ট্রাকশান্স কনট্রাকটার হিসেবে নিয়োগ করেছিল অসীম দত্তর কম্পানি এইস বিল্ডার্সকে। এইস বিল্ডার্স আবার কাজের সিংহভাগ সাব-কন্ট্রাক্টিং-এ অনিকেত দত্তর কম্পানি দত্ত কনস্ট্রাকশান্সকে দিয়ে দিয়েছিল। এই কন্ট্রাকটর এবং সাব-

কন্ট্রাকটর নিয়োগ নিয়ম মেনে ওপেন টেণ্ডার করে হয়েছিল কিনা তা নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন উঠতেই পারে। কী সাক্সেনা, ঠিক বলছি তো?'

শেষ প্রশ্নটা, বলাই বাহুল্য, অমিত সাক্সেনার উদ্দেশে। সাক্সেনা ঘাড় নেড়ে জানাল গৌতম ঠিকই বলছে।

'যাই হোক, ব্রিজের যে প্ল্যানটা স্যাংশান করা হয়েছিল পরে দেখা গেছে সেটা অনুযায়ী কাজ হয়নি। তাছাড়া বিল্ডিং মেটিরিয়ালসও সাবস্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটির ছিল। ন্যাশানাল হাইওয়ের অনুমোদন ছাড়াই প্ল্যানে যে পরিবর্তন করা হয়েছিল সেটা অনুমোদন করেছিল সৈকত চৌধুরি। মেটিরিয়াল পারচেজও সে-ই অনুমোদন করেছিল। অন্তত কাগজপত্রে একমাত্র তারই সই আছে। সৈকত অবশ্য বলছে এই পরিবর্তনগুলো এবং সাবস্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটির মেটিরিয়াল সে জ্ঞানত অনুমোদন করেনি। এই পরিবর্তনগুলো যে ব্রিজটাকে কমজোরি করে দিয়েছিল এটা সে স্বীকার করছে। সে এটাও বলছে যে পরিবর্তিত প্ল্যান অনুযায়ী খারাপ মালমশলা দিয়ে ব্রিজটা বানালে খরচ অর্ধেক হয়ে যাবার কথা।'

'তাহলে সৈকত ওই কাগজে সই করল কেন?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

সৈকত বলছে ও যখন অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল তখন ওকে দিয়ে তাড়াহুড়ো করে সইগুলো করিয়ে নেওয়া হয়েছে। ও খেয়াল করেনি কোথায় সই করছে।'

'সইটা কে করিয়েছিল?'

'আমরা সৈকতের কম্পানির দুজন কর্মচারীকে আইডেন্টিফাই করেছি যারা সৈকতকে দিয়ে সইগুলো করিয়ে নিয়েছিল। তারা দুজনেই অবশ্য বলছে সৈকত জেনে-বুঝেই সইগুলো করেছে।'

সৈকতের পার্টনার এই সময় কী করছিল? তার কাছে কাগজগুলো নিয়ে যাওয়া হয়নি কেন?'

'যে সময় সইগুলো হয়েছে সেই সময় সৈকতের পার্টনার মণিময় নাকি দেশের বাইরে ছিল। অন্তত সে সেরকমই বলেছিল।'

'এর মধ্যে এইস বিল্ডার্স আসছে কোথায়? দত্ত কনস্ট্রাকশান্সই বা কোথায় আসছে?'

'এই কেলেঙ্কারিটার দুটো অংশ। প্রথমটা ব্রিজের প্ল্যান বদলে দেওয়া, দ্বিতীয়টা খারাপ কোয়ালিটির মালমশলা দিয়ে ব্রিজটা বানানো। এই দ্বিতীয় স্ক্যামটার সঙ্গে এইস বিল্ডার্স এবং দত্ত কনস্ট্রাকশান্স আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। এইস বিল্ডার্সকে অবশ্য সরাসরি ধরা যাবে না। কারণ, তারা কাজের একটা বড় অংশ দত্ত কনস্ট্রাকশান্সকে সাব-কনট্রাক্ট করে দিয়েছিল। খারাপ মালমশলা কেনার বিলগুলো অবশ্য গুপ্ত অ্যান্ড চৌধুরি অনুমোদন করেছে। এবং এখানেও সমস্ত বিলগুলো অনুমোদন করেছে সৈকত চৌধুরি। মণিময় গুপ্তর সই কোথাও নেই।'

'এটা তো খুবই আশ্চর্য ব্যাপার।'

'হ্যাঁ, আরও আশ্চর্য ব্যাপার হলো কলকাতা পুলিশ মণিময়ের নরেন্দ্রপুরের বাড়ি থেকে মণিময়ের যে পাসপোর্টটা উদ্ধার করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে মণিময় বহুদিন দেশের বাইরে যায়নি। তার মানে, যখন সৈকত এই সব কাগজপত্রে সই করছে তখন মণিময় আসলে ঘাপটি মেরে তার নরেন্দ্রপুরের বাড়িতে বসে ছিল, পাছে দুনম্বরি কাগজে তাকে সই করতে হয়। অর্থাৎ পুরো প্ল্যানটাই সৈকতকে সামনে রেখে এবং ভিকটিম বানিয়ে মণিময় এবং অসীম দত্ত করেছে।' গৌতম থামল।

'এখানে আরও একটা ব্যাপার আছে।' এতক্ষণে অমিত সাক্সেনা মুখ খুলেছে। 'আমাদের ফরেনসিক অডিটার রাজীব অগ্রবাল এইস বিল্ডার্স এবং দত্ত কনস্ট্রাকশান্স-এর অ্যাকাউন্টসগুলো ভাল করে দেখে বুঝতে পেরেছে সিমজুড়ি ব্রিজ ছাড়াও এইস বিল্ডার্স তাদের অনেকগুলো দুনম্বরি ট্র্যানজাকশান দত্ত কনস্ট্রাকশান্সকে দিয়ে করিয়েছে। এইস বিল্ডার্স-এর বকলমে দত্ত কনস্ট্রাকশান্স বেশ মোটা টাকার ব্যাঙ্ক লোনও নিয়েছে যেগুলো তারা শোধ করেনি। দত্ত কনস্ট্রাকশান্স কোম্পানিটা সম্ভবত খুব শিগগির নিজেদের দেউলিয়া ডিক্লেয়ার করে বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তারা এর মধ্যেই বিপুল পরিমাণ টাকা অন্য জায়গায়, মানে অসীম দত্ত

এবং অনিকেত দত্তর প্রাইভেট অ্যাকাউন্টে, সরিয়ে দিয়েছে। সেগুলো, বলাই বাহুল্য, হিসেব বহির্ভূত টাকা, মানে ব্ল্যাক মানি। সব মিলিয়ে এটাই দাঁড়াচ্ছে যে এই দুনম্বরি ডিলগুলোতে বাবা এবং ছেলে এক সঙ্গে ছিল।'

'আচ্ছা, আপনারা নিশ্চয় সৈকতের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলো চেক করেছেন। সেখানে কি কোনও বড় টাকা ঢুকেছিল? মানে, এই ডিলটা থেকে সৈকত টাকা পেয়েছিল এরকম প্রমাণ কি আছে?'

'আমরা সৈকতের সব কটা অ্যাকাউন্ট চেক করেছি। সেরকম কোনও প্রমাণ পাইনি। তবে সৈকত যদি ক্যাশ নিয়ে থাকে তাহলে অন্য কথা। আমরা ভাবছি সৈকতের বাড়িটা একবার সার্চ করব। হয়ত একই সঙ্গে সৈকতের বাবার বাড়িটাও সার্চ করতে পারি।' অমিত সাক্সেনা ঠান্ডা গলায় জানাল।

'আমি একটু অ্যাড করতে পারি?' রাজীব অগ্রবাল তার বসের দিকে তাকিয়ে অনুমতি চাইল।

'বল, কী বলবে।'

'আমি বলছি, সৈকতের অ্যাকাউন্টে কোনও মোটা টাকা তো ঢোকেইনি, বরং গত ছমাসের মধ্যে সাত-আটটা ট্রাঞ্চে প্রায় তিরিশ লাখ টাকা সৈকতের অ্যাকাউন্ট থেকে বেরিয়ে গেছে। সবগুলোই ক্যাশ উইথড্রয়াল। টাকাটা নিয়ে সৈকত কী করেছে আমরা জানি না। বারবার সৈকতকে জিজ্ঞেস করেও কোনও উত্তর পাইনি। আমার মনে হয় এটা একটা রেলেভেন্ট ইনফরমেশান।'

আদিত্য ভুরু কুঁচকে শুনছে। সৈকত দুনম্বরি টাকার বখরা পায়নি, উল্টে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে টাকা দিয়েছে। কাকে টাকা দিল? কেন দিল?

'আমরা এখনও কিন্তু দুএকটা ব্যাপার বুঝতে পারিনি।' সাক্সেনা বলতে শুরু করেছে।'তার মধ্যে সব থেকে পাজলিং হচ্ছে এই খুনগুলো। দাশগুপ্ত সাহেব বললেন আপনি এই খুনগুলোর মিস্ট্রি সলভ করার ব্যাপারে অনেকটা প্রগ্রেস করেছেন। আমরা তো যেটুকু জানতে পেরেছি আপনার সঙ্গে শেয়ার করলাম। এবার আপনি যতটা জানতে পেরেছেন যদি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেন, খুব ভাল হয়।' অমিত সাক্সেনা আদিত্যর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

এর পরের এক ঘণ্টা আদিত্য বক্তা, অন্যরা শ্রোতা।

ডিনার খেয়ে আদিত্য যখন বাড়ি ফিরল তখন রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা। কেয়া ঘুমিয়ে পড়েছে।

নবম পরিচ্ছেদ

(১)

সকাল থেকে একটার পর একটা ফোন। মাঝে মাঝে এরকম হয়। প্রথম ফোন সকাল আটটায়। আদিত্যর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সে বিছানায় শুয়ে আলস্য করছিল। সপ্তাহের প্রথম দিন, কেয়া আগেই উঠে পড়ে স্কুল যাবার তোড়জোড় করছে।

বিমলের ফোন। এত সকালে বিমল সাধারণত ফোন করে না। আদিত্য ঘুম বিজড়িত গলায় বলল 'হ্যালো।'

'একটু দরকারে সকাল সকাল বিরক্ত করছি স্যার।' বিমলের গলায় অবশ্য কুণ্ঠার চিহ্নমাত্র নেই। 'সমীর প্যাটেল আজ বিকেলে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাচ্ছে। বেলা এগারোটা থেকে একটা ভিজিটিং আওয়ার আছে। আপনি কি ওই সময় গিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলবেন? আপনি বলছিলেন না ওর সঙ্গে একদিন কথা বলতে চান?'

'আমি চাইলেই কি ও আমার সঙ্গে কথা বলবে?'

'সে ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি স্যার। ওর সঙ্গে গিয়ে ভাব করেছি। আপনার কথা বলেছি। বলেছি, আপনি অনিতা ম্যাডামকে সাহায্য করছেন। ও অনিতা ম্যাডামের সঙ্গে কথা বলে দেখে নিয়েছে আমি সত্যি বলছি কিনা। এত কিছু করে ও আপনার সঙ্গে কথা বলতে রাজি হয়েছে। আমি ওকে এক রকম বলেই রেখেছি যে আজ এগারোটার সময় আপনি ওর সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।'

'ওই সময় কি অনিতাও থাকবে?'

'মনে হয় না স্যার। অনিতা ম্যাডাম বিকেলে রুগিকে ডিসচার্জ করার সময় থাকবেন। তার মানে সকালে আর আসবেন না। সমীর প্যাটেলকেও সেই রকম বলে গেছেন।'

'আর সমীরের বাড়ির লোক?'

'সমীরের বাড়ির লোক খুব একটা আসে না। অনিতা ম্যাডামই ওর বাড়ির লোক।'

'তা হলে তো মন খুলে কথা বলা যাবে। আমি যাব। তুমি থাকবে তো?'

'নিশ্চয় থাকব স্যার। পৌনে এগারোটা নাগাদ হাসপাতালের সামনে পৌঁছে যাব। আপনি চেনেন তো জায়গাটা?'

'চিনি। কিওর মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল। বাইপাসের ধারে। পাটুলির আগের স্টপ। তোমার সঙ্গে হাসপাতালের সামনে দেখা হবে। আর শোনো। তোমার জুয়াড়িদের খবর কী?'

'সেই রকমই চালিয়ে যাচ্ছে স্যার। যে নাইট ক্লাবে ওরা জুয়া খেলতে যায় সেখানকার দরোয়ান বলল, জুয়া খেলতে গিয়ে ওদের নাকি বিরাট ধার হয়ে গেছে। ও হ্যাঁ, আর একটা জিনিস জেনেছি। ওরা নাকি শালা-ভগ্নিপতি। লম্বাটা ভগ্নিপতি, বেঁটেটা শালা। আজ তা হলে রাখি স্যার?'

কেয়া চা তৈরি করে রেখে বাথরুমে ঢুকেছে। বাথরুমের বাইরে বেসিনে দাঁত ব্রাশ করতে করতে আদিত্যর হঠাৎ মনে হল মিঞা কি তোড়ি শুনলে বেশ হয়। চা-টা মাইক্রোওয়েভে গরম করে নিয়ে সে বসার ঘরে এসে ল্যাপটপে জমিয়ে রাখা কিশোরী আমোনকরের মিঞা কি তোড়ি চালাল। অনেক দিন এটা শোনা হয়নি।

বিশুদ্ধ জয়পুর ঘরানার গান। শুদ্ধ আকারে বিস্তার। আদিত্য ইজি চেয়ারে আরাম করে বসল। কী শান্তি! কী শান্তি! এক একটা স্বর মনে হচ্ছে মাইল মাইল লম্বা। এর ওপর দিয়ে যতই পথ হাঁটো, রাস্তা কিছুতেই ফুরোবে না। কিশোরী এক একটা স্বর থেকে নিংড়ে নিংড়ে সুর বার করে নিচ্ছেন। কিন্তু নেবার পরেও যেন আরও সুর বাকি রয়ে যাচ্ছে। মিঞা কি তোড়ি অশেষ, অসীম, অনন্ত!

আর একটু চা খেলে হত। পটের মধ্যে যেটুকু চা তলানিতে রয়ে গেছে সেটা গরম করে খেলে ঠিক যুত হবে না। আদিত্য আবার জল বসাতে যাচ্ছিল, তার আগেই ফোন। প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও আদিত্য গানটা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হল। আদিত্যর বন্ধু ক্রিমিন্যাল লইয়ার সুনন্দ সরকার ফোন করছে।

'বল। কোনও খবর আছে?' আদিত্য ফোন তুলে বলল।

'আছে। খারাপ খবর। দীপশিখা চৌধুরির আগাম জামিনের আবেদন কোর্ট নাকচ করে দিয়েছে।'

'কেন? কী হল?'

'পুলিশ নাকি দীপশিখার এগেন্সটে কিছু একটা ইনক্রিমিনেটিং এভিডেন্স পেয়েছে যেটা কনফিডেন্সিয়ালি জজ সাহেবকে তারা দেখিয়েছে। আমরা সেটা দেখতে পাইনি। পুলিশ বলছে, এভিডেন্সটা এখনই পাবলিক করলে তদন্তের ক্ষতি হবে। জজ সাহেব সেটা মেনে নিয়েছেন।'

'তাহলে এখন কী হবে?'

'কী আর হবে? দীপশিখাকে অ্যারেস্টেড হতে হবে। কিন্তু অ্যারেস্ট করার পর পুলিশ নিশ্চয় আবার ওকে কোর্টে প্রোডিউস করবে। করলে তখন দেখা যাবে।'

'ঠিক আছে। তাই হোক। তুই আর কী করবি? তুই তো যা করার করলি।'

'না, না। এখনও সব কাজ করা হয়নি। যেমন, এখনও তোর বউএর সঙ্গে আলাপই করা হয়নি। তুই বল কবে বউকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে ডিনার খেতে পারবি?'

'এক সপ্তাহ পরে বললে চলবে? এই উইকটা খুব ঝামেলা চলছে।'

'চলবে। তা হলে এক সপ্তাহ পরে তুই ফোন করে জানাচ্ছিস কবে আমরা এক সঙ্গে ডিনার খাচ্ছি।। আর এর মধ্যে পুলিশ যদি দীপশিখাকে অ্যারেস্ট করে কোর্টে তোলে, তোকে জানাব কী হল। আজ তা হলে রাখছি। বাই।'

ফোনটা রেখে আদিত্য একবার ভাবল গানটা আবার চালিয়ে দেবে। কিন্তু দীপশিখার খবরটা তাকে একটু অন্যমনস্ক করে দিয়েছে। গান শোনার মুড আর নেই। কেয়া বাথরুম থেকে বেরিয়েছে।

'তুমি কখন বেরবে? সকালে উঠে টিফিন বানিয়ে রেখেছি। নিয়ে বেরিও।'

'আমি সোয়া দশটা নাগাদ বেরোব। তুমি কখন বেরোবে?'

'আমি এক্ষুনি বেরিয়ে যাচ্ছি। আজ পেরেন্ট-টিচার্স মিটিং আছে। একটু দেরিই হয়ে গেল।'

কেয়া শাড়ি-জামা পাল্টাতে তাড়াহুড়ো করে শোবার ঘরে ঢুকে গেল। আদিত্য রান্নাঘরে ঢুকে কফির জল বসিয়েছে। দেখল, খাবার টেবিলে কেয়া দুটো টিপিনবাক্স পাশাপাশি সাজিয়ে রেখেছে। একটা টিপিনবাক্স খুলে আদিত্য দেখল কেয়া চিকেন ম্যাকারনি বানিয়েছে। এটা কেয়া চমৎকার বানায়। আদিত্য টিপিনবাক্সর ঢাকাটা বন্ধ করে দিল।

কেয়া বেরিয়ে যাবার আগে গলা তুলে বলল, 'আসছি।' তারপর গলাটা একটু নামিয়ে বলল, 'কালকের কথা মনে আছে তো? কাল কিন্তু রাখিদির অপরেশন। আমরা সকাল সকাল বেরিয়ে যাব।'

আদিত্যর মনে ছিল। সে কেয়ার হাতটা একটু ছুঁয়ে বলল, 'এসো।'

কফিটা বানিয়ে আদিত্য একটু বসেছে, আবার ফোন। এবার সুভদ্র মাজি।

'একটা খবর দেবার ছিল। খবরটা কনফিডেনশিয়াল। তাও মনে হল আপনাকে একবার জানানো উচিত।'

'বলুন, কী খবর।' আদিত্য গলায় ঈষৎ উৎকণ্ঠা। যথেষ্ঠ কারণ ছাড়া সুভদ্র মাজি ফোন করবে না।

'একটু আগে দীপশিখা অ্যারেস্টেড হয়েছে। উড়িষ্যার টিমটা ওকে উড়িষ্যা নিয়ে যাচ্ছে। দীপশিখা অ্যান্টিসিপেটারি বেল-এর জন্য কোর্টে গিয়েছিল, কিন্তু কোর্ট ওর প্লি রিজেক্ট করে দিয়েছে।'

'কেন রিজেক্ট করল জানেন? দীপশিখার জন্য লইয়ার তো আমিই ঠিক করে দিয়েছিলাম। আমার বন্ধু সুনন্দ সরকার কেসটা প্লিড করেছিল। একটু আগে ও আমাকে ফোন করে বলল, পুলিশের হাতে কী যেন একটা ইনক্রিমিনেটিং এভিডেন্স এসেছে। সেটা জজ সাহেবকে দেখানোর পরে উনি অ্যান্টিসিপেটারি বেল-এর আবেদন নাকচ করে দিয়েছেন। এভিডেন্সটা ঠিক কি আপনি জানেন?'

সুভদ্র মাজি উত্তর দিতে দেরি করছে দেখে আদিত্যর মনে হলো সে বোধহয় একটা অন্যায্য প্রশ্ন করে ফেলেছে। সে তাড়াতাড়ি বলল, 'আমার প্রশ্নটা যদি আপনাকে অস্বস্তিতে ফেলে তা হলে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আপনাকে উত্তর দিতে হবে না।'

'আপনার প্রশ্নটা আমাকে অস্বস্তিতে ফেলেছে শুধুমাত্র এই কারণে যে আমি এটার উত্তরটা জানি না। জানলে আপনাকে জানাতে ইতস্তত করতাম না। অবশ্য উত্তরটা একেবারে জানি না বললে মিথ্যে বলা হবে। আমি শুধু এইটুকু শুনেছি যে ডিএসপি কৃষ্ণ পধি গোল্ডেন স্যান্ড রিসর্ট থেকে একটা সিসি টিভির ফুটেজ পেয়েছেন যেটা নাকি ভীষণভাবে দীপশিখার বিরুদ্ধে যাচ্ছে। এর বেশি আমি আর কিচ্ছু জানি না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ ইন্সপেক্টার মাজি। আপনি যেটুকু বললেন সেইটুকু জেনেও আমার উপকার হল। আমি ভেবেছিলাম গোল্ডেন স্যান্ড রিসর্টে সিসি টিভিই বসেনি।'

'সব জায়গায় মনে হয় বসেনি। তবে কোনও কোনও জায়গায় বোধহয় বসেছিল।'

আরও কিছুক্ষণ পরে আদিত্য ব্রেকফাস্ট খেয়ে ব্যাকপ্যাকে ল্যাপটপ এবং টিপিন বাক্স পুরে নিয়ে বেরোতে যাবে আবার তার মোবাইলটা বেজে উঠল। কলটা হোয়াটসঅ্যাপে এসেছে। নম্বরটা সেভ করা ছিল বলে আদিত্য বুঝতে পারল ইনশিয়োরেন্স কোম্পানির সেই ডিটেকটিভ, বিপ্লব সমাদ্দার ফোনটা করেছে। বিপ্লব সমাদ্দার তো তাকে এক রকম ভাগিয়ে দিয়েছিল, তা হলে সে আবার ফোন করছে কেন? আদিত্যর কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। তাছাড়া, হোয়াটসঅ্যাপে কল করা মানে খুব সম্ভবত বিপ্লব সমাদ্দার চায় না তাদের কথাবার্তা কেউ আড়ি পেতে শুনুক। কেন এত সাবধানতা? এখন ফোনটা ধরতে গেলে হাসপাতালে পৌঁছতে একটু দেরি হয়ে যাবে, বিমল অপেক্ষা করে থাকবে। তবু কৌতূহলবশত আদিত্য ফোনটা ধরল।

'আদিত্যবাবু, আপনার সঙ্গে কি কিছুক্ষণ কথা বলা যাবে?'

'আমি বেরোচ্ছিলাম। ঠিক আছে, পাঁচ মিনিট কথা বলতে পারি। বলুন, কী ব্যাপার?'

'সেদিন আপনি ফোন করে সৈকত চৌধুরির কেসটা নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন। আমি বলতে রাজি হইনি কারণ আমাদের কোম্পানির দিক থেকে কিছু রেস্ট্রিকশান ছিল। মনে আছে?'

'হ্যাঁ, মনে আছে। তা এখন কথা বলতে চাইছেন কেন? কোম্পানির রেস্ট্রিকশান উঠে গেছে? আমি ধরে নিচ্ছি সৈকত চৌধুরির কেসটা নিয়েই আপনি কথা বলতে চান।'

'হ্যাঁ, ওটা নিয়েই কথা বলতে চাই। আমাদের কোম্পানির তরফ থেকে আপনাকে একটা অফার দিতে চাই। আমাদের কোম্পানি আপনাকে এই কেসটাতে এনগেজ করতে চাইছে। এর জন্যে বলাই বাহুল্য একটা খুব ভাল ফি আপনাকে দেওয়া হবে।'

'আমাকে কী করতে হবে?'

'আপনাকে কোম্পানির হয়ে অনিতা চৌধুরির বিরুদ্ধে একটা কেস বিল্ড আপ করতে হবে। যাতে এটাই প্রমাণিত হয় যে সৈকত চৌধুরিকে খুন করার ষড়যন্ত্রে অনিতা চৌধুরি শামিল ছিল। যদি প্রমাণ করা যায় যে সৈকত খুন হবার পেছনে অনিতা চৌধুরির হাত আছে, তা হলে কম্পানিকে ইনশিয়োরেন্স-এর টাকাটা দিতে হবে না। টাকাটা অনেক, তাই এটা নিয়ে কম্পানি চিন্তিত।'

'কিন্তু আমি তো এখনও জানি না অনিতা এই খুনের পেছনে আছে কিনা।'

'অনিতা আর তার বয়ফ্রেন্ড সৈকতকে খুন না করলে আর কে করতে পারে? ওদেরই তো সব থেকে জোরালো মোটিভ।'

'ওদের একটা মোটিভ আছে স্বীকার করছি। কিন্তু মোটিভ অন্যদেরও থাকতে পারে।'

'যেমন?'

'যেমন, বাড়ির অমতে বিয়ে করার জন্যে অনিতার ওপর অনিতার দাদা সঞ্জয় শর্মার রাগ ছিল। একবার একটা গুন্ডাকে নিয়ে সে সৈকত চৌধুরিকে ফিজিকালি অ্যাসল্ট করার চেষ্টা করেছিল। সে সৈকতকে খুন করতেই পারে। অনার কিলিং-এর ঘটনা তো আমাদের দেশে নতুন নয়। তাছাড়া আরও আছে।'

'আর কে আছে?'

'আপনি জানেন কিনা জানি না, একটা ব্রিজ ভেঙে পড়ার ব্যাপারে সৈকতকে সিবিআই ইন্টারোগেট করছিল। সৈকত সব কিছু রিভিল করলে শুধু সৈকতের কোম্পানি নয়, যে কন্টাকটর ব্রিজটা বানিয়েছিল তারাও বিপদে পড়ত। এমন তো হতেই পারে অনিকেত দত্ত বলে সেই কন্ট্রাকটর নিজের কুকীর্তি চাপা দেবার জন্যে সৈকত এবং তার পার্টনার মণিময়কে সরিয়েছে। আমার মনে হয়, এছাড়াও আরও অনেক পসিবিলিটি আছে। কোনটা আসলে ঘটেছে আমি জানি না, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে সৈকত এবং মণিময়ের মৃত্যু দুটো রিলেটেড।'

'দেখুন আদিত্যবাবু, আপনার কী মনে হয় সেটা আমাদের কোম্পানির কাছে আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়। আপনি আমাদের অফারটা নিলে কোম্পানির স্বার্থটা দেখাই আপনার একমাত্র দায়িত্ব হবে। অর্থাৎ আপনাকে এমনভাবে কেসটা সাজাতে হবে যাতে ইনশিয়োরেন্সের টাকাটা কোম্পানিকে না দিতে হয়। এর জন্যে আপনি যথেষ্ট পারিশ্রমিক পাবেন। ইন ফ্যাক্ট, পারিশ্রমিকের অঙ্কটা নেগোশিয়েবল। আপনি নিজে কোম্পানির বসেদের সঙ্গে ওটা নেগোশিয়েট করতে পারেন।'

আদিত্যর হঠাৎ রাগ হয়ে গেল। তাছাড়া বেরোতেও দেরি হয়ে যাচ্ছে। সে রুক্ষভাবে বলল, 'সমাদ্দারবাবু, আপনার জানা দরকার আমি ঘুষ নিয়ে কাজ করি না। আমার ইন্টিগ্রিটি টাকা দিয়ে কেনা যায় না। দয়া করে আমার সময় নষ্ট করবেন না।' আদিত্য ফোনটা কেটে দিল।

আদিত্য বাইরে বেরিয়ে টের পেল হালকা বৃষ্টি নেমেছে। রোজকার মতো আজও সঙ্গে ছাতা নেই। থাকবেই বা কেন? এটা তো বৃষ্টির সময় নয়। তবু এবছর বারবার অকালে বৃষ্টি হচ্ছে। খনার বচন মনে পড়ে গেল—যদি বর্ষে ফাগুন / শস্য হবে দ্বিগুণ। ফাগুন কি শুরু হয়ে গেছে? সম্ভবত। এমনিতেই দেরি হয়ে গেল। এখন বাড়ি ফিরে ছাতা আনতে গেলে আরও দেরি হয়ে যাবে। তার থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে নেওয়া যাক। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচা যাবে, তাড়াতাড়ি পৌঁছনোও যাবে। তাছাড়া এখন আর ভিড় বাসে উঠতে ইচ্ছে করছে না। বিপ্লব সমাদ্দার মেজাজটা একেবারে খারাপ করে দিয়েছে।

সমীর প্যাটেলের গায়ের রং পরিষ্কার, চোখ দুটো ভাসা ভাসা, নাকটা ঈষৎ চাপা, কপালটা ছোট, মাথায় শাসনহীন ঝাঁকড়া চুল, সব মিলিয়ে বেশ মেয়েলি চেহারা। রোগা শরীরটা দেখে তেমন শক্তপোক্ত মনে হয় না। তার ওপর কপালে এবং বাঁ হাতে এখনও ব্যান্ডেজ।

সমীর শুয়েছিল। আদিত্যদের দেখে উঠে বসার চেষ্টা করল। ঘরে অপর বেডটা ফাঁকা। দুটো চেয়ারের একটাতে আদিত্য বসেছে। অন্য চেয়ারটাতে প্লাস্টিকে মোড়া কিছু জিনিসপত্র রয়েছে। বাড়ি যাবার সময় ওগুলো বোধহয় রুগি সঙ্গে নিয়ে যাবে। বিমল বসার জায়গা না পেয়ে অন্য বিছানাটায় বসল।

'আমি আপনার কথা অনিতার কাছে অনেক শুনেছি।' সমীর প্যাটেল মোটামুটি পরিষ্কার বাংলা বলে যদিও তার উচ্চারণে অবাঙালি টান আছে।

'আপনার ব্যাপারে অনিতার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। অনিতা আপনাকে খুব বিশ্বাস করে। আশা করি আপনি সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।' আদিত্য গম্ভীর গলায় বলল।

'আপনি এই কথা কেন বলছেন আমি জানি।' সমীর সরাসরি মূল বিষয়ে চলে এসেছে। তার মুখও বেশ গম্ভীর। 'গত পরশু মানে শনিবার আপনি অনিতাকে কয়েকটা ছবি দেখিয়েছিলেন। পরে হোয়াটসঅ্যাপ করে ছবিগুলো অনিতাকে পাঠিয়েও দিয়েছেন। ছবিগুলো পার্ক স্ট্রিটে তোলা। ছবিগুলোতে আমার সঙ্গে অনিতার দাদা সঞ্জয়কে দেখা যাচ্ছে। এটা নিয়ে অনিতা ভীষণ আপসেট। শনিবারই বিকেলে এসে আমাকে ছবিগুলো দেখাল।'

আদিত্য চুপ করে শুনছে। মনে হচ্ছে, সমীর প্যাটেলের আরও কিছু বলার আছে।

'আমি ভেবে দেখলাম, ভালই হল আপনি ছবিগুলো অনিতাকে দেখিয়েছেন। যে কথাগুলো আমি অনিতাকে বলতে চাইছিলাম কিন্তু পারছিলাম না, এখন সেই কথাগুলো ওকে বলতেই হল। আমার কন্সান্স এখন একদম ক্লিয়ার। কিন্তু মুশকিল হল, অনিতা আমাকে পুরোটা বিশ্বাস করছে না। ও ভাবছে আমি এখনও কিছু লুকিয়ে যাচ্ছি। এ-ব্যাপারে আপনি যদি আমাকে সাহায্য করেন, আই শ্যাল রিমেন রিয়ালি গ্রেটফুল।'

'কী কথা আপনি অনিতাকে বলতে পারছিলেন না?'

'কথাগুলো আমি শুধু আপনাকেই বলব। আর রিকোয়েস্ট করব অনিতা ছাড়া আর কারও সঙ্গে যেন আপনি এটা নিয়ে ডিসকাস না করেন।' সমীর প্যাটেল বিমলের দিকে তাকাল।

বিমল ইঙ্গিতটা ধরতে পেরেছে। সে আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি নীচের লবিতে আপনার জন্যে ওয়েট করছি স্যার।'

আধঘণ্টা পরে সমীর প্যাটেলের কথা শেষ হয়ে গেলে আদিত্য ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে বলল, 'আমি আপনার কথাগুলো আগে ক্রসচেক করব। যদি আমি স্যাটিসফাইড হই তাহলে অনিতার সঙ্গে কথা বলব। আর একটা কথা। অনিতার স্বামী খুন হয়ে গেছে। আমরা সেটা ইনভেস্টিগেট করছি। ইনভেস্টিগেশনের স্বার্থে আপনার কথাগুলো সম্ভবত পুলিশকে জানাতে হবে। তবে যদি আপনি সত্যি কথা বলে থাকেন, আমি গ্যারেন্টি দিচ্ছি, ইট ওন্ট গো এগেন্সট ইউ।'

লবিতে নেমে আদিত্য দেখল বিমল এক কোণে বসে টিভি দেখছে। আদিত্য তাকে বিরক্ত না করে টেলিফোনে সুভদ্র মাজির নম্বরটা লাগাল।

'একটা হেল্প চাইছি। একটা লোককে ধরে তার পেট থেকে কিছু কথা বার করতে হবে। হয়তো একটু থার্ড ডিগ্রি লাগতে পারে। লোকটা গুণ্ডা টাইপের। নাম সঞ্জয় শর্মা। ঠিকানা ....'

(২)

আদিত্য আর কেয়া যখন হাসপাতালে পৌঁছল তখনও ন'টা বাজেনি। মস্ত বড় কমপাউন্ড, সার্জারি উইংটা কমপাউন্ডের উত্তর দিকে। প্রদীপ চক্রবর্তী বলে দিয়েছিলেন সোজা ছতলায় চলে আসতে। ওখানেই ওটি। রিকভারি রুম। ইনটেন্সিভ কেয়ার ইউনিট। এসবের বাইরে পেশেন্টের বাড়ির লোকজনদের জন্যে একটা ওয়েটিং রুম আছে। লিফট থেকে নেমে বাঁদিকে।

এটা কলকাতা শহরের সব থেকে দামি হাসপাতাল। বিলাসবহুল, ঝকঝকে, হোটেল-হোটেল। আদিত্য আন্দাজ করল হাসপাতাল বাছার স্বাধীনতাটা প্রদীপ চক্রবর্তীর ছিল না। ডাঃ অরুণ কুলকার্নি যেখানে চাইবেন সেখানেই অপরেশনটা করাতে হবে।

ওয়েটিং রুমে চার-পাঁচজন অপেক্ষা করছে। দুটো আরাম কেদারা আছে যেখানে গা এলিয়ে দিয়ে অনায়াসে ঘুমিয়ে নেওয়া যায়। আপাতত দুটোই অন্যদের দখলে। প্রদীপ চক্রবর্তী একটা বই খুলে

বসেছিলেন, পড়ছিলেন কিনা বলা শক্ত। আদিত্যদের ঢুকতে দেখে বললেন, 'রাখিকে এখনও ওটিতে নিয়ে যায়নি। নার্স বলেছে নিয়ে যাবার সময় আমাদের ডাকবে।'

'রাখিদি কেমন আছে?' কেয়া জিজ্ঞেস করল। তার গলার উৎকণ্ঠাটা বানানো নয়।

'এখন তো দেখতে দিচ্ছে না, তাই সকালে ফোন করেছিলাম। খুশ মেজাজে আছে। তবে কমপ্লেন করছিল কাল থেকে লিকুইড ডায়েটে রেখে দিয়েছে। কাল বেশ খিদে ছিল। আজ সকাল থেকে আর তেমন খিদে নেই। হয়ত সিডেটিভ দিচ্ছে।'

'ডাঃ কুলকার্নির সঙ্গে কথা বলেছেন?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'নাঃ, সে সুযোগ এখনও পাইনি। তবে শুনলাম কাল রাত্তিরবেলা উনি কলকাতায় পৌঁছে গেছেন। বড় অপরেশান থাকলে উনি নাকি ভোরবেলা উঠে নিজে গণেশ পুজো করেন। সেসব করে-টরে এখনও বোধহয় এসে পৌঁছননি।'

'এটা কে বলল?'

'ওঁর জুনিয়র ডাক্তার বললেন, যিনি ডাঃ কুলকার্নিকে অ্যাসিস্ট করবেন।'

'ভাবা যায়? এত বড় ডাক্তার, তিনিও পুরোপুরি বিজ্ঞানের ওপর ভরসা রাখতে পারছেন না। দৈবী শক্তির সাহায্য নিতে হচ্ছে।' আদিত্য নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলল।

'আসলে কী জানো,' প্রদীপ আজকাল আদিত্য আর কেয়া দুজনকেই তুমি বলছেন। 'ডাক্তারি, বিশেষ করে এই শল্য চিকিৎসার ব্যাপারটা, পুরো সায়েন্স নয়, কিছুটা আর্টও বটে। সার্জেনের হাতের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। কিছুটা ভাগ্যের ওপরেও। যেখানেই ভাগ্য ঢুকছে সেখানেই তার হাত ধরে গণেশ ঠাকুর, রাহু-কেতু, আঙটি-তাবিজ এইসব ঢুকে পড়ছে। এই যে ধরো ডাঃ কুলকার্নি, এত বড় সার্জেন, কিন্তু ওঁর আঙুলে নাকি মস্ত বড় একটা পলার আঙটি আছে। একবার একটা বড় অপরেশনের আগে আঙটি থেকে পলাটা খুলে পড়ে গিয়েছিল। যতক্ষণ না সেটাকে খুঁজে পাওয়া গেল এবং আঙটিতে আবার লাগিয়ে নেওয়া হল, উনি অপরেশান শুরুই করলেন না। এটা আমি ওঁর ওপর একটা লেখায় পড়েছি।'

'তাহলে তো বলতে হবে পলা আর গণেশ পুজোই আসল কাজটা করছে। উনি তাহলে কী করছেন?'

'না, না। ব্যাপারটা অতটা খারাপ নয়। উনি যেটা পারেন, এবং যেটা ওঁর মতো আর কেউ পারে না, সেটা হল টিউমারটাকে কীভাবে অ্যাপ্রোচ করা হবে, মানে কোথা দিয়ে কাটলে টিউমারটার কাছে সব থেকে সহজে, সব থেকে নিরাপদে পৌঁছনো যাবে, সেটা ঠিক করা। এটার জন্য অসম্ভব ভাল কনসেপশান এবং ইম্যাজিনেশানের দরকার। তবু বলব, এই ধরনের অপরেশনে একটা বড় লাক ফ্যাক্টর থেকেই যায়।' বলতে বলতে প্রদীপ চক্রবর্তীর গলাটা কেঁপে গেল।

'রাখি চক্রবর্তীর বাড়ির লোক কে আছেন? একবার কথা বলে নিন, পেশেন্টকে ওটিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।' একজন বয়স্কা নার্স ঘরে ঢুকে বললেন।

'আমরা তিনজনেই যেতে পারি?' কেয়া নার্সটিকে জিজ্ঞেস করল।

'চলুন, তবে বেশি সময় নেবেন না। আর দেখবেন ওয়ার্ডে ঢোকার মুখে শু-কভার রাখা আছে। প্রত্যেকে জুতোয় শু-কভার লাগিয়ে নেবেন।

লাইন করে ওরা তিনজন ভিতরে ঢুকল। সবার আগে প্রদীপ চক্রবর্তী। সব শেষে, বাকিদের থেকে একটু দূরত্ব রেখে, আদিত্য। রুগির পোশাক পরা স্ট্রেচারে শোয়া রাখি চক্রবর্তীকে অন্য রকম দেখাচ্ছে। প্রদীপ চক্রবর্তী এগিয়ে গিয়ে স্ত্রীর হাত দুটো কিছুক্ষণ ধরে রইলেন। অস্পষ্টভাবে দুএকটা কথাও বললেন। কী বললেন, আদিত্য শুনতে পেল না। তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে কেয়াকে বললেন, 'তুমি রাখিকে কিছু বলবে?'

কেয়া হড়বড় করে অনেক কিছু বলে গেল। তার মোদ্দা বক্তব্য, এই অপরেশানটা কোনও ব্যাপারই নয়। কিছুদিনের মধ্যেই রাখি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসবেন। তখন আবার কোথাও এক সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া

যাবে। কেয়ার কথা শুনে রাখি ম্লান হাসছেন।

আদিত্য কোনও কথা না বলে হাত তুলল। উত্তরে রাখি চক্রবর্তী আবার ম্লান হাসলেন। আদিত্যর মনে হল, কড়া সিডেটিভের প্রভাবে রাখি চক্রবর্তী ভাল করে কথা বলতে পারছেন না।

রাখি চক্রবর্তীকে নিয়ে অ্যাটেন্ডেন্টরা ওটিতে ঢুকে গেছে।

আদিত্য বলল, 'দশ তলায় একটা ক্যাফেটিরিয়া আছে। কফি খেতে যাবেন, প্রদীপদা?'

প্রদীপ চক্রবর্তী বিষণ্ণ গলায় বললেন, 'তাই চল।'

'রাখির সঙ্গে আমার প্রথম আলাপের দিনগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে।' প্রদীপ চক্রবর্তী যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছেন। 'ফার্স্ট ইয়ারের প্রথম তিন-চার মাস রাখিকে তেমন চিনতাম না। আমি তখন গ্রামের ইস্কুল থেকে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে এসেছি। রাখি কলকাতার মেয়ে, হাজরার কাছে বেলতলা রোডে বাড়ি। ওর বাবা মা দুজনেই স্কুল শিক্ষক। রাখি আমাদের বার হায়ার সেকেন্ডারিতে এইটথ হয়েছিল।'

'আপনিও তো হায়ার সেকেন্ডারিতে স্ট্যান্ড করেছিলেন, প্রদীপদা। রাখিদি আমাকে বলেছে।' কেয়া বাধা দিয়ে বলল।

'রাখি বলেছে? রাখি বলে থাকলে তো আমাকে কবুল করতেই হবে। হ্যাঁ আমিও একটা থ্যাঙ্ক করেছিলাম। থার্ড হয়েছিলাম। ছোটবেলায় ভাবতাম বড় হয়ে বিজ্ঞানী হব। ইস্কুলের মাস্টারমশাইরাও খুব উৎসাহ দিতেন। সেসব তো আর হল না। সে যাই হোক, রাখির কথা বলি। রাখিরা হাজরায় থাকত। হাজরা মোড় থেকে দুনম্বর বাস ধরে কলেজে আসত।'

'আপনি তখন কোথায় থাকতেন?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'কলকাতায় আসার পর কয়েকদিন শ্যামবাজারের কাছে এক কাকার বাড়িতে থাকতাম। নিজের কাকা নয়, গ্রাম সম্পর্কে কাকা। কাকা চমৎকার মানুষ, কিন্তু তার বাড়িতে জায়গার প্রচণ্ড অভাব। আমি বুঝতে পারছিলাম ওদের খুব অসুবিধে হচ্ছে, কিন্তু কী করব, হিন্দু হস্টেলের এক দিকটা তখন সারাচ্ছে। তাই নতুন ছেলেদের হিন্দু হস্টেল জায়গা দিচ্ছে না। এইভাবে মাস তিনেক কাটার পর হরিশ মুখার্জি রোডের কাছে একটা মেস পাওয়া গেল। মেস বলতে একটাই ঘর, তার সঙ্গে একটা বাথরুম, এক চিলতে রান্নাঘর। ঘরে চারটে তক্তপোশ, তিনটেতে আশুতোষ কলেজের তিনটে ছেলে শোয়, একটা ফাঁকা। আমি সেটা দখল করলাম। আমিও হাজরা থেকে কলেজ যাবার বাস ধরতাম। আর সেটাই হল রাখির সঙ্গে আমার প্রথম আলাপের সূত্রপাত।'

'বাসস্টপে প্রেম? এ তো পুরো ছোটি সি বাত। দেখেছেন ছোটি সি বাত? অমোল পালেকার, বিদ্যা সিনহা। বাসু চ্যাটার্জীর ছবি।' কেয়া খুব মজা পেয়েছে।

'আমার ভাই সিনেমা-টিনেমা তেমন দেখা হয়ে ওঠেনি।' প্রদীপ চক্রবর্তীর গলাটা কিছুটা অপ্রস্তুত শোনাল। 'তবে বাসস্টপে প্রেম ব্যাপারটা তুমি ঠিকই ধরেছ।'

আদিত্যর ফোনটা বাজছে। অচেনা নম্বর। আদিত্য বলল, 'আমি বাইরে গিয়ে ফোনে কথা বলে আসছি।'

লিফটের সামনে এসে আদিত্য ফোনটা ধরল।

'আমি সোমা মজুমদার বলছি, দীপশিখার মা। দীপশিখাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। আপনি জানেন?' সোমা মজুমদারের গলাটা শুনে মনে হল ভদ্রমহিলা একেবারে ভেঙে পড়েছেন।

'আমি জানি ম্যাডাম। আমি আমার মতো করে অ্যারেস্টটা আটকাবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পুলিশ বলছে ওদের হাতে খুব স্ট্রং একটা এভিডেন্স আছে। জজ সাহেবও পুলিশের কথা মেনে নিয়েছে। তাই বেলটা পাওয়া যায়নি।'

'এভিডেন্সটা কী আপনি জানেন? দেখুন, আমার মেয়েকে আমি তো ছোট থেকেই চিনি। ওর পক্ষে কাউকে খুন করা জাস্ট সম্ভব নয়।'

'আপনার কথা আমি বিশ্বাস করছি ম্যাডাম। বিশ্বাস না করলে আমি দীপশিখার বেলের জন্যে চেষ্টা করতাম না। আর এভিডেন্সটা ঠিক কী আমি জানি না। শুনেছি ওই রিসর্টের সিসি টিভিতে কিছু একটা দেখা গেছে। ঠিক কী দেখা গেছে এখনও জানি না। তবে একটা কথা। দীপশিখা যদি নির্দোষ হয়, তাহলে আজ না হোক কাল ও ছাড়া পাবেই। আপনি আমার ওপর ভরসা করতে পারেন।'

'আপনার ওপরেই ভরসা করে আছি। দীপশিখাও আপনার ওপর খুব ভরসা করে। আপনি আমাদের বাঁচান, আদিত্যবাবু।' সোমা মজুমদারের কথাগুলো আর্তনাদের মতো শোনাল।

'আমার পক্ষে যতটা করা সম্ভব আমি করব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

সোমা মজুমদারকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলে আদিত্য নিজেই চিন্তিত হয়ে পড়েছে। সে তার মোবাইলটা থেকে ডিএসপি কৃষ্ণ পধির নম্বরটা খুঁজে বার করে কানেক্ট করল। রিং হয়ে যাচ্ছে, হয়েই যাচ্ছে। বেজে বেজে রিংটা থেমে গেল। কৃষ্ণ পধি হয় ব্যস্ত আছে আর না হয় ইচ্ছে করে আদিত্যর ফোনটা ধরছে না। দ্বিতীয়টা হবার সম্ভাবনাই বেশি। একটু চিন্তা করার পর আদিত্য গৌতমের ফোন নম্বরটা লাগাল।

'বল, বল।' গৌতমের ফোনটা একবারেই লেগে গেছে।

'একটা কাজ করে দিবি?'

'কাজ? কী কাজ? তোর জন্যে করব না এমন কাজ আছে নাকি?' গৌতম হালকা মুডে আছে।

'শোন, পুরীর কাছে গোল্ডেন রিসর্টে রিসর্টের মালিক অসীম দত্ত এবং তার ছোট ছেলে অনির্বাণ দত্ত কিছুদিন আগে খুন হল, তোর নিশ্চয় মনে আছে। এ-ব্যাপারে উড়িষ্যার পুলিশ কলকাতায় এসে অসীম দত্তর ছোট পুত্রবধূ অর্থাৎ অনির্বাণ দত্তর স্ত্রী দীপশিখাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে।

'হ্যাঁ, আমি জানি। দীপশিখার অ্যান্টিসিপেটারি বেল কোর্ট রিজেক্ট করেছে।' গৌতমের গলাটা এখন সিরিয়াস শোনাচ্ছে।

'একদম ঠিক। পুলিশ হয়তো ঠিক কাজই করেছে। দীপশিখার পরিষ্কার একটা মোটিভ আছে। তাছাড়া উড়িষ্যা পুলিশের একটা সিসি টিভির ফুটেজ পেয়েছে যাতে সম্ভবত দীপশিখাকে খুনের জায়গার আশেপাশে ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে। উড়িষ্যার পুলিশ এটাকে স্ট্রং এভিডেন্স মনে করে দীপশিখার এগেন্সটে কেস সাজাক, আমার কোনও আপত্তি নেই। আমার শুধু একটাই প্রশ্ন। খুনের সময় নাগাদ ওই সিসি টিভিতে দীপশিখা ছাড়া আর কাউকে দেখা গেছে কি? যদি দেখা যায় কাকে কাকে দেখা গেছে? সম্ভবত দত্তদের চেনে এমন কাউকে দেখা যায়নি তাই অন্য যাদের দেখা গেছে পুলিশ তাদের ইগনোর করছে। কিন্তু যাকে যাকে দেখা গেছে তাদের একটা লিস্ট আমার দরকার। হয়ত রিসর্টের অন্য কোনও গেস্টকে দেখা গেছে। তুই কি লিস্টটা আমাকে জোগাড় করে দিতে পারবি?'

'তুই নিজে চেয়ে দেখেছিস? ওরা তো তোকে চেনে।'

'চেনে ঠিকই, কিন্তু ডিএসপি পধি আমার ফোন ধরছে না। হয়তো ভাবছে আমি ওর পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে দেব।'

'হুঁ। লিস্টটা পাওয়া সোজা হবে না। আমি চেয়ে দেখব। কিন্তু নাও দিতে পারে।'

'ঠিক বলেছিস। নাও দিতে পারে। যদি না দেয় তা হলে কোর্টকে বলতে হবে লিস্টটা দেবার জন্য পুলিশকে বলতে। তাতে একটু দেরি হয়ে যাবে। তুই যদি জোগাড় করে দিতে পারিস তা হলে কাজটা সহজ হয়ে যায়।'

ফোনটা পকেটে পুরে আদিত্য ওয়েটিং রুমে এসে দেখল ঘর ফাঁকা। শুধু কেয়া আর প্রদীপ চক্রবর্তী বসে আছে। দুজনকেই উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে।

আদিত্যকে দেখে কেয়া বলল, 'প্রায় পাঁচ ঘণ্টা হয়ে গেল ডাক্তার এখনও ওটি থেকে বেরোল না। আমরা জিজ্ঞেস করতে নার্স বলল অপরেশন নাকি এখনও চলছে। কী অপরেশন করছে রে বাবা। অন্য পেশেন্টদের তো অপরেশন হয়ে গেল। তাদের বাড়ির লোকরাও সব চলে গেল।'

প্রদীপ চক্রবর্তী একেবারে চুপ করে গেছেন। হাতের বইটা মাঝে মাঝে পড়ার চেষ্টা করছেন। আবার নামিয়ে রাখছেন। বোঝাই যাচ্ছে মন বসছে না। গল্প করার মুড কারোরই আর নেই।

আরও মিনিট কুড়ি এইভাবে কাটার পর মুখে মাস্ক পরা, মাথায় ক্যাপ পরা মাঝারি উচ্চতার এক প্রৌঢ় ঘরে ঢুকলেন। আদিত্যদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'মে আই স্পিক টু রাখি চক্রবর্তীজ হাজবেন্ড, প্লিজ? আই অ্যাম ডক্টর অরুণ কুলকার্নি।'

'ইয়েস। ইটস মি।' প্রদীপ চক্রবর্তী এগিয়ে গেছেন।

'দি অপরেশন ইজ ওভার। পেশেন্ট ইজ ইন দি রিকভারি রুম। শি উইল বি ট্রান্সফারড টু আইসিইউ আফটার এ ফিউ আওয়ারস।'

'হাউ অয়াজ দ্য অপরেশন ডক্টর? হাউ ইজ দ্য পেশেন্ট?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'কান্ট সে এনিথিং বিফোর ফরটি এইট আওয়ারস। রাইট নাউ হার কনডিশান ইজ ক্রিটিকাল। আই অ্যাম নো গড। আই অ্যাম জাস্ট হিউম্যান। আই হ্যাভ মাই লিমিটেশন্স। বাট দিস মাচ আই ক্যান অ্যাশিয়োর ইউ, আই হ্যাভ ট্রায়েড মাই ভেরি বেস্ট।'

ডাঃ কুলকার্নি ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রদীপ চক্রবর্তী তার রাস্তা আটকে ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ডোন্ট ইউ হ্যাভ এনিথিং মোর টু সে?'

'নট মাচ, আই অ্যাম অ্যাফ্রেড। এক্সসেপ্ট দ্যাট ইন দিজ কেসেস দেয়ার ইজ এ লেস দ্যান ফিফটি পারসেন্ট চান্স অফ সারভাইভাল। দ্য টিউমার ওয়াজ ইন এ প্রিটি ব্যাড শেপ।'

(৩)

আদিত্য মোবাইলে অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিল, পাছে তারিখটা ভুলে যায়। অবশ্য তার দরকার ছিল না। সকালে উঠেই দিনটা আদিত্যর মনে পড়ে গেল। কেয়া ইতিমধ্যে উঠে পড়েছে। রান্নাঘরে চায়ের জল বসাচ্ছে। আদিত্য চুপিচুপি তার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, 'হ্যাপি বার্থ ডে।' তারপর কেয়াকে জড়িয়ে ধরে একটা জম্পেশ চুমু খেল।

আদিত্যর কবল থেকে ছাড়া পাবার পর কেয়া বলল, 'ইশ। এখনও মুখ ধোওনি! যাও মুখ ধুয়ে এসো।'

একটু পরে ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে কেয়া আর আদিত্য দুপুরে কোথায় লাঞ্চ খেতে যাবে তার প্ল্যান করছিল। রাত্তিরের খাওয়াটা অবশ্য বাড়িতেই খাওয়া হবে। কেয়া কী সব রেসিপি শিখেছে, নিজে রান্না করবে। আদিত্য বলতে গিয়েছিল, নিজের জন্মদিনে কি কেউ নিজে রান্না করে? কেয়া পাত্তা দেয়নি। আদিত্যকে না জানিয়েই কেয়া গতকাল কই মাছ কিনেছে। পাঁঠার মাংস কিনেছে। তেল কই হবে। আর পাঁঠার কোর্মা। আদিত্যকে মানতেই হবে, কেয়া ক্রমশ পাকা গিন্নি হয়ে উঠছে।

গড়িয়াহাটের কাছে, হিন্দুস্তান পার্কে একটা নতুন চিনে রেস্টুরেন্ট হয়েছে। কেয়ার কলিগরা কেউ কেউ খেয়েছে সেখানে। বলছে, এদের রান্না নাকি খুবই ভাল। কেয়া সেখানেই লাঞ্চ খেতে চাইছে। চিনে খাবার আদিত্যর একটু একঘেঁয়ে লাগে। কিন্তু জন্মদিনটা যেহেতু কেয়ার তাই তার পছন্দটাই মেনে নিতে হবে। তাছাড়া কেয়ার যুক্তি, চিনে খাবার তাড়াতাড়ি হজম হয়ে যায়। অতএব দুপুরে চিনে খেলে রাত্তিরে তেল কই, পাঁঠার মাংস খাবার জন্যে ভাল রকম খিদে হয়ে যাবে।

আজ বুধবার। এমনিতে কেয়ার ইস্কুল খোলা থাকার কথা, কিন্তু ভাগ্যবশত আজ শিবরাত্রি পড়েছে। কেয়াদের বাংলা ইস্কুলে বড় ক্লাশের মেয়েরা অনেকে শিবের মতো বর পাবার আশায় শিবরাত্রির দিন উপোস করে। তাই আজ ইস্কুল ছুটি।

কেয়ার ভাড়া করা গাড়ি এল বেলা বারোটায়। বেরোতে বেরোতে সাড়ে বারোটা। রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন। দুপুরে শহরের রাস্তায় যানবাহন বেশি বলে ট্র্যাফিক কিছুটা মন্থর। আদিত্য ভাবছিল, জন্মদিনে কেয়াকে কী দেওয়া যায়? সে কেয়াকে জিজ্ঞেস করল, 'শাওনি বলে কোনও বুটিকের কথা জান?'

'নাম শুনেছি, কখনও যাইনি। বোধহয় গড়িয়াহাটের কাছে কোথাও একটা।'

'হিন্দুস্থান পার্কে। আমরা যেখানে খেতে যাচ্ছি তার কাছাকাছি কোথাও হবে।'

'বাব্বা, তুমি এত জানলে কী করে? আমিই তো জানিই না কোথায়।'

'লাঞ্চ খেয়ে আমরা আজ যাব সেখানে। তোমাকে একটা শাড়ি কিনে দেব।'

'ওখানে কেন? ওসব জায়গায় খুব দাম নেয়। জিনিসটা হয়তো ভালই দেয় কিন্তু যা দাম হওয়া উচিত তার থেকে অনেক বেশি দাম নেয়। তার চেয়ে গড়িয়াহাটের মোড়ে অনেক ভাল দোকান আছে। সেখানে যাব।'

'একবার গিয়ে দেখি না। যদি দেখি খুব দাম তা হলে কিনব না। কিন্তু আমার মনে হয় আমার কাছে বেশি দাম নেবে না।'

'তোমার কাছে বেশি দাম নেবে না? তুমি কে যে তোমার কাছে বেশি দাম নেবে না?'

'আমি? আমি হলাম গিয়ে কেয়া বাগচির স্বামী। সেটা বললেই দাম কমিয়ে দেবে।'

'ইয়ার্কি মেরো না। অকারণে খরচ করতে আমার খুব গায় লাগে।'

'আরে চিন্তা করছ কেন? গিয়েই দেখা যাক না।'

কেয়া চুপ করে গেল। একটু চটেছে। গাড়ি পার্ক সার্কাসের সাতমাথায় দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ। এবার ছাড়বে।

রেস্টুরেন্টের নাম ওয়ান ফ্যান। খাবারটা বেশ ভাল। খেতে খেতে আদিত্য মোবাইলে গুগল করে দেখল, ওয়ান ফ্যান কথাটার অর্থ সাপার। মেন কোর্সের আগের ক্লিয়ার সুপটা স্বর্গীয়। পরে যে পোর্ক রিবসটা এল সেটাও অতি চমৎকার। কিন্তু চিকেনটা সাদামাটা। তবে স্কুইডস-এর ডিশটা চমৎকার উতরে গেছে। গুরুভোজন হয়ে গেল। আদিত্য ভাবছিল, ভাগ্যিস চিনেরা ডেসার্ট বানাতে পারে না, এর ওপর ডেসার্ট খেতে হলে অসুবিধে হত। কেয়া অবশ্য আইসক্রিম খেল, প্লেন ভ্যানিলা। আদিত্য শুধু কফি।

ওয়েটারকে জিজ্ঞেস করে আদিত্য জানতে পারল শাওনি বলে বুটিকটা চার-পাঁচটা বাড়ি পরে, উল্টোদিকের ফুটপাতে। যেটা কেয়াকে বলা হয়নি, শাওনির মালিক ঊর্মিমালা মিত্রকে আদিত্য ফোন করে বলে রেখেছে সে আড়াইটে-তিনটে নাগাদ ঊর্মিমালার দোকানে সস্ত্রীক হাজির হচ্ছে।

দোকানটা ছোট, ছিমছাম। দরজার ওপরে ঘন্টা লাগানো আছে। দরজা খুললেই সেটা টুংটাং করে বেজে ওঠে। আদিত্যরা ঢুকতেও বেজে উঠল। ভিতরটা বেশ সাজানো গোছানো। একটা হালকা ধূপের গন্ধ বাতাসে ভাসছে। খদ্দের বিশেষ নেই। শুধু একজন মাঝবয়েসি মহিলা এক কোণে কিছু একটা বাছাবাছি করছেন। আদিত্যদের দেখে যে এগিয়ে এল সে নিশ্চয় ঘণ্টার শব্দ শুনেছে। অল্পবয়সি বিক্রয়-সেবিকা।

'একটা শাড়ি কিনব। ঢাকাই মসলিন, কাঁথা স্টিচ বা বালুচরী। একটু দেখাবেন?' আদিত্য ইন্টারনেট থেকে রীতিমতো হোমওয়ার্ক করে এসেছে। কেয়া অবাক, অভিভূত।

'এই কাউন্টারটায় আসুন।' মেয়েটি দু'পা এগিয়ে গিয়ে কেয়ার দিকে ফিরে বলল, 'এঁর জন্যে তো?'

আদিত্য ঘাড় নাড়ল। সে আন্দাজ করার চেষ্টা করছিল বুটিকের মালকিন ঊর্মিমালা মিত্র কোথায় আছেন। ক্যাশ কাউন্টারের পেছনে একটা দরজা রয়েছে। দরজা খুললে সম্ভবত দোকানের আপিসঘরে যাওয়া যায়।

হয়ত ঊর্মিমালা সেখানে বিশ্রাম করছেন।

মেয়েটি গোটা পাঁচেক শাড়ি কাউন্টারে নামিয়ে ফেলেছে। একটা ঢাকাই, দুটো বালুচরী, দুটো কাঁথা স্টিচ। 'তুমি পছন্দ কর।' আদিত্য কেয়াকে বলল।

'তুমিও দেখ। তোমার কোনটা পছন্দ?'

'আমাকে যদি জিজ্ঞেস কর, আমি বলব ঢাকাইটা একটু লাউড আর কাঁথা স্টিচটা একটু ম্যাড়ম্যাড়ে। বালুচরীর মধ্যেই পছন্দ করা যাক।'

'খুব দাম তো!' কেয়া নিচু গলায় বলল। যে দুটো বালুচরী কাউন্টারে রয়েছে তার একটার দাম এগার হাজার ন'শ নিরানব্বই, অন্যটা বারো হাজার চারশো নিরানব্বই।

আদিত্য ভাবছিল, সব কিছুরই আজকাল বাটার জুতোর স্টাইলে দাম। সে মুখে বলল, 'দাম নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি শাড়ি পছন্দ কর।'

মিনিট দশেক পরে যখন কেয়ার পছন্দ একটা সবুজ, একটা গাঢ় নীল আর একটা কালো বালুচরীর মধ্যে সীমিত হয়ে এসেছে, পিছন থেকে এক মহিলার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'আপনার রঙে কিন্তু কালোটাই সব থেকে মানাবে ম্যাডাম।' আদিত্য ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার আগেই টের পেল, ঊর্মিমালা মিত্র।

এবার সে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'ভাল আছেন?'

'ভাল আছি।' বলে ঊর্মিমালা কেয়ার দিকে তাকাল।

'আমার স্ত্রী কেয়া, আর ইনি ঊর্মিমালা মিত্র, শাওনি বুটিকের কর্ত্রী।' আদিত্য মৃদু হাসল।

কেয়া বেশ অবাক হয়েছে। সে একবারও ভাবেনি আদিত্য সত্যি সত্যি শাওনি বুটিকের মালিককে চেনে।

'আপনার কথা মতো কালোটাই বেছে নিলাম।' আদিত্য বলল।

'শাড়িটা প্যাক করে দাও।' ঊর্মিমালা কাউন্টারের মেয়েটিকে চুপিচুপি আরও কিছু বলল। 'একটু কফি খেতে আপত্তি নেই তো?' শেষ কথাগুলো কেয়ার উদ্দেশে।

আদিত্য ঠিকই আন্দাজ করেছিল। ক্যাশ কাউন্টারের পেছনে ঊর্মিমালার অফিস। এটাও বেশ ছিমছাম। সেক্রেটারিয়েট টেবিল এবং তার সংলগ্ন কয়েকটা চেয়ার ছাড়াও এক দিকে সোফাসেট। ঊর্মিমালা আদিত্যদের সেখানে বসাল।

ঘরে একটা সিসি টিভির মনিটর রয়েছে। দোকানে কী হচ্ছে এখানে বসে মনিটরে সব দেখা যায়। সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঊর্মিমালা বলল, 'আপনাদের অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করছিলাম। মগ্ন হয়ে শাড়ি বাছাই করছিলেন বলে বিরক্ত করতে চাইনি।'

'আপনাকে দু'একটা জিনিস জিজ্ঞেস করার ছিল। আমার স্ত্রীর সামনে জিজ্ঞেস করলে আপত্তি নেই তো? অবশ্য কেয়া কিছুই জানে না, তাই কিছুই বুঝবে না।'

'ঠিক আছে, বলুন।' একটু ইতস্তত করে ঊর্মিমালা বলল। তার মুখে মৃদু আশঙ্কার ছাপ পড়েছে।

'আমার প্রথম প্রশ্ন, আপনি যেদিন মণিময় গুপ্তর বাড়ি গিয়ে তাকে পেলেন না বলে ফিরে এলেন, সেই তারিখটা কি আপনার মনে আছে? ভাল করে ভেবে বলুন।'

'এমনিতে আমার তারিখ-টারিখ একেবারেই মনে থাকে না, কিন্তু এক্ষেত্রে মনে হচ্ছে চেষ্টা করলে মনে করতে পারব।' ঊর্মিমালা ভাবতে ভাবতে বলল।'একত্রিশে ডিসেম্বর শান্তনুদের ক্লাবে সারা রাত্তির পার্টি ছিল। পরের দিন, মানে ফার্স্ট জানুয়ারি, বিকেলের ফ্লাইটে শান্তনু বম্বে চলে গেল। বম্বে পোর্ট থেকে ওর জাহাজ ছাড়ল তারও পরের দিন, অর্থাৎ সেকেন্ড জানুয়ারি। থার্ড জানুয়ারি আমি বুটিকে এলাম। অনেকগুলো কাজ ছিল। ভেবেছিলাম এক মাস থাকব না, তাই কাজগুলো সেরে নেওয়া দরকার। মণিময়ের সঙ্গে সেদিন সকালেও কথা হয়েছিল। মণিময় তখন নরেন্দ্রপুরের বাড়িতে চলে এসেছে। বলল, এক্ষুনি মাছ ধরতে যাবে।

ঠিক হল, আমি পরের দিন, মানে চার তারিখ নরেন্দ্রপুরে যাব। সেই কথা মতো আমি চার তারিখ সকালে নরেন্দ্রপুরের বাড়িতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম মণিময় নেই।'

'তার মানে মণিময়ের সঙ্গে আপনার শেষ কথা হয়েছিল তিন তারিখে। তাই তো?'

'হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে।'

'কটার সময় কথা হয়েছিল মনে আছে?'

'সকাল বেলা। ঠিক কটায় মনে নেই। তবে এইটুকু মনে আছে, আমি বুটিকে বেরোনোর আগে মণিময়ের ফোনটা এসেছিল।'

'ঠিক আছে, ওতেই হবে। আর একটা প্রশ্ন। পুলিশ কি আপনার কাছে এসেছিল?'

'এসেছিল। আবার আসবে বলেছে। রাত্তিরে দুশ্চিন্তায় ঘুম হয় না।' ঊর্মিমালার গলায় উদ্বেগের ছায়া।

'আপনার স্বামী কবে কলকাতায় আসছেন?'

'জুলাইতে এসে মাস দুয়েক থাকার কথা।'

'ঠিক আছে। দেখি কী করা যায়।'

বেয়ারা কফি নিয়ে ঢুকেছে। সঙ্গে কিছু সৌখিন বিস্কুট। তার ঠিক পেছনে পেছনে শাড়ির প্যাকেট ও ক্যাশমেমো সহ কাউন্টারের সেই বিক্রয়-সেবিকা। তার হাতে একটা ক্রেডিট কার্ড সোয়াইপ করার যন্ত্র।

'আপনি ক্রেডিট কার্ডে দিতে পারেন ভেবে এটা নিয়ে এলাম।' মেয়েটি হাতের যন্ত্রটা দেখিয়ে বলল।

দাম দিতে গিয়ে আদিত্যর চক্ষু চড়কগাছ। যা দাম লেখা ছিল তার প্রায় অর্ধেক দাম চার্জ করা হয়েছে।

'সে কী! এই দামটা তো লেখা ছিল না!' আদিত্য রীতিমতো বিব্রত।

'যে দামটা লেখা ছিল সেটা তো বুটিকের কাস্টমারদের জন্যে। যারা বেশি দাম দেবার জন্যে মুখিয়ে আছে। আমার বুটিকে যারা আসে তাদের সমস্যা টাকা কী করে খরচ করবে। তাই দাম-টামগুলো একটু বাড়িয়ে রাখতে হয়। বেশি দাম না হলে আমার কাস্টমারদের মন ওঠে না। আপনার কাছে যে দামটা চাইছি সেটা আমার কস্ট প্রাইস।'

'কস্ট প্রাইস? তাহলে তো আপনার কোনও প্রফিটই রইল না।'

'নাই বা রইল প্রফিট। সব জায়গায় প্রফিট করতে নেই।' ঊর্মিমালা মিষ্টি করে হাসল।

আদিত্য আর কেয়া যখন শাওনি বুটিক থেকে বেরোল তখন প্রায় চারটে বাজে।

আদিত্য বলল, 'তোমাকে তো বাড়ি গিয়ে রান্না করতে হবে। তুমি বাড়ি ফিরে যাও, আমি দুএকটা কাজ সেরে ফিরছি।'

'কোথায় যাবে?' আদিত্য ওর সঙ্গে ফিরবে না শুনে কেয়া একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

'রাজারহাট নিউটাউনে অসীম দত্তর আপিসে একবার যেতে হবে। চন্দ্রিমা সেন বলে ওঁর এক পার্সোনাল সেক্রেটারি ছিল, তার সঙ্গে পাঁচটায় দেখা করব বলেছি। ওদের কোম্পানির অ্যাকাউন্টসটা একবার দেখতে হবে। আমার বেশিক্ষণ লাগবে না। সাতটা-সাড়ে সাতটার মধ্যে বাড়ি ফিরে আসব।'

'তা হলে আমি তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। একটু ঘুরপথ হবে, কিন্তু গাড়ি ছাড়া তুমি যাবে কী করে।'

'তুমি নামিয়ে দিয়ে গেলে তো খুবই ভাল হয়। তোমার সঙ্গে আর একটু সময়ও কাটানো যাবে।'

গাড়িতে উঠতে না উঠতে আদিত্যর মোবাইলটা বেজে উঠল। অনিতা চৌধুরি ফোন করেছে।

'আদিত্যবাবু, রাখিদির খবরটা জানার জন্যে আপনাকে ফোন করলাম। আপনারা তো অপরেশনের সময় ছিলেন। কেমন হল অপরেশান?' অনিতাকে আন্তরিকই মনে হল।

'অপরেশান তো যা হবার হয়ে গেছে। রাখিদির অবস্থা এখনও ক্রিটিক্যাল। ডাক্তার বলছেন, লেস দ্যান ফিফটি পারসেন্ট সারভাইভালের চান্স।'

'তা হলে তো বেশ চিন্তার কারণ আছে।' অনিতাকে সত্যি সত্যিই চিন্তিত শোনাল।

'হ্যাঁ, চিন্তার কারণ অবশ্যই আছে। কিন্তু একটা কথা না জিজ্ঞেস করে পারছি না। সেদিন হাসপাতালে গেলেন না কেন? আজ আবার প্রদীপদাকে জিজ্ঞেস না করে আমাকে জিজ্ঞেস করছেন রাখিদি কেমন আছে। ব্যাপারটা কী?'

ওপারে খানিকক্ষণ নীরবতা। তারপর অনিতা চৌধুরি ধীরে ধীরে বলল, 'কিছুদিন আগে সমীরের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা নিয়ে প্রদীপদা হঠাৎ এমন একটা কমেন্ট করলেন যে আমার রাগ হয়ে গেল। আমিও দুকথা শুনিয়ে দিলাম। সেই থেকে প্রদীপদার সঙ্গে কথা বন্ধ। রাখিদি সুস্থ থাকলে ঠিক মিটমাট করিয়ে দিত। আমি আপনাদের কাছ থেকেই রাখিদির খবর নেব, কেমন?'

গাড়ি বিজন সেতু পেরিয়ে কসবা কানেক্টারে পড়েছে। আবার আদিত্যর ফোনটা বেজে উঠল। এবার গৌতম।

'শোন, উড়িষ্যা পুলিশের কাছে খবর নিয়েছি। সিসি টিভির গল্পটা ঠিক নয়। ওই রিসর্টে সিসি টিভি এখনও বসেইনি।'

'তা হলে উড়িষ্যা পুলিশের কাছে দীপশিখার এগেন্সটে কী এমন ইনক্রিমিনেটিং এভিডেন্স আছে যাতে ওর অ্যানটিসিপেটারি বেল রিফিউজড হল?' আদিত্য বেশ বিভ্রান্ত।

'শ্বেতা মল্লিক বলছে সে নাকি অসীম দত্ত খুন হবার রাত্তিরে দীপশিখাকে অসীম দত্তর অফিসে ঢুকতে দেখেছে। আর অনিকেত দত্ত বলছে অনির্বাণ দত্ত খুন হবার একটু আগে সে দেখেছে দীপশিখা সেই ঘরটার দিকে যাচ্ছিল যে ঘরে অনির্বাণ খুন হয়। দুজন সাক্ষীই বলছে তারা যে দীপশিখাকে দেখছে সেটা হয়তো দীপশিখা খেয়াল করেছিল। যে দুটো খুন করে ফেলেছে সে আরও খুন করতেই পারে। তাই দীপশিখা ছাড়া থাকলে দুজনেই আনসেফ বোধ করবে। এইসব শুনে জজ সাহেব বেলের আবেদন নাকচ করে দিয়েছেন।'

(৪)

অসীম দত্তর অফিসটা বেশ বড়। সাজানো। আধুনিক রিসেপশান, করিডোর, লিফট, লম্বা হলের মধ্যে ছোট ছোট কিউবিকল, যেমন বড় কর্পোরেটগুলোতে হয়। আদিত্য শুনেছিল, অসীম দত্তর অবর্তমানে অনিকেত দত্ত অফিসের কর্তৃত্ব নিয়েছে। তবে রোজ আসতে পারে না। তার নিজেরও তো একটা কোম্পানি আছে। তবে সেই কোম্পানির অবস্থা ভাল নয়।

চন্দ্রিমা সেন মাঝবয়সি মহিলা, গম্ভীর স্বভাবের, চোখে ভারী চশমা। তিনি আদিত্যকে একটা ছোট ঘরে বসালেন যেখানে সম্ভবত কোম্পানির ক্লায়েন্টরা অপেক্ষা করে। চন্দ্রিমা জানালেন, অনিকেত দত্ত সকালে এসেছিলেন, দুপুরবেলা বেরিয়ে গেছেন।

'আপনার সার্ভিসটার ব্যাপারে কথা বলতে হবে। মানে আপনার ইনভেস্টিগেশনটার ব্যাপারে। সিনিয়ার মিঃ দত্ত আপনাকে এমপ্লয় করেছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, তাঁর ওপর যে মার্ডার অ্যাটেম্পট হয়েছিল আপনি সেটা ইনভেস্টিগেট করবেন। আর তাঁর যদি কোনও কারণে আনন্যাচারাল ডেথ হয় তা হলে সেটারও আপনি তদন্ত করবেন। আমরা শুনেছি মিঃ দত্তর মার্ডার চার্জে পুলিশ দীপশিখা চৌধুরিকে অ্যারেস্ট করেছে। তা হলে কি আমরা ধরে নিতে পারি না মিঃ দত্তর মার্ডার কেসটা সলভড হয়ে গেছে?'

'না পারি না। আমি নিশ্চিত পুলিশ ঠিক লোককে ধরতে পারেনি। কিন্তু সে যাই হোক, আমার ধারণা আমি কেসটা প্রায় সলভ করে ফেলেছি। তার মানে আমি আর আমার সার্ভিসের জন্যে অ্যাডিশানাল কোনও বিল করছি না। যেটুকু সার্ভিস আমি দিয়েছি তার বিলটা আমি পাঠিয়ে দেব। শুধু একবার আপনাদের কোম্পানির অ্যাকাউন্টসগুলো আমার দেখা দরকার। এটা আমার ইনভেস্টিগেশনটা ওয়াইন্ড আপ করার জন্যে দরকার। আমার ইনভেস্টিগেশনের রিপোর্ট আমি মাসখানেকের মধ্যে আপনাদের পাঠিয়ে দেব। পুলিশকেও একটা

কপি দেব। যদি তারা কোনও অ্যাকশান নেয়। কিন্তু আপাতত একবার আপনাদের অ্যাকাউন্টসটা দেখা দরকার। অসীম দত্ত আমাকে বলে গিয়েছিলেন তাঁর মৃত্যু হলে সবরকম অ্যাক্সেস আমি পাব। আপনাকেও হয়তো বলে গিয়েছিলেন।'

'বলেছিলেন, ঠিকই। কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছি না অ্যাকাউন্টসটা আপনাকে দেখানো ঠিক হবে কিনা।'

'কেন ঠিক হবে না? এটা তো অডিটেড অ্যাকাউন্টস। আপনাদের অ্যানুয়্যাল রিপোর্টে তো এটা বেরিয়েছে। তার মানে, এটা তো পাবলিক নলেজ। আমি শুধু একটু ডিটেলগুলো দেখতে চাই যেটা অ্যানুয়্যাল রিপোর্টে পাব না।'

'ঠিক আছে। দেখুন। আমি আপনাকে অ্যাক্সেস কোডটা বলে দিচ্ছি। আপনি ওই কম্পিউটারটার থেকেই অ্যাক্সেস করতে পারবেন।' চন্দ্রিমা সেন ঘরের কোণে রাখা একটা ডেস্কটপের দিকে আদিত্যর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

আদিত্য অসীম দত্তর আপিস থেকে বেরিয়ে দেখল অন্ধকার নেমে গেছে। রাজারহাটের এদিকটায় এমনিতেই লোকজন কম থাকে, আপিস-কাছারিও খুব বেশি নেই, এখন সন্ধেবেলা রাস্তাঘাট একেবারে খাঁখাঁ করছে। শুধু সেই লাল রঙের গাড়িটা রাস্তার এক ধারে এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে। সকাল থেকেই আদিত্য খেয়াল করছিল লাল গাড়িটা তাদের ফলো করছে। কেয়া ভয় পাবে বলে আদিত্য তাকে কিছু বলেনি।

দুপুরে লাঞ্চ খেতে খেতে জানলা দিয়ে আদিত্য দেখতে পাচ্ছিল তাদের ভাড়া গাড়িটার থেকে একটু দূরে লাল গাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাড়ির ড্রাইভার খবর কাগজ পড়ছে। পেছনের সিটে একটা লোক ব্যাকসিটে হেলান দিয়ে আছে। বোধহয় ঘুমোচ্ছে।

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরনোর সময় আদিত্য খেয়াল করল পেছনের সিটের লোকটাও উঠে বসেছে। আদিত্য আর কেয়া যখন হাঁটতে হাঁটতে শাওনি বুটিকের দিকে এগোচ্ছে তখন পেছনের সিটের লোকটা গাড়ি থেকে নেমে তাদের পেছন পেছন আসছিল। বুটিকে ঢোকার আগে আদিত্য এক ঝলক তার চেহারাটা দেখে নিয়েছিল। মাঝারি উচ্চতা, মাঝারি স্বাস্থ্য, গায়ের রংও মাঝারি, না খুব ফরসা না খুব কালো। মুখের আদলও একেবারে সাদামাটা, মুখাবয়বে এমন কিছু নেই যেটা মনে রাখা যায়। সব মিলিয়ে, লোকটা যদি ভিড়ের মধ্যে চট করে মিলিয়ে যায়, তা হলে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বুটিক থেকে বেরিয়ে আদিত্য খেয়াল করল গাড়িটা তখনও দাঁড়িয়ে আছে। কেয়া যখন অসীম দত্তর সল্ট লেকের অফিসে আদিত্যকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল আদিত্য চোখের এক কোণ দিয়ে ঠাহর করল লাল গাড়িটা রাস্তার ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। এর পর অসীম দত্তর অফিসে কাজ করতে করতে সিগারেট খাবার অছিলায় আদিত্য কয়েকবার বাইরে এসে দেখেছে গাড়িটা ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটা জিনিস ভেবে আদিত্য নিশ্চিন্ত হল। গাড়িটা বা তার ভিতরের লোকটা তাকে ফলো করছে, কেয়াকে নয়।

এখন সন্ধেবেলা নির্জন রাস্তায় গাড়িটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আদিত্যর ষষ্ঠেন্দ্রিয় তাকে জানাল, বিপদ আছে। এই ষষ্ঠেন্দ্রিয় আদিত্যকে বহুবার বাঁচিয়েছে। আদিত্যকে দেখে সেই লোকটা গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। লোকটাকে দেখে আদিত্য আবার অফিসের ভিতরে ঢুকে গেল। অসীম দত্তর অফিস প্রায় ফাঁকা। রিসেপশানেও কেউ নেই। শুধু দুএকজন সিকিউরিটি গার্ড ঘোরাফেরা করছে। আদিত্যকে আবার অফিসে ঢুকতে দেখে একজন সিকিউরিটি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে এগিয়ে এল।

'একটা উবার ডাকব। না হলে অনেকটা হাঁটতে হবে। এখান থেকে বাস স্টপ তো অনেকটা।' আদিত্য কৈফিয়ত দেবার মতো করে বলল।

সিকিউরিটি ছেলেটা অমায়িক। বলল, 'ডাকুন না। ওখানে বসে ডাকুন।'

যেহেতু আদিত্য খুব বেশি ট্যাক্সি চড়ে না, উবার ডাকার ব্যাপারে সে একটু নড়বড়ে। মিনিট পাঁচেক চেষ্টার পর একটা মেসেজ এল, কুড়ি মিনিটের মধ্যে গাড়ি চলে আসছে। এখন কুড়ি মিনিট আদিত্যকে অপেক্ষা করতে হবে।

সিকিউরিটির ছেলেটাকে আবার ফিরে আসতে দেখে সে বলল, 'কুড়ি মিনিট বসতে হবে। তার আগে গাড়ি আসছে না।'

ছেলেটা হালকা হাসল। রিসেপশান কাউন্টারের পেছনে গিয়ে তার হাতের বোতলটা জল ভরার জন্যে ওয়াটার পিউরিফায়ারের নিচে রাখল। আদিত্য আগে খেয়াল করেনি রিসেপশানের পেছনে একটা ওয়াটার পিউরিফায়ার আছে।

আদিত্য কেয়ার ফোনটা লাগাল। ''তাড়াতাড়ি বল কী বলবে। রান্না বসিয়েছি। পুড়ে যাবে।'

'বলার কিছু নেই। যে আপিসটার সামনে আমায় নামিয়ে দিলে এখনও ওখানেই বসে আছি। কাজ হয়ে গেছে। উবার আসার জন্যে অপেক্ষা করছি। বলছে, আসতে কুড়ি মিনিট লাগবে।'

'তবু ভাল উবার বলেছ। হেঁটে হেঁটে বাস স্টপ যাবার চেষ্টা করনি। বসে থাক, যতক্ষণ না উবার আসে। আমি রাখছি। মাংস ধরে যাবে।'

বসে থাকতে থাকতে আদিত্যর বিরক্ত লাগছিল। একবার দরজা দিয়ে বেরিয়ে দেখল লাল গাড়িটা সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির চালক এবং আরোহী গাড়ির বনেটের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। আদিত্যকে দেখে সচকিত হয়ে উঠল। তাদের সচকিত দেখে আদিত্য আবার আপিসের ভিতরে ঢুকে পড়ল।

সিকিউরিটি ছেলেটা আর একটা বোতলে জল ভরছে। আদিত্য তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কি নাইট ডিউটি?' ভাবল, ছেলেটার সঙ্গে কিছুটা খেজুর করলে হয়তো সময়টা কেটে যাবে।

'এমনিতে আমার সকালের ডিউটি। আটটা থেকে আটটা। রাত্তির আটটায় দুজন এসে আমাদের রিলিজ করে দেয়। কিন্তু আজ রাত্তিরের একজন আসবে না। আমাকে তাই ডবল ডিউটি করতে হবে।' ছেলেটার গলায় কিন্তু তেমন আপত্তির সুর নেই।

'রাত্তিরে খান কোথায়?'

'সেটাই তো মুশকিল। এখানে রাত্তিরে খাবার কোনও জায়গা নেই। যারা রাত্তিরে ডিউটি করে তারা টিপিন নিয়ে আসে। আমি তো জানতাম না রাত্তিরের ডিউটি করতে হবে। তাই খাবার-টাবার কিছু আনিনি।'

'তাহলে কী হবে?'

'দেখি কী করা যায়। এখান থেকে মিনিট পনেরো হাঁটলে একটা দোকান আছে, রুটি-তরকারি বানায়। ওদিকটায় অনেক কনস্ট্রাকশান হচ্ছে তো, মিস্তিরিরা রাত্তিরে থাকে। তাদের জন্যে বানায়। ওখানে গেলে হয়তো পেয়ে যাব।'

'আমি তো উবার ধরে বড়রাস্তায় গিয়ে উঠব। রুটির দোকানটা যদি আমার পথে পড়ে তা হলে আমি আপনাকে নামিয়ে দিতে পারি। আপনার এক পিঠের হাঁটাটা বেঁচে যাবে।'

'তা হলে তো দাদা খুবই ভাল হয়। আমি বরং আমার পার্টনারকে বলে আসি রুটি কিনতে যাচ্ছি। আপনার ট্যাক্সিটা বোধহয় এবার এসে যাবে।'

ছেলেটা তার সহকর্মীকে বলতে ভেতরে গেল। আদিত্যর মোবাইলে একটা মেসেজ এসেছে। আদিত্য দেখল গাড়ি এসে গেছে।

উবারটা একেবারে গেটের মুখে দাঁড়িয়েছে। আদিত্য ইচ্ছে করেই সিকিউরিটি ছেলেটার পেছনে পেছনে থাকছে যাতে লাল গাড়ির লোকটা তাকে ভাল করে দেখতে না পায়। উবার আর লাল গাড়ির মধ্যে একটা

গাছের আড়ালও আছে। উবারের কাছে পৌঁছে আদিত্য হঠাৎ গতি বাড়িয়ে দরজা খুলে গাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। সিকিউরিটি ছেলেটা তখনও বাইরে।

ড্রাইভারকে আদিত্য বলল, 'এই ছেলেটাকে একটু তুলে নেব? ও এই মোড়ের মাথায় নেমে যাবে।'

'আমাদের দুটো ডেস্টিনেশনে যাবার নিয়ম নেই। একটা পয়েন্ট থেকে প্যাসেঞ্জার তুলব, আরেকটা পয়েন্টে নামিয়ে দেব, এটাই নিয়ম।'

'বুঝতে পারছি। কিন্তু উনি তো তিন মিনিটের মধ্যে নেমে যাবেন।'

'তিন মিনিট হোক, দুমিনিট হোক আমি দুটো জায়গায় প্যাসেঞ্জার নামাতে পারব না।' কথা বলতে বলতে ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে।

'ঠিক আছে দাদা, আমাকে নিয়ে ভাববেন না। আমি এটুকু হেঁটে চলে যাচ্ছি।' সিকিউরিটি ছেলেটা বেজার মুখে বলল।

'ঠিক আছে। আমি আর কী করব বলুন? এ তো আপনাকে কিছুতেই নেবে না মনে হচ্ছে।' ড্রাইভারের ওপর আদিত্যর বেশ রাগ হচ্ছিল।

উবার চলতে আরম্ভ করেছে। লাল গাড়িটা যেদিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল উবার তার উল্টোদিক দিয়ে গিয়ে বড় রাস্তায় পড়ল। লাল গাড়ি পেছন পেছন আসছে।

ফাঁকা রাস্তা ধু-ধু করছে। ল্যামপোস্টের আলোয় রাস্তাঘাট আলোকিত। কিন্তু আলো ঝলমলে রাস্তায় মানুষ বা যানবাহন নেই বলে রাস্তাটা ভূতুড়ে লাগছে। লাল গাড়ি আর উবারের দূরত্ব ক্রমশ কমে আসছে। লাল গাড়ি গতি বাড়িয়ে ডানদিকে উবারের একেবারে পাশে চলে এসেছে। দুটো গাড়ির গতিই প্রায় আশি কিলোমিটার।

উবারের ড্রাইভার গতি কমিয়ে লাল গাড়িকে এগিয়ে যেতে বলছে। তবু লাল গাড়ি উবারকে ওভারটেক না করে তার পাশাপাশি চলছে। উবারের ড্রাইভার লাল গাড়ির ড্রাইভারের উদ্দেশে একটা অশ্রাব্য গালাগালি দিয়ে উঠল। লাল গাড়ির ড্রাইভারের ভ্রুক্ষেপ নেই। এখনও দুটো গাড়ি পাশাপাশি চলছে। উবারের গতি কমে গিয়ে এখন পঞ্চাশ কিলোমিটার। লাল গাড়িরও তাই।

আদিত্য জানলার কাঁচ তুলে দিয়েছে। লাল গাড়ির আরোহী তার জানলার কাচ নামিয়ে রেখেছে। আদিত্য দেখল লাল গাড়ির আরোহী এবার একটা রিভলভর বার করল। সে আদিত্যর দিকে রিভলভর তুলে তাক করছে। আদিত্য এক মুহূর্তের মধ্যে গাড়ির মেঝেতে শুয়ে পড়ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লাল গাড়ির আরোহী আদিত্যর উদ্দেশে পরপর অনেকগুলো গুলি চালাল।

উবারের জানলার কাচ ঝনঝন করে ভেঙে পড়েছে। উবারের ড্রাইভার গাড়ির নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উবার ডানদিকে সরে গিয়ে লাল গাড়িকে ধাক্কা মারল। বিকট শব্দে লাল গাড়ি ডানদিকের ডিভাইডারে গিয়ে আঘাত করল। ডিভাইডারে আঘাত করে লাল গাড়ি উল্টে গিয়ে থেমে গেছে। শুধু তার চাকাগুলো শূন্যে ঘুরে যাচ্ছে।

লাল গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষের জেরে উবার বাঁ দিকে একটা বাতিস্তম্ভে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল। উইন্ডশিল্ডের কাচ ভেঙে চুরমার। ড্রাইভারের কপাল আর নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। আদিত্য দুহাত দিয়ে মাথা ঢেকে গাড়ির মেঝেতে শুয়েছিল। গাড়িটা বাতিস্তম্ভে ধাক্কা মারার সঙ্গে সঙ্গে সামনের সিটটা তীর বেগে পিছনে এসে তার হাতে আঘাত করল। ডান হাতে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। হাতটা নিঃসন্দেহে ভেঙেছে। তবু ভাগ্য ভাল মাথায় লাগেনি।

মিনিট কয়েক ওইভাবে শুয়ে থাকার পর আদিত্য প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে গাড়ির বাইরে বেরোল। উবারের ড্রাইভার যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে। আদিত্যর ডান হাতটা অকেজো হয়ে গেছে। অসহ্য যন্ত্রণা। সে লাল গাড়ির

কাছে গিয়ে দেখল গাড়ির ড্রাইভার এবং আরোহী দুজনেই গাড়ির মধ্যে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। আদিত্য অতি কষ্টে বাঁ হাত দিয়ে মোবাইলটা বার করে গৌতমকে ফোন করল।

'একটা লোক তার গাড়ি থেকে আমার উবারের ওপর গুলি চালিয়েছে ... দুটো গাড়িরই অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ... রাজারহাট নিউ টাউনের একটা রাস্তার ওপর ... মেন রাস্তা নয় ...এই রাস্তাটা গিয়ে ইকো পার্কের উল্টোদিকে মেন রাস্তার সঙ্গে মিশেছে ... ইকো পার্ক থেকে এক-দেড় কিলোমিটার ... তাড়াতাড়ি হেল্প পাঠা ...' হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে এই কটা কথা বলে আদিত্য রাস্তার ওপর বসে পড়ল।

দশম পরিচ্ছেদ

(১)

হাতটার জন্যে হাসপাতালে যেতেই হল। তবে রাত্রিবাস করতে হয়নি। ডাক্তার কেয়ার চেনা। বেশি বয়েস নয়। কথা বলতে বলতে ভাঙা হাড় সেট করে দিল। তারপর প্লাস্টার। বলল, ছ'সপ্তাহের আগে প্লাস্টার খোলা যাবে না। তার মধ্যে অন্তত প্রথম দুতিন সপ্তাহ বাড়িতে থাকলে ভাল হয়। আর নেহাত যদি এক-আধদিন বেরোতেই হয়, খুব সাবধানে, ভাঙা হাতটাতে কোনও রকম চাপ না দিয়ে বেরোতে হবে। প্লাস্টার করার পর তিনদিন আদিত্যর বাড়িতেই কাটল। এই ঘটনাটার পর কেয়া ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে।

রাখি চক্রবর্তীর অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। আইসিইউ থেকে বেরোতে পারেননি, হয়তো দুএকদিনের মধ্যে ভেন্টিলেটরে দেওয়া হবে। প্রদীপ চক্রবর্তীর সঙ্গে রোজই ফোনে কথা হয়। মানুষটা একেবারে ভেঙে পড়েছে। এর মধ্যে কেয়া দুদিন রাখি চক্রবর্তীকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিল।

আদিত্যর বন্দিদশার পঞ্চম দিন সকালে উঠে সে খবর কাগজে দেখল পুলিশ অনিতা চৌধুরিকে তার স্বামী সৈকত চৌধুরির খুনের দায়ে গ্রেপ্তার করেছে।

আদিত্য ভেবে দেখল এটা হবারই ছিল। তবু একেবারে টাটকা খবরটা জানার জন্যে সে বাঁ হাতে মোবাইল তুলে অচিন্ত্য সাহার নম্বরটা লাগাল।

'কেমন আছেন এখন?' অচিন্ত্য সাহার গলাটা আন্তরিক শোনাল। আদিত্যর অ্যাক্সিডেন্টটা হবার পর অচিন্ত্য সাহা একবার ফোন করেছিল।

'ওই আছি একরকম। যন্ত্রণাটা নেই। কিন্তু অসুবিধে তো আছেই। ডান হাতটা একেবারে অকেজো হয়ে রয়েছে। তাছাড়া বাড়ি থেকেও বেরতে পারছি না।'

'না, না। এখন কটা দিন বিশ্রাম করুন। একেবারে বেরোবেন না। সবার আগে হাতটা তো জোড়া লাগা দরকার।'

'একটা খবর জানতে আপনাকে ফোন করলাম।' আদিত্য প্রসঙ্গ বদলালো। 'খবরটা আজ কাগজে বেরিয়েছে। বুঝতেই পারছেন, কোন খবরের কথা বলছি।'

'আন্দাজ করতে পারছি। অনিতা চৌধুরির অ্যারেস্টের খবরটা বলছেন তো?'

'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন।'

'অ্যারেস্টটা স্যার করতেই হল। ওপরওলার চাপ, মিডিয়ার গালাগালি, সব মিলিয়ে কাউকে না কাউকে অ্যারেস্ট করতেই হত। না হলে লোকে বলত পুলিশ নিষ্কর্মা, হাত গুটিয়ে বসে আছে।'

'আর কিছু এভিডেন্স পেয়েছেন অনিতা চৌধুরির এগেন্সটে?'

'নতুন করে আর কিছু পাইনি। কিন্তু মোটিভই বলুন, সুযোগই বলুন, অনিতা সবার থেকে এগিয়ে। যাকে বলে প্রাইম সাসপেক্ট। জানি আপনি একমত হবেন না। কিন্তু এটা তো মানবেন, অন্তত আপাতদৃষ্টিতে এমন কেউ নেই যাকে অনিতার থেকে বেশি সন্দেহ করা যায়।'

'আসলে অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। ধরে নিলাম, সেদিন সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে অনিতা প্রথমে তার স্বামীর ঘরে গিয়ে স্বামীকে খুন করে। তারপর পড়শিদের জানায় যে সৈকত চৌধুরি খুন হয়ে গেছে। কিন্তু অনিতা মার্ডার ওয়েপনটা পেল কোথা থেকে? খুন করার পর সে অস্ত্রটা রাখলই বা কোথায়?

সেটা তো এখনও পাওয়া যায়নি। তাছাড়া প্রশ্ন, অনিতা কি আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে জানত? এমনিতে না জানাই সম্ভব। তাহলে সে কি কোথাও আগ্নেয়াস্ত্র চালানোর ট্রেনিং নিয়েছিল?'

'আমি মানছি স্যার এসব প্রশ্নের উত্তর এখনও আমাদের কাছে নেই। কিন্তু এগুলো জানার জন্যেই তো আমরা অনিতাকে কাস্টডিতে নিয়েছি। আমাদের বিশ্বাস পুলিশি জেরার মুখে পড়লে অনিতা সব কথা বলে দেবে।'

'ঠিক আছে, দেখুন কী দাঁড়ায়।' আদিত্য ফোন কেটে দিয়ে কিছুক্ষণ গভীর চিন্তায় ডুবে রইল।

কেয়া স্কুলে গেছে। একটু পরে রান্নার মাসি আসবে। আজকাল আদিত্য বাড়ি থাকছে বলে রান্নার মাসি সন্ধেবেলা আসার বদলে দুপুরেই কাজ সেরে বাড়ি চলে যাচ্ছে। কেয়া লিখে দিয়ে গেছে কী কী রান্না করতে হবে। কেয়ার ধারণা মুখে বলে দিলে আদিত্য কিচ্ছু মনে রাখতে পারবে না। ধারণাটা ভুল নয়। তবে মাসি পড়তে পারে না। কাগজটায় কী লেখা আছে আদিত্যকেই পড়ে দিতে হবে।

রান্নার মাসি আসতে আরও আধঘন্টা দেরি আছে। এই ফাঁকে এক কাপ কফি খাওয়া যেতেই পারে। বাঁ হাত দিয়েই এক কাপ কফি করে নেওয়া সম্ভব। কফি করতে করতে এবং পরে খেতে খেতে আদিত্য গভীরভাবে চিন্তা করছিল। সৈকত চৌধুরি, মণিময় গুপ্ত, অসীম দত্ত এবং অনিকেত দত্ত এই চারটে খুনের রহস্যের সে মোটামুটি সমাধান করে ফেলেছে। এবং কারা রাজারহাট নিউটাউনের রাস্তায় তাকে গুলি করে মারতে চেয়েছিল সেটাও সে জানতে পেরেছে। তা হলে এখন তার কী করণীয়? সে যেটা জানতে পেরেছে, পুলিশকে জানাবে? পুলিশ বিশ্বাস করবে তার কথা? তার হাতে যথেষ্ট প্রমাণ আছে কি?

মোবাইলটা হঠাৎ বেজে উঠল। কেয়া। কেয়া তো এই সময় কখনও ফোন করে না। তার তো এই সময় ক্লাসে থাকার কথা। একটা অজানা আশঙ্কায় আদিত্যর বুকটা কেঁপে উঠল।

'শোন। একটা খারাপ খবর আছে।' চাপা উত্তেজনায় কেয়ার গলাটা ভাঙা ভাঙা শোনাচ্ছে। 'রাখিদি চলে গেলেন। একটু আগে শাশ্বতীর বাড়ি থেকে ফোন এসেছিল। দীপকদা ফোন করেছিলেন। আমি তোমাকে অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করছি।। কিন্তু খালি তোমার ফোনটা বিজি পাচ্ছিলাম।'

আদিত্য চুপ করে ছিল। কী বলবে বুঝতে পারছিল না। রাখিদির চলে যাওয়াটা খানিকটা প্রত্যাশিতই ছিল, তবু, যাকে বলে হোপিং এগেন্সট হোপ। সকলেই মনে মনে ভাবছিল একটা মিরাকেল কি ঘটে যেতে পারে না?

'কী গো? কথা বলছ না কেন? আমরা এখন কী করব? আজই কি একবার যাব?'

'তুমিই বল কী করা উচিত। আমার এসব ব্যাপারে একদম মাথা খেলে না।' আদিত্য নিরীহ গলায় বলল।

'আমার মনে হয়, তোমার হাতের যা অবস্থা তাতে তোমার আজ শ্মশানে না যাওয়াই ভাল। আর গিয়েই বা কী করবে? মানুষটা তো আর ফিরে আসবে না। তার থেকে বরং প্রদীপদাকে একটা ফোন কোরো। আমিও করব। তারপর ধরো কাল সন্ধেবেলা কিংবা পরশু সকালে, মানে শুক্কুরবার সন্ধে কিংবা শনিবার সকাল, দুজনে মিলে একবার প্রদীপদার সঙ্গে দেখা করে আসব। কেমন? তোমার হাত কেমন আছে?'

'হাত ঠিকই আছে। শ্মশানে কারা নিয়ে যাবে জান?'

'দীপকদা যাবে। আর রাখিদির স্কুলের কয়েকজন কলিগ যাবে। তারা নাকি এতদিন জানতই না যে রাখিদি এত অসুস্থ। প্রদীপদা তাদের খবরই দেয়নি। আশ্চর্য!'

কেয়ার কথা শুনতে শুনতে আদিত্য অন্য একটা কথা গভীরভাবে চিন্তা করছিল।

বাড়ি ফিরে অবশ্য কেয়া মত বদলাল।

'কাল সন্ধেবেলা গেলে খুব দেরি হয়ে যাবে না? আমার তো এখন মনে হচ্ছে কাল সকালেই একবার প্রদীপদার সঙ্গে দেখা করে আসা উচিত।'

'আমি তো যেতেই পারি। কিন্তু তোমার সকালে স্কুল নেই?'

'একটু দেরি করে যাব। প্রথম দুটো পিরিয়াড দুজন ম্যানেজ করে দিতে পারবে। আমি বলে এসেছি। প্রদীপদার সঙ্গে দেখা করে স্কুলে চলে আসব। ওখানে বেশিক্ষণ থাকব না। স্কুলে এসে থার্ড পিরিয়াডটা নেব। তুমি বরং পারলে আর একটু থেকে যেও।'

'কিন্তু এই ভাঙা হাত নিয়ে আমি ফিরব কী করে?'

'সেটা আমি ভেবে রেখেছি। গাড়ি তো একটা ভাড়া করতেই হবে। গাড়িটা প্রথমে আমাদের বালিগঞ্জে প্রদীপদার বাড়িতে নিয়ে যাবে। তারপর আমাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আবার তোমাকে নিতে বালিগঞ্জ ফিরে আসবে।'

রাত্তিরে শুতে যাবার আগে আদিত্য দুটো জরুরি ফোন করল। প্রথমটা বিমলকে। আগামীকাল কী করতে হবে সে-ব্যাপারে আদিত্য বিমলকে বিস্তারিতভাবে নির্দেশ দিল। দ্বিতীয় ফোন সিবিআই অফিসার অমিত সাক্সেনাকে। সাক্সেনার সঙ্গে আদিত্যর অনেকক্ষণ কথা হল।

ঘরে প্রদীপ চক্রবর্তী ছাড়া দুজন মহিলা রয়েছেন। খোলা জানলা দিয়ে এলোমেলো বাতাস ঢুকছে। হয়তো আবার বৃষ্টি হবে। মহিলা দুজন আদিত্যদের দেখে উঠে দাঁড়ালেন।

'আমরা আজ আসি? পরে আবার একদিন আসব।'

'আসুন।' প্রদীপ চক্রবর্তীও দুই তালু একত্র করে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

মহিলাদের সদর দরজা অবধি এগিয়ে দিয়ে প্রদীপ চক্রবর্তী আবার ফিরে এলেন। বিষণ্ণ গলায় বললেন, 'তোমরা বোসো।'

আদিত্যরা এতক্ষণ দাঁড়িয়েই ছিল। এবার বসল। প্রদীপ চক্রবর্তীও বসেছেন। কাজের মাসি এসে ঘরে ঢুকেছে।

'একটু চা খাও।' প্রদীপ চক্রবর্তী আদিত্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন।

আদিত্যরা হ্যাঁ, না কিছুই বলল না। প্রদীপ চক্রবর্তী এবার কাজের মাসির উদ্দেশে বললেন, 'এদের জন্যে চা করো। আমিও একটু খাব।'

'শেষে হঠাৎ রাখিদির কী হল? আমরা তো ভাবছিলাম রাখিদি এবার ভেন্টিলেটার থেকে বেরিয়ে আসবে।' কেয়া জিজ্ঞেস করল।

'মাল্টি-অর্গান ফেলিওর। প্রথমে কিডনি দুটো অকেজো হয়ে গেল, তারপর একে একে শরীরের অন্য যন্ত্রগুলোও বিকল হতে শুরু করল। ডাঃ কুলকার্নি এখানকার ডাক্তারদের সঙ্গে নিয়মিত ভিডিও কনফারেন্স করে ইনস্ট্রাকশান দিচ্ছিলেন। কারোরই চেষ্টার কোনও ত্রুটি ছিল না।' কথা থামিয়ে প্রদীপ চক্রবর্তী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'কাল সব কিছু ঠিকঠাক মিটে গিয়েছিল? আদিত্যর হাতের জন্যে আমরা শ্মশানে যেতে পারিনি। ডাক্তার ওকে বেশি নড়াচড়া করতে বারণ করেছে।' কেয়াকে কিছুটা কুণ্ঠিত শোনাল।

'না, না। তোমরা না গিয়ে ভালই করেছ। শ্মশানের কাজ মোটামুটি নির্বিঘ্নে হয়ে গেছে।আমি তো পরলোকে বিশ্বাস করি না, রাখিও করত না। তাই দাহ করার আগে ওইসব মন্ত্র-টন্ত্রর বদলে রাখির একজন পুরোনো কলিগ গান গাইলেন— আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে। ভাল গাইলেন। রাখিদের ইস্কুলে উনি গানের টিচার। এই আর কী। এইটুকুই হল।' প্রদীপ চক্রবর্তী আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'তা হলে শ্রাদ্ধ-শান্তিও...' আদিত্য কথাটা শেষ করল না।

'না, শ্রাদ্ধ-শান্তি কিছু হবে না। তবে সপ্তাহখানেক পরে রাখিদের ইস্কুলে একটা স্মরণসভার আয়োজন হয়েছে।'

'আপনি এখন এখানেই তো থাকছেন?' আদিত্য হালকা করে জিজ্ঞেস করল।

'আমি আর কোথায় যাব? তবে সারাদিন বাড়িতে থাকাটা বোধহয় আর হবে না। কিছু ছোটখাটো কাজ দেখতে হবে। আসলে, তোমাদের বলতে দ্বিধা নেই, সংসারটা রাখির পেনশনের টাকাতে চলত। সেটা তো বন্ধ হয়ে গেল। একটা ফ্যামেলি পেনশন অবশ্য আছে। কিন্তু সেটা যৎসামান্য। আর আমি তো বেসরকারি চাকরি করতাম, সেখানে পেনশন-টেনশন কিছু নেই। যেটুকু টাকা জমাতে পেরেছিলাম তার কিছুটা দিয়ে এই ফ্ল্যাটটা কিনেছিলাম। বাকি পুরোটাই রাখির চিকিৎসায় খরচ হয়ে গেছে। আমার শরীর মোটামুটি ঠিকই আছে, সপ্তাহে দু তিনদিন বেরোলে অসুবিধে হবে না। মনটাও অন্য কাজে ব্যস্ত থাকবে। আমার পুরোনো কোম্পানিতেই হয়তো একটা পার্ট টাইম কিছু পেয়ে যাব। তবে সবকিছুই এখনও অনিশ্চিত।'

কাজের মাসি চা এনেছে। সঙ্গে ক্রিম ক্র্যাকার।

চা খেয়ে কেয়া উঠে দাঁড়াল। 'প্রদীপদা, আমাকে এবার উঠতে হবে। স্কুল আছে। আদিত্য আর একটু থাকছে।'

আরও ঘণ্টা দেড়েক পরে আদিত্য প্রদীপ চক্রবর্তীর বাড়ি থেকে বেরোল। মনটা অসম্ভব ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। শরীর-মন দুটোই অবসন্ন। কেয়া ইস্কুলে পৌঁছে গাড়িটা পাঠিয়ে দিয়েছে। আদিত্য ভাঙা হাত বাঁচিয়ে খুব সাবধানে গাড়িতে উঠল। খানিক দূর যেতে না যেতেই গৌতমের ফোন।

'তুই আছিস কেমন? হাতে আর ব্যথা আছে?'

'ঠিকই আছি। হাতে যন্ত্রণা খুব একটা নেই, একটা বোঁদা ব্যথা আছে। সেটুকু সহ্য করে নেওয়া যায়।'

'তুই কি বেরোচ্ছিস, নাকি বাড়িতেই আছিস?'

'মোটামুটি বাড়িতেই থাকছি। তবে আজ চার-পাঁচদিন পরে একটু বেরিয়েছি। এই মুহূর্তে বাড়ির বাইরে।'

'ও আচ্ছা। তা হলে কি তুই একবার লালবাজারে আসতে পারবি? আসলে, পুরীর ডিএসপি কৃষ্ণ পধি তার দলবল নিয়ে কলকাতায় এসেছে। দীপশিখার মাকে ইন্টারোগেট করেছে। আরও কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেছে। এবার তোর সঙ্গে কথা বলতে চায়। তোর কি দুপুরবেলা সময় হবে?'

'নিশ্চয় হবে। আমি এখন গড়িয়াহাট মোড়ের কাছে আছি। আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছি। কিন্তু তোকে একটা কাজ করতে হবে। এই মিটিংটার মধ্যে আরও দুজনকে ডেকে নিতে হবে। একজন গড়িয়াহাট থানার অচিন্ত্য সাহা, অন্যজন বালিগঞ্জ থানার সুভদ্র মাজি। এরা দুজনেই আমার সঙ্গে কাজ করেছে।'

'কিন্তু অচিন্ত্য সাহা তো সৈকত চৌধুরির কেসটা দেখছিল। অসীম দত্ত, অনির্বাণ দত্তদের খুনের কেসটার সঙ্গে ওর কী সম্পর্ক?'

'শোন। চারজন খুন হয়েছে। সৈকত চৌধুরি, মণিময় গুপ্ত, অসীম দত্ত, অনির্বাণ দত্ত। আমি রহস্যটা ক্র্যাক করে ফেলেছি। চারজনকে একই লোক খুন করেছে। লালবাজারে গিয়ে কৃষ্ণ পধির কথা আমি অবশ্যই শুনব, কিন্তু আমার কথাটাও যাতে সকলে শোনে তোকে তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আমার বিশ্বাস, আমার কথা শোনার পর কারও মনে আর খুব বেশি প্রশ্ন থাকবে না।'

'আদিত্য মজুমদার যখন বলছে একটা রহস্য ক্র্যাক করে ফেলেছে, তখন তো ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নিতেই হবে। আদিত্য মজুমদার তো মিছিমিছি বোস্ট করে না। ঠিক আছে বস। তুই চলে আয়। আমি সবাইকে হাজির করে রাখব। যবনিকা উত্তোলিত হোক।'

(২)

'কিছু খাওয়াতে পারবি? বেশ খিদে পেয়ে গেছে। ভেবেছিলাম বাড়ি ফিরে খাব। তা, বাড়ি না ফিরে তো এখানে চলে এলাম।'

'কী খেতে ইচ্ছে করছে বল।'

'তুই লাঞ্চে কী খাস?'

'আমি তো আজকাল টিফিন নিয়ে আসি। আজ স্যান্ডউইচ এনেছি। সেটা আমরা শেয়ার করতে পারি। কিন্তু আরও কিছু আনাতে হবে। একজনের খাবার দুজনে খেলে কারোরই পেট ভরবে না।'

'তোদের এখানে এখনও দইবড়া পাওয়া যায়? একবার খাইয়েছিলি, খুব ভাল লেগেছিল।'

'অবশ্যই পাওয়া যায়। তা হলে দইবড়াই আনতে দিই। স্যান্ডউইচ এবং দইবড়া। আর কফি। ভালই লাঞ্চ হবে।'

আদিত্য গৌতমের অফিসে একটু আগে আগেই পৌঁছে গেছে। বাঙালি ইন্সপেক্টার দুজনের কেউই এখনও এসে পৌঁছয়নি। উড়িষ্যার টিমও একটু আগে ফোন করে জানিয়েছে তাদের পৌঁছতে পৌঁছতে ঘণ্টা খানেক লেগে যাবে। অতএব এটাই লাঞ্চ খাওয়ার শ্রেষ্ঠ সময়। তাছাড়া আদিত্যর বেশ খিদেও পেয়ে গিয়েছিল।

খেতে খেতে গৌতম জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপারটা কী বলত? চার-চারটে খুন, তুই বলছিস একই লোক করেছে। অথচ পুলিশ সম্পূর্ণ অন্যভাবে চিন্তা করছে। দুটো অ্যারেস্টও করে ফেলেছে।'

'আমি তোকে এক্ষুনি কিচ্ছু বলছি না। বলে দিলে তোর ইন্টারেস্ট চলে যাবে। শুধু এইটুকু বলতে পারি এই রকম আশ্চর্য কেস আমি আগে কখনও হ্যান্ডেল করিনি।'

'ঠিক আছে আমি কৌতূহল চেপে রাখছি। ঘণ্টা খানেকের তো ব্যাপার।' গৌতম এক কামড়ে একটা স্যান্ডউইচের প্রায় আধখানা মুখের ভিতরে চালান করে দিল।

ঘণ্টা দেড়েক পরে যখন সকলে এসে গেছে, গৌতমের ঘরে কৃষ্ণ পধি, গৌতম আর আদিত্যর জন্য বোন চায়নায় উৎকৃষ্ট দার্জিলিং চা পরিবেশিত হয়ে গেছে, এবং পুলিশ হায়ারারকির প্রোটোকল অনুযায়ী বাকিরা ডাক পাবার অপেক্ষায় বাইরে অপেক্ষা করছে, অপেক্ষা করতে করতে হয়তো চা-ও খাচ্ছে, কৃষ্ণ পধি আদিত্যকে বললেন, 'আদিত্যবাবু, আমরা তো একভাবে এগোচ্ছি। একটা অ্যারেস্টও হয়ে গেছে। এই অবস্থায় আরও এগোনোর আগে খুব অনেস্টলি জানতে চাই আপনি এই ব্যাপারটা নিয়ে কোনও সিদ্ধান্তে এসেছেন কি? আসলে আপনার ওপিনিয়নটাকে আমরা খুব ভ্যালু করি। এবং আমরা এটাও জানতে পেরেছি আপনি দীপশিখা চৌধুরির অ্যারেস্টটা অ্যাপ্রুভ করেন না। কিন্তু কেন অ্যাপ্রুভ করেন না সেটা জানতে পারলে আমাদের খুব উপকার হয়। দেখুন, আপনাকে ফ্র্যাঙ্কলি বলছি, আমরা চাই না ভুল স্টেপ নিয়ে আমাদের লস অফ ফেস হোক। তাই খুব পোলাইটলি আপনার ভিউটা জানতে চাইছি।'

আদিত্য ভাবছিল, পধি লোকটা কি সত্যিই এত বিনয়ী নাকি এই বিনয়ের পেছনে অন্য কোনও কারণ আছে? আদিত্য জানে দ্বিতীয়টাই বেশি সম্ভব। বিনয়ের পেছনে কারণটাও সে আন্দাজ করতে পারছে।

সে মুখে বলল, 'ডিএসপি সাহেব, এই কেসটা আমার মতো করে আমি সলভ করেছি। আপনি যদি অনুমতি দেন তা হলে আমার কথাগুলো আমি বলতে পারি। তবে তার আগে আপনার অনুমতি নিয়ে কলকাতা পুলিশের দুজন ইন্সপেক্টারকে ডেকে নিতে চাই। আর আপনি চাইলে আপনার লোকদেরও ডেকে নিতে পারেন।'

পধি একটু ইতস্তত করে বলল, 'এই ঘরে যে কথাবার্তা হবে সেটা আমার মনে হয় কনফিডেন্সিয়াল থাকাই ভাল। মানে আপাতত শুধু আমরা তিনজনই না হয় ব্যাপারটা জানলাম। আমার অনুরোধ, আপনি আপনাদের ইন্সপেক্টার দুজনকে এখন বাইরেই রাখুন। দরকার হলে ওদের ডেকে নেওয়া যাবে। আর আমার সঙ্গে যারা এসেছে তারাও বাইরেই থাকুক। আমি পরে ওদের দরকার মতো ব্রিফ করে দেব।'

'আমার মনে হয় ডিএসপি ঠিকই বলেছেন। আপাতত আমরা দুজন তোর কথা শুনি। ব্যাপারটা পাবলিক করার এক্ষুনি কী দরকার?'

'ঠিক আছে। আমি তাহলে আমার কথাগুলো বলছি। আমাকে একটু সময় দিতে হবে কিন্তু।' আদিত্য বলতে শুরু করল।

'একেবারে গোড়া থেকে শুরু করছি। কিছুদিন আগে একটা রবিবারের সকালে অনিতা চৌধুরি বলে একটি মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। মেয়েটি আমার স্ত্রী কেয়ার এক কলিগের পড়শি। খুব বিপদে পড়ে আমার কাছে এসেছে। মেয়েটি বলল তার স্বামী সৈকত চৌধুরি খুন হয়েছে। খুন হবার আগে সে একটা মোটা টাকার ইনশিয়োরেন্স করেছিল, যে ইনশিয়োরেন্সের বেনিফিশিয়ারি অনিতা। পুলিশ সন্দেহ করছে টাকার লোভে অনিতাই তার স্বামীকে খুন করেছে কিংবা কাউকে দিয়ে করিয়েছে।

'গড়িয়াহাট থানার ইন্সপেক্টার অচিন্ত্য সাহা কেসটা তদন্ত করছিল, আমি তার সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। অনিতা যেটা ভয় পেয়েছিল, অচিন্ত্য সাহা সেটাই কনফার্ম করল। পুলিশ অনিতাকেই মূলত সন্দেহ করছে। অচিন্ত্য সাহা কেসটাতে আর একটা মাত্রা যোগ করল। বলল, অনিতার একটা বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক চলছে। সম্ভবত, অনিতা এবং তার প্রেমিক মিলে সৈকত চৌধুরিকে খুন করেছে। পরে অনিতার পড়শিদের কাছেও শুনলাম, সৈকত যখন বাড়ি থাকত না তখন একটি ছেলে অনিতার সঙ্গে দেখা করতে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে যেত। এর কথা কিন্তু প্রথম দিন অনিতা আমাকে বলেনি।

'অচিন্ত্য সাহার কাছে এটাও শুনলাম যে বিপ্লব সমাদ্দার বলে একজন গোয়েন্দা ইনশিয়োরেন্স কোম্পানির তরফ থেকে কেসটা তদন্ত করছে। বিপ্লব প্রাক্তন পুলিশ অফিসার, অচিন্ত্যর চেনা। পুলিশ ফোর্স ছাড়ার পর বিপ্লব সমাদ্দার ওই বেসরকারি ইনশিয়োরেন্স কোম্পানিটাতে কাজ করছে যাদের কাছ থেকে সৈকত জীবনবিমা কিনেছিল। বিপ্লব সমাদ্দারের কথায় পরে বিস্তারিতভাবে আসব। আপাতত শুধু এইটুকু বলে রাখি যে যেহেতু বিপ্লব সমাদ্দার ইনশিয়োরেন্স কোম্পানির হয়ে সৈকত চৌধুরির কেসটা ইনভেস্টিগেট করছিল, তার উদ্দেশ্য ছিল অনিতাকে সৈকতের খুনি প্রমাণ করা। কারণটা সহজ। অনিতাকে সৈকতের খুনি প্রমাণ করতে পারলে ইনশিয়োরেন্সের টাকাটা কোম্পানিকে দিতে হবে না।'

আদিত্য দম নেবার জন্যে একটু থামল। সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু এখানে সেটা সম্ভব নয়। আদিত্য উদাস হয়ে বাইরে তাকাল। জানলার ফ্রেমে রোদ-ঝলমলে চিৎপুর রোড। একটা ট্রাম ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে চলে যাচ্ছে। প্রায় ফাঁকা, শুধু মাঝখানের দুটো সিটে, দুটো লোক। কী বোকা লোকগুলো, আদিত্য ভাবল। ড্রাইভারের পেছনের সিটটা ফেলে কেউ মাঝখানে বসে নাকি?

'আচ্ছা, আদিত্যবাবু, আপনি আমাকে এই সৈকত চৌধুরির মার্ডার কেসটার কথা কেন বলছেন? এটার সঙ্গে আমাদের, মানে উড়িষ্যা পুলিশের কী সম্পর্ক?' আদিত্যকে থেমে যেতে দেখে কৃষ্ণ পধি জিজ্ঞেস করল।

'গভীর সম্পর্ক, ডিএসপি সাহেব, গভীর সম্পর্ক। এক্ষুনি বুঝতে পারবেন, কেন।'

'আবার একটু চা খাবি নাকি?'

'চায়ে আমার কোনওদিনই আপত্তি নেই।'

'পধি, আপনি?'

'আমিও একটু চা খেতে পারি।'

'ডিএসপি সাহেব, এবার আপনার প্রশ্নের উত্তরে আসছি।' আদিত্য আবার বলতে শুরু করেছে। সৈকত খুন হবার কাছাকাছি সময় আরও দুটো অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল। একটা খুন, আরেকটা খুনের চেষ্টা। খুন হয়েছিল সৈকতের পার্টনার এবং এক সময়ের মেন্টর মণিময় গুপ্ত। খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল সৈকতদের কম্পানির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত একজন বড় কন্ট্রাকটরকে যার নাম অসীম দত্ত। অসীম দত্তর ধারণা হয়েছিল তাঁর ওপর আবার খুনের চেষ্টা হতে পারে। তিনি আমাকে নিয়োগ করলেন। কে তাঁকে খুন করার চেষ্টা করেছিল, সেটা খুঁজে বার করা এবং সত্যিই যদি ভবিষ্যতে তিনি খুন হয়ে যান তা হলে সেই খুনের রহস্য সমাধান করা, এই হবে আমার কাজ।'

আদিত্য লক্ষ করল অসীম দত্তর নাম উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ পধির মনঃসংযোগ বেড়ে গেছে।

চা এসেছে। চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে আদিত্য আবার শুরু করল।

'কে অসীম দত্তকে খুন করার চেষ্টা করেছিল সেটা ইনভেস্টিগেট করতে গিয়ে বালিগঞ্জ থানায় হাজির হলাম। সেখানে ইন্সপেক্টার সুভদ্র মাজি আমাকে অসীম দত্তর ফাইলটা দেখতে দিল। প্রসঙ্গত বলি, সুভদ্রর মতো এত সৎ এবং দক্ষ পুলিশ অফিসার আমি খুব বেশি দেখিনি। তো সে যাই হোক, ফাইলে আমি একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ করলাম যেটা পুলিশ লক্ষ করেনি। সৈকতের সূত্র ধরে যদি অচিন্ত্য সাহা অসীম দত্তর আক্রমণকারিকে খুঁজতে বালিগঞ্জ থানায় পৌঁছে যেত, তা হলে হয়তো সেও ব্যাপারটা লক্ষ করত। কিন্তু তার মাথায় অনিতা চৌধুরি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কেন ছিল না সে প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে।

'আমি বালিগঞ্জ থানায় গিয়ে কী আশ্চর্য জিনিস লক্ষ করলাম সেটা বলি। আমি লক্ষ করলাম, যে-শনিবার বিকেল-সন্ধে নাগাদ সৈকত খুন হয়, ঠিক সেদিনই, সম্ভবত সৈকত খুন হবার একটু আগে, অসীম দত্তর ওপর আক্রমণ হয়। এবং পরে আমি জানতে পেরেছি সেই একই দিন সকালের দিকে মণিময় খুন হয়। এটা কি সমাপতন? যদি হয়েও থাকে, তা হলে খেয়াল করতে হবে, সমাপতন আরও আছে। সৈকত এবং মণিময়ের মৃত্যু হয়েছিল .৩২ পিস্তলের গুলিতে, যে বুলেটটা অসীম দত্তর মোবাইলে আটকে গিয়েছিল সেটাও .৩২। এটাও লক্ষণীয় যে, পরবর্তীকালে পুরীর নিকটবর্তী রিসর্টে .৩২ পিস্তলের গুলিতেই অসীম দত্ত এবং তার ছোট ছেলে অনির্বাণ দত্ত খুন হয়েছিলেন। সৈকত ও তার পার্টনার মণিময়ের মৃত্যু এবং অসীম দত্ত, অনির্বাণ দত্তর মৃত্যুকে যদি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে ধরে নিই, তাহলে এটা একটা সমাপতন যে চারটে খুনই একই ধরনের পিস্তলের গুলিতে হয়েছে। কিন্তু এতটা সমাপতন কি সম্ভব?'

আদিত্য চায়ের কাপে আর একটা চুমুক দিল। তারপর আরো একটা। শেষে লম্বা একটা চুমুকে কাপের চা শেষ করে আবার বলতে শুরু করল।

'আরও একটা কারণে ঘটনাটা সমাপতন বলে মেনে নেওয়া শক্ত। ব্যালিস্টিক রিপোর্ট বলছে, গুলিগুলো ছোঁড়া হয়েছে ৫২-৫৩ সালের মডেলের স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন পিস্তল থেকে। এটা একটা পুরোনো মডেলের পিস্তল যেটা বাজারে এখন প্রায় পাওয়াই যায় না। দুটো আলাদা লোক দুটো আলাদা আলাদা ৫২-৫৩ মডেলের স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন জোগাড় করে একই দিনে সামান্য সময়ের তফাতে সৈকত, মণিময় এবং অসীম দত্তর দিকে তাক করে গুলি চালিয়েছে, এটা মেনে নেওয়া অসম্ভব। নির্মোহ যুক্তি দিয়ে বিচার করলে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হবে যে গত ৩রা জানুয়ারি একটাই লোক কয়েক ঘণ্টা সময়ের ব্যবধানে গুলিগুলো চালিয়েছিল। প্রথমে মণিময়ের ওপর, তারপর অসীম দত্তর ওপর, এবং সব শেষে সৈকত চৌধুরির ওপর। বরাত জোরে সেদিন অসীম দত্ত বেঁচে গিয়েছিলেন, সৈকত বা মণিময় বাঁচতে পারেনি। তবে কিছুদিন পরে ওই একই আততায়ীর হাতে একই স্মিথ ওয়েসনের দ্বারা অসীম দত্ত এবং তার ছেলে অনির্বাণ দত্ত খুন হন।'

ঘরে অখণ্ড নীরবতা। শুধু দেয়ালে পুরোনো আমলের একটা দেয়াল ঘড়ি টিকটিক করে চলছে।

'মণিময় গুপ্তও যে ওই ৩ জানুয়ারি খুন হন, এটা কী করে জানা গেল?' গৌতমের জিজ্ঞাসা।

'বলছি কী করে। সৈকত চৌধুরির কেসটা ইনভেস্টিগেট করতে করতে আমরা, মানে আমি আর অচিন্ত্য সাহা, সৈকতের পার্টনার মণিময় গুপ্তর নরেন্দ্রপুরের বাগানবাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিলাম। এই বাগানবাড়িটা, বলা যায়, মণিময়ের গোপন প্রেমের কুঞ্জবন। আমরা আবিষ্কার করলাম, যে সময়টা, মণিময় ঘোষণা করত, সে বিদেশে আছে, সেই সময়টা আসলে সে একজন বিবাহিত মহিলার সঙ্গে নরেন্দ্রপুরের বাগানবাড়িতে বসবাস করত। এছাড়াও আমরা আবিষ্কার করলাম ওই বাগানবাড়িতে প্রচুর ক্যাশ টাকা মণিময় লুকিয়ে রেখেছে। বলাই বাহুল্য, এগুলো কালো টাকা।

'নরেন্দ্রপুরের বাগানবাড়ি থেকেই মণিময়ের লাশ আবিষ্কৃত হল। কেউ মণিময়কে খুন করে বাগানবাড়ির পুকুরে ফেলে রেখেছিল। মণিময়ের বান্ধবীর কাছ থেকে আমি পরে জানতে পেরেছি ৩ জানুয়ারি সকালেও

মণিময়ের সঙ্গে তার ফোনে কথা হয়েছিল, মণিময় বলেছিল সে এবার মাছ ধরতে যাবে, কিন্তু ৪ জানুয়ারি নরেন্দ্রপুর পৌঁছে বান্ধবী আর মণিময়কে দেখতে পায়নি। অতএব এটা মোটেই অসম্ভব নয় যে মণিময়ও ওই ৩ জানুয়ারিই খুন হয়েছিল। আগেই বলেছি, মণিময়ের শরীর থেকে যে বুলেটটা পাওয়া গেছে সেটাও .৩২ স্মিথ করোনা থেকে ছোঁড়া। সেই জন্যেই বলছি, কোনও আততায়ী ৩ জানুয়ারি প্রথমে মণিময় গুপ্ত, তারপর অসীম দত্ত এবং সব শেষে সৈকত চৌধুরির দিকে তার স্মিথ করোনা থেকে গুলি চালায়। তাৎক্ষণিকভাবে আততায়ী নিশ্চয় ভেবেছিল মণিময় এবং সৈকতের মতো অসীম দত্তও মারা গেছেন। পরে তার ভুল ভাঙে। অবশ্য আমার ধারণা ইন্সপেক্টার অচিন্ত্য সাহা মণিময় হত্যার দায়টা মণিময়ের বান্ধবী ঊর্মিমালা মিত্রর ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার জন্য কেস সাজাচ্ছে।

'পুলিশ অনিতা চৌধুরিকে সৈকত হত্যার দায়ে এবং দীপশিখা দত্তকে অনির্বাণ দত্ত হত্যার চার্জে গ্রেপ্তার করেছে। আমি আন্দাজ করছি, ঊর্মিমালা মিত্রকেও মণিময় হত্যার দায়ে অ্যারেস্ট করার কথা ভাবা হচ্ছে। প্রশ্ন হল, যদি ধরে নিই একই ব্যক্তি খুনগুলো করেছে তা হলে এই তিনজনের কেউ কি সেই ব্যক্তি হতে পারে? আমার পরিষ্কার উত্তর না, হতে পারে না। অনিতা সৈকত এবং মণিময়কে চিনলেও অসীম দত্তকে খুব সামান্যই চিনত। আর অনির্বাণ দত্তকে তো চিনতই না। দীপশিখা অসীম এবং অনির্বাণকে চিনলেও সৈকত এবং মণিময়কে চিনত না। ঊর্মিমালা শুধু মণিময়কেই চিনত, আর কাউকে নয়। অর্থাৎ এদের কারোরই এক সঙ্গে এই সব ক'টা খুন করার কোনও কারণ ছিল না।

'খুন করার জন্যে দুটো জিনিস সবার আগে দরকার মোটিভ এবং সুযোগ। কার ছিল চার চারটে খুন করার মোটিভ এবং সুযোগ? কিন্তু সেই মূল প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে আরও দুটো প্রশ্ন করা যেতে পারে। অনিতার প্রেমিক সমীর প্যাটেলকে কে মারধোর করে হাসপাতালে পাঠাল? কেন মারধোর করল? দুনম্বর প্রশ্ন, গত শনিবার রাজারহাট নিউ টাউনে কারা আমাকে খুন করতে চেয়েছিল? কেন চেয়েছিল?

ইন্টারকমে গৌতমের একটা ফোন এসেছে। ফোনে সংক্ষিপ্ত কথা বলার পর সে ফোন নামিয়ে রেখে বলল, 'আমাকে কমিশনার সাহেব ডেকে পাঠিয়েছেন। একটা ব্যাপারে ওঁকে ব্রিফ করতে হবে। আমি মিনিট দশেক ঘুরে আসছি।'

'আমি তাহলে বাইরে বেরিয়ে একটা সিগারেট খেয়ে আসি?' গৌতম উঠে দাঁড়াতেই আদিত্য উঠে দাঁড়িয়েছে।

'আপনি তাহলে এখানেই একটু বসুন।' ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে কৃষ্ণ পধির দিকে তাকিয়ে গৌতম বলল।

(৩)

'যেটা বলছিলাম, মূল প্রশ্নটা হল, কার বা কাদের ওই চারজনকে খুন করার মোটিভ এবং সুযোগ ছিল?' মিনিট কুড়ি বিরতির পর আদিত্য বলতে শুরু করল।

'প্রথমে মোটিভ। পৃথিবীতে যত খুন হয় তার একটা বড় অংশ ঘটে টাকার কারণে। এই খুনগুলোর পেছনেও একটা জোরাল টাকার মোটিভ থাকতে পারে না কি? অসীম দত্ত এবং অনির্বাণ দত্ত মারা গেলে টাকার দিক থেকে তিনজনের লাভ—অনিকেত-ছন্দা, শ্বেতা-জয়ন্ত, দীপশিখা এবং তার মা সোমা মজুমদার। বাবা এবং ভাই মারা গেলে অনিকেত কোম্পানির মালিক হবে, এটাই তার এবং তার স্ত্রীর লাভ। শ্বেতা-জয়ন্তের বেলাতেও তাই। সোমা মজুমদারের স্বামী দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী, অসীম দত্ত দীর্ঘদিন বিপত্নীক। তাদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বস্তুত, অসীম দত্তই সোমার সংসারটা চালাতেন। সোমা জানত, একটা মোটা টাকা অসীম দত্ত তার জন্য রেখে গেছেন। কিন্তু অসীম দত্তর এক্ষুনি মারা গেলে সোমার তেমন

লাভ নেই। অসীম দত্তর রেখে যাওয়া টাকাটা সে পাবে বটে কিন্তু মোটা মাসোহারাটা বন্ধ হয়ে যাবে। অসীম দত্তকে এক্ষুনি মেরে তার কী লাভ? বাকি রইল দীপশিখা। অসীম দত্তর অবর্তমানে তার সম্পত্তির একটা অংশ পাবে অনির্বাণ আর ডিভোর্সের আগে অনির্বাণ মারা গেলে দীপশিখা তার স্বামীর অংশটা পেয়ে যাবে। তাছাড়া মায়ের প্রেমিকের প্রতি দীপশিখার একটা স্বাভাবিক ঘৃণা থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু দীপশিখা সৈকত বা মণিময়কে মারতে যাবে কেন? বাকি রইল জয়ন্ত-শ্বেতা এবং অনিকেত-ছন্দা।

'সমস্যাটা ভাল করে বোঝার জন্যে এইস বিল্ডার্স এবং গুপ্ত অ্যান্ড চৌধুরি এই দুটি কম্পানির অভ্যন্তরে ঢুকতে হবে। এখানে তিনটে জিনিস বলার আছে। এক, মণিময়-সৈকতের কম্পানি অসীম দত্তর কোম্পানির কাছে গলা অবধি ধারে ডুবে ছিল। দুই, দুটি কম্পানি যৌথভাবে প্রচুর দুনম্বরি কাজ করত যা থেকে লাভ করত মণিময় এবং অসীম দত্ত। সৈকত কোম্পানির আর্থিক দিক নিয়ে একদম মাথা ঘামাত না বলে অনেকদিন অবধি সে এই দুনম্বরির কথা জানতে পারেনি। যখন জানতে পারল, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। তিন, সমস্ত আর্থিক অনিয়মের ব্যাপারে সৈকতকে শিখণ্ডি খাড়া করা হত। সৈকত তার একদা মেন্টর মণিময়কে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করত বলে অন্ধভাবে সে সমস্ত কাগজপত্রে সই করে দিত। তারপর এমন একটা ঘটনা ঘটল যেটা থেকে সৈকত বুঝতে পারল মণিময় এবং অসীম দত্ত তাকে ভীষণভাবে ঠকিয়েছে।'

আবার ফোন বাজছে। এবার আদিত্যর ফোন। বিমল। 'বাড়ি থেকে বেরোয়নি? ঠিক আছে। তুমি নজর রাখ, আর বেরোলে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানিও।' আদিত্য ফোন রেখে দিল। গৌতমদের দিকে তাকিয়ে আবার বলতে শুরু করেছে।

'হ্যাঁ, একটা ঘটনার কথা বলছিলাম। ঘটনা না বলে দুর্ঘটনাই বলা উচিত। এটার কথা নেহাত কপালের জোরে এক সাংবাদিকের কাছ থেকে আমি জানতে পেরেছিলাম। ব্যাপারটা এইরকম। কয়েক বছর আগে ন্যাশানাল হাইওয়ে ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অজয় নদীর ওপর একটা ব্রিজ বানানোর সিদ্ধান্ত নেয়। জায়গাটা চিত্তরঞ্জনের কাছে, নাম সিমজুড়ি। ব্রিজটা তৈরি করার বরাত দেওয়া হয় গুপ্ত অ্যান্ড চৌধুরি সিভিল কনস্ট্রাকশানসকে, অর্থাৎ মণিময় এবং সৈকতের কোম্পানিকে। মণিময় এবং সৈকতের কোম্পানি ব্রিজের ডিজাইন তৈরি করে দিয়ে অসীম দত্তর এইস বিল্ডার্সকে কনট্র্যাকটটা দেয়। এইস বিল্ডার্স আবার সাব-কন্ট্রাক্ট করে কাজটা দত্ত কনস্ট্রাকশান্সকে, অর্থাৎ অনিকেত দত্তর কোম্পানিকে দিয়ে দেয়। উল্লেখ করা যেতে পারে, দুনম্বরি কাজগুলো অসীম দত্ত তার বড় ছেলে অনিকেত দত্তর কোম্পানিকে দিয়ে করাত, যাতে তার নিজের গায়ে সরাসরি আঁচ না লাগে। আর এই ব্রিজ তৈরির ব্যাপারে বিরাট দুনম্বরি হয়েছিল। অনুমোদিত প্ল্যানটা মানা হয়নি। তাছাড়া খুব খারাপ মেটিরিয়াল দিয়ে তৈরি হয়েছিল ব্রিজটা।

'ব্রিজটা উদ্বোধন হবার আগেই ভেঙে পড়ল। এতটাই খারাপ ছিল মালমশলা এবং প্ল্যান। ব্রিজের নীচে অজয় নদীর বালির ওপর, তাঁবু খাটিয়ে কিছু মিস্ত্রি সপরিবারে থাকছিল, তাদের ওপর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল ব্রিজ। এগারো জন মারা গেল, তার মধ্যে তিনজন মহিলা, দুজন শিশু। গুপ্ত অ্যান্ড চৌধুরি সিভিল কনস্ট্রাকশানস-এর বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত শুরু হল, মূলত সৈকত চৌধুরি তাদের লক্ষ্য, কারণ কাগজপত্রে সব সই তার। দত্ত কনস্ট্রাকশানস এবং এইস বিল্ডার্স আইনের ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে গেল। মণিময়ও। কারণ সে কোথাও সই করেনি। সেই প্রথম সৈকত বুঝতে পারল মণিময় এবং অসীম দত্ত তাকে কীরকম ঠকিয়েছে।'

'আমাকে সিবিআই ফোন করেছিল।' কৃষ্ণ পধি নিচু গলায় বলল।

'জানি, জানি। আপনার সঙ্গে কথা হবার আগে অমিত সাক্সেনা সাহেবের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। সিবিআই বলেছে বলেই তো আপনি আমার কথা এত মন দিয়ে শুনছেন, তাই না ডিএসপি সাহেব?' আদিত্য ম্লান হাসল। কৃষ্ণ পধি মাথা নামিয়ে নিয়েছে।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমরা আসল গল্পটা থেকে সরে যাচ্ছি। আদিত্য বল তারপর কী হল।' মিটমাট করিয়ে দেবার ভঙ্গিতে গৌতম বলল।

'এবার অনিকেত-ছন্দা এবং জয়ন্ত-শ্বেতার প্রসঙ্গে আসি। আমি এখানে শ্বেতা এবং ছন্দাকে ব্যাকগ্রাউন্ডে রাখছি, কারণ ওদের পক্ষে আলাদা করে এই ক্রাইমগুলো করা আনলাইকলি। কিন্তু অনিকেত এবং জয়ন্তর কথা আলাদা।

'অনিকেতের একটা অপরাধ প্রবণতা ছিল। সে কয়েকবার তার বাবার কোম্পানি থেকে চুরি করে ধরাও পড়েছিল। তার বাবা তাকে আলাদা কম্পানি করে দেয়। সে যাতে নিজেকে শোধরাতে পারে সেজন্য নয়, তার অপরাধ প্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে এবং তাকে শিখণ্ডী বানিয়ে যাতে আরও বড় চুরি করা যায় সেজন্যে। অনিকেতের বাবা অনিকেতের থেকেও বড় চোর ছিল এবং চুরির ব্যাপারে নিজের ছেলেকে শিখণ্ডি খাড়া করতেও তার বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না। এই কারণে অনিকেত তার বাবাকে ঘৃণা করত। ঘৃণার আরেকটা কারণ সোমা মজুমদারের সঙ্গে তার বাবার অবৈধ সম্পর্ক। সোমা মজুমদারের ব্যাপারে শ্বেতাও ঘৃণা করত তার বাবাকে।

'অনিকেত আর জয়ন্ত মল্লিকের প্রভূত টাকার দরকার হয়ে পড়েছিল। জয়ন্ত খানদানি জুয়াড়ি, দুর্বল চরিত্রের অনিকেত তার পাল্লায় পড়ে সেও জুয়াড়ি হয়ে গিয়েছিল। আমার লোক তাদের দিনের পর দিন ফলো করে দেখেছে রেস এবং তাসের জুয়া ছাড়াও বহু টাকা দুজনে মিলে শেয়ার বাজারে নষ্ট করেছে। না হলে অনিকেতের কোম্পানির এবং জয়ন্তর গেস্ট হাউসের অতটা খারাপ অবস্থা হবার কথা নয়। আশ্চর্য, অনিকেতের বউ ছন্দা এসব কিছুই টের পায়নি। শ্বেতা মল্লিক অবশ্য সবই জানত। যাই হোক, জুয়া এবং ফাটকা খেলে জয়ন্ত মল্লিক তো বটেই, অনিকেত দত্তরও বাজারে বিপুল ধার হয়েছিল।

'অনিকেত তার বাবার এবং সৈকত-মণিময়ের কোম্পানির ভিতরের খবর সবই রাখত। সে জানত, এইস বিল্ডার্সের পুঁজির প্রায় সবটাই গুপ্ত অ্যান্ড চৌধুরি কনস্ট্রাকশান্সকে দীর্ঘ মেয়াদে ধার দেওয়া আছে। যদি অনিকেত বা তার সাঙাত জয়ন্ত মল্লিক এইস বিল্ডার্সের মালিকানা পেয়েও যায় তা হলেও ঋণের শর্ত অনুযায়ী সেই টাকা সঙ্গে সঙ্গে ফেরত পাওয়া যাবে না। ফলে তাদের যে টাকাটা এক্ষুনি দরকার সেটা তারা এইস বিল্ডার্স থেকে জোগাড় করতে পারবে না। তাছাড়া গুপ্ত অ্যান্ড চৌধুরি সিভিল কনস্ট্রাকশান্স-এর ওপর সিবিআই-এর নজরের কথাও অনিকেত জানত। তার ভয় ছিল, সিবিআই এনকোয়ারির ফলে গুপ্ত অ্যান্ড চৌধুরি কনস্ট্রাকশান্স যদি বন্ধ হয়ে যায় তা হলে সেখান থেকে এক্ষুনি টাকা পাবার সম্ভাবনা আরও কমে যাবে।

'একটাই উপায় ছিল। ঋণের শর্ত অনুযায়ী গুপ্ত অ্যান্ড চৌধুরি কনস্ট্রাকশান্স-এর দুজন পার্টনারেরই যদি মৃত্যু হয় তাহলে কোম্পানির স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে উত্তমর্ণ কোম্পানি এইস বিল্ডার্স তার টাকা তুলে নিতে পারবে। ফলে শুধু অসীম দত্ত, অনির্বাণ দত্ত মরলেই চলবে না, সৈকত এবং মণিময়কেও মরতে হবে। আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করার ব্যাপারে জয়ন্ত মল্লিকের কোনও জড়তা নেই। সে অনায়াসে সৈকত খুন হবার আগের রাত্তিরে দুজন সিকিউরিটির ডিউটি চেঞ্জের ফাঁকে সৈকতদের আবাসনে টুক করে ঢুকে গিয়ে ছাতে ট্যাঙ্কের আড়ালে সারা রাত্তির লুকিয়ে থাকতে পারত। একজন মিলিটারির পক্ষে ওইটুকু কষ্ট করা কিছুই নয়। পরের দিন কাজ সেরে ডামাডলের মধ্যে টুক করে সরে পড়াও তার কাছে সহজ কাজ।'

'তা হলে তুই বলছিস অনিকেত আর জয়ন্ত মিলে খুনগুলো করেছে? নাকি অনিকেতের বুদ্ধিতে জয়ন্ত একাই খুনগুলো করেছে?' গৌতম রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল।

'না, না। আমি এখনও কিছুই বলছি না। শুধু লজিকালি এগোনোর চেষ্টা করছি। আচ্ছা, এই স্টেজে এসে আমি দীপশিখা আর তার মাকে সন্দেহভাজনের তালিকা থেকে বাদ দিলাম। এর অনেকগুলো কারণ। প্রথমত, দীপশিখাদের পক্ষে গুপ্ত অ্যান্ড চৌধুরি কনস্ট্রাকশান্স বা এইস বিল্ডার্সের ভিতরের খবরগুলো জানা

সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়ত, দীপশিখা বা তার মা বাজার থেকে একটা সেকেলে পিস্তল ভাড়া করে গব্বড় সিং-এর কায়দায় ধাঁই ধাঁই করে চারজনকে খুন করে ফেলবে, এটা ভাবতে আমার অসুবিধে হচ্ছিল। তাছাড়া, সৈকতের বাড়িতে ওরা ঢুকবেই বা কেমন করে? সব থেকে বড় কথা ওদের টাকার এমন কোনও আশু প্রয়োজন ছিল না যে এক্ষুনি চার-চারটে খুন করে ফেলতে হবে।

'কিন্তু যদি ধরে নিই অনিকেত আর জয়ন্ত মিলে খুনগুলো করেছে তা হলে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তরহীন থেকে যাবে। এক, সৈকত চৌধুরি খুন হবার আগে হঠাৎ অত টাকার ইনশিয়োরেন্স করতে গেল কেন? দুই, অনিকেতের একার পক্ষে চার-চারটে খুন করা সম্ভব নয়। তবে জয়ন্ত মল্লিকের সঙ্গে মিলে সে খুনের ষড়যন্ত্র করতেই পারত। কিন্তু যদি জয়ন্ত মল্লিক খুনগুলোর পেছনে থাকে তা হলে অত পুরোনো মডেলের একটা পিস্তল সে ব্যবহার করতে যাবে কেন? জয়ন্ত মল্লিককে আমরা অনায়াসে একজন আগ্নেয়াস্ত্র বিশেষজ্ঞ বলে ধরে নিতে পারি। তার তো ভাল করেই জানা উচিত ছিল উল্টোদিকের নির্মীয়মাণ বাড়ি থেকে ওই মান্ধাতার আমলের হ্যান্ডগান দিয়ে গুলি চালালে অসীম দত্তর বাড়ির পোর্টিকোয় পৌঁছতে পৌঁছতে গুলির গতি কমে আসবে। ফলে কাজের কাজ নাও হতে পারে। আর একটা কথা, মিলিটারিদের এমন ট্রেনিং যে প্রতিপক্ষকে মারতে হলে তারা গলায় বা মাথায় গুলি করে, যেহেতু প্রতিপক্ষ সাধারণত বুলেট প্রূফ ভেস্ট পরে থাকে। এক্ষেত্রে অবশ্য যারা খুন হয়েছে তাদের কেউই বুলেট প্রূফ ভেস্ট পরে ছিল না, থাকার কথাও নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মিলিটারি ট্রেনিংপ্রাপ্ত কেউ গুলিগুলো করলে সেগুলো বুকে না লেগে মাথায় লাগাটা আরও স্বাভাবিক ছিল। ট্রেনিং কেউ সহজে ভোলে না। এইসব ভেবে আমি এই সিদ্ধান্তে এলাম যে অনিকেত দত্ত এবং জয়ন্ত মল্লিক মিলে এই খুনগুলো করেনি।'

'তাহলে কে করল খুনগুলো?' পধির গলায় অকৃত্রিম কৌতূহল।

'বলছি, ডিএসপি সাহেব, বলছি। কিন্তু তার আগে আর একবার চা খেতে হবে।' শেষের কথাগুলো গৌতমের উদ্দেশে। কৃষ্ণ পধি এবং গৌতমের কৌতূহলটা আদিত্য বেশ উপভোগ করছে।

'চা খাওয়াচ্ছি। তুই বলে যা। থামিস না।' গৌতম বেল বাজাল।

'সন্দেহ নেই, এই মর্মান্তিক কাহিনির শুরু ব্রিজ ভেঙে এগারজন মৃত্যু হওয়ার সেই ভয়ঙ্কর ঘটনা থেকে। প্রথমে মনে হয়েছিল, যারা মারা গেছে তাদের কারও নিকট আত্মীয় হয়তো খুনগুলো করেছে। কিন্তু পরে মনে হল, সেটা সম্ভব নয়। যারা মারা গেছে তারা গরিব মানুষ। তাদের আত্মীয় বালিগঞ্জ কিংবা গোল্ডেন স্যান্ড রিসর্ট অব্দি পৌঁছবে কেমন করে? তাছাড়া তেমন প্রতিহিংসাপরায়ণ যদি কেউ থেকেও থাকে, সে অনিকেত দত্তকে রেয়াত করবে কেন আর অনির্বাণ দত্তকেই বা মারবে কেন?

'আরও গভীরভাবে চিন্তা করতে করতে উপলব্ধি করলাম, রহস্যের চাবি লুকিয়ে রয়েছে সৈকত চৌধুরি এবং তার হত্যাকারীর চরিত্রের মধ্যে। দুজনেই ব্যতিক্রমী চরিত্র, তবে দুটি ভিন্ন অর্থে। প্রথমে সৈকত চৌধুরির চরিত্রের দিকে তাকানো যাক। সৈকত ছোটবেলা থেকেই একটু আলাদা—মারকুটে, ন্যায়ের পক্ষে, জেদি, অসম্ভব দৈহিক এবং মানসিক শক্তিধর, বলা যায় মরাল ফ্যানাটিক। সে সহজেই মানুষকে বিশ্বাস করত, কিন্তু কেউ বিশ্বাসভঙ্গ করলে তাকে কখনও ক্ষমা করত না। পাপ করলে শাস্তি পেতেই হবে এই খ্রিস্টান ধারণায় সে বিশ্বাস রাখত। সে যখন জানতে পারল মণিময় এবং অসীম দত্ত দুজনে মিলে তাকে ঠকিয়েছে, তার প্রথম প্রতিক্রিয়া হল দুজনকেই শাস্তি পেতে হবে। শুধু বিশ্বাসভঙ্গের শাস্তি নয়, মানুষ খুন করার শাস্তি, নিরীহ নারী-পুরুষ-শিশুদের মৃত্যু ঘটানোর শাস্তি। এই শাস্তি মৃত্যু ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

'কিন্তু কী করে এই শাস্তি দেওয়া যায়? সে নিজের হাতে এই লোক দুটোকে খুন করতেই পারত। কিন্তু তাতে দুটো সমস্যা। খুন করে জেলে গেলে অথবা তার ফাঁসি হয়ে গেলে কে তার স্ত্রীকে দেখবে? স্ত্রীকে সৈকত সত্যিই ভালবাসত। দ্বিতীয় সমস্যা, সে নিজেও তো দোষ করেছে। ব্রিজ ভেঙে পড়ার দায় থেকে সে

তো নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। যেহেতু সে কিছু নিরীহ মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছে তাকেও শাস্তি পেতে হবে। এবং সেই শাস্তিও মৃত্যুই হতে হবে। সৈকত দুজনকে খুন করে নিজে আত্মহত্যা করতে পারত, কিন্তু সেক্ষেত্রে তার স্ত্রীর কী হবে?'

'আপনি এত কথা জানলেন কী করে স্যার? এটা কী অনুমান, নাকি কল্পনা? নাকি সৈকত চৌধুরি মরার আগে আপনাকে এসব কথা বলে গিয়েছিলেন?' পৃথির গলায় পরিষ্কার বিদ্রুপ।

'তিনটের কোনওটাই নয় ডিএসপি সাহেব। কী করে জানলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই জানতে পারবেন। শুধু একটু ধৈর্য ধরে শুনতে হবে।' আদিত্যকে ঈষৎ বিরক্ত মনে হল।

'সৈকত একটা প্ল্যান করল। সে অনেক টাকার একটা ইনশিয়োরেন্স কিনল। আত্মহত্যা ছাড়া অন্য কোনও ভাবে সে মারা গেলে তার স্ত্রী টাকাটা পাবে। তারপর সে এমন একজনকে খুঁজতে লাগল যে টাকার বিনিময়ে তাকে খুন করতে পারে। শুধু তাকে খুন করলে চলবে না, মণিময় এবং অসীম দত্তকেও খুন করতে হবে।

'পেয়েও গেল একজনকে। সেই লোকটার ভীষণ টাকার দরকার। তার স্ত্রী মারাত্মক অসুস্থ। ব্রেন টিউমার। স্ত্রীর চিকিৎসা করাতে গিয়ে লোকটা প্রায় সর্বস্বান্ত। এখন একটা শেষ চেষ্টা করতে চায়। অরুণ কুলকার্নি দেশের শ্রেষ্ঠ নিউরোসার্জেন। কিন্তু এক নম্বরের অর্থপিশাচ। লোকটা শুনল, একমাত্র অরুণ কুলকার্নিই তার স্ত্রীকে আরও কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারে। ভাগ্য ভাল থাকলে দশ-পনেরো বছরও বেঁচে যেতে পারে তার স্ত্রী। কিন্তু অপরেশনের জন্যে তিরিশ লাখ টাকা খরচ করতে হবে। তিরিশ কেন তিন লাখ টাকা খরচ করার সামর্থ্যও আর লোকটার ছিল না।

'লোকটার নাম প্রদীপ চক্রবর্তী। সৈকতের পড়শি। ষাট দশকে নকশাল করত। জেল খেটেছে। বন্দুক চালাতে পারে। সম্ভবত মানুষও মেরেছে। এখন বয়েস হয়ে গেলেও শরীর টানটান আছে। সৈকতের সঙ্গে তার চুক্তি হল সে একই দিনে প্রথমে মণিময়কে মারবে, তারপর অসীম দত্তকে। এসবের পর সে সৈকতের বাড়িতে ঢুকে সৈকতকে হত্যা করবে। সৈকত প্রদীপ চক্রবর্তীকে বুঝিয়েছিল, আপনি যদি কাজটা না করেন অন্য কেউ করবে। আমাদের শহরে টাকা ছড়ালে সুপারি কিলারের অভাব হয় না। কিন্তু আপনাকে দিয়েই আমি কাজটা করাতে চাই যাতে আপনার স্ত্রীর চিকিৎসাটা হয়। প্রদীপ চক্রবর্তী যুক্তিবাদী লোক। বামপন্থী। বিশ্বাস করেন এন্ডস ক্যান জাস্টিফাই মিন্স। তাই সৈকতের প্রস্তাবটা তিনি গ্রহণ করলেন।

'আজ সকালে প্রদীপ চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার বিস্তারিত কথা হয়েছে। আমি তাকে বললাম, আমি সৈকতের প্ল্যানটা মোটামুটি বুঝতে পেরেছি। আপনি যে চারজনকে হত্যা করেছেন সেটাও আমার অজানা নেই। প্রথমে তিনি কিছুই স্বীকার করছিলেন না। আমি তাঁকে বললাম, আর কার জন্যে মিথ্যে বলবেন? আপনার স্ত্রীই তো আর নেই। আস্তে আস্তে তিনি সব কিছু স্বীকার করলেন।

'প্রদীপদা বলেছেন, একটা ডিটেল্ড কনফেশন লিখে তিনি পুলিশের কাছে সারেন্ডার করবেন। আমি তাঁকে বিশ্বাস করেছি। না করে উপায় নেই। পুলিশ নিজে থেকে প্রদীপ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে কিচ্ছু প্রমাণ করতে পারবে না।

'প্রদীপ চক্রবর্তীর কাছে একটা পুরোনো স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন ছিল। যখন তিনি নকশাল করতেন সেই আমলে সংগ্রহ করা। অস্ত্রটা তিনি রেখে দিয়েছিলেন। মণিময়ের বাড়িটা তাঁকে সৈকত চিনিয়ে দিয়েছিল। মণিময়কে মারার পর তিনি বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে চলে এলেন। উল্টোদিকের নির্মীয়মাণ বাড়ি থেকে অসীম দত্তর ওপরে গুলি চালালেন। তাঁর হাতের টিপ এখনও অসাধারণ, কিন্তু অস্ত্রটার রেঞ্জ কতটা হবে তিনি ঠিক মতো বুঝতে পারেননি। ফলে অসীম দত্ত বেঁচে গেলেন। যাই হোক, মণিময় এবং অসীম দত্তর ওপর গুলি চালানোর পর বাড়ি ফিরে তিনি সৈকতকে হত্যা করলেন। যেমন একজন বিপ্লবী দেশের স্বার্থে নির্মোহ হয়ে মানুষ মারে তেমনি করে তিনি স্ত্রীর চিকিৎসার টাকা জোগাড় করার জন্য সৈকতের ওপর গুলি চালালেন।

'পরে যখন শুনলেন অসীম দত্ত বেঁচে গেছে, প্রদীপ চক্রবর্তী ঠিক করলেন অসীম দত্তকে তাঁর রিসর্টে গিয়ে মারবেন। এই কাজটা তাঁকে করতেই হবে, নইলে কথার খেলাপ হয়ে যাবে। জীবিত ব্যক্তির সঙ্গে যদি বা কথার খেলাপ করা যায়, মৃত ব্যক্তির সঙ্গে কখনই করা যায় না। সেই প্ল্যান মতো দুজনের জন্য রিসর্টে বুকিং করলেন। কাজও হবে আবার অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে একটু বাইরে যাওয়াও হবে।

'রিসর্টে পৌঁছে প্রদীপদা অসীম দত্তকে একটা মেসেজ করলেন সিমজুড়ি ব্রিজ ভেঙে পড়ার ব্যাপারে কিছু তথ্য তাঁর কাছে আছে। সিবিআইকে সেগুলো জানানোর আগে তিনি অসীম দত্তর সঙ্গে কথা বলতে চান। তিনি সৈকতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং প্রতিবেশি। সৈকত তাকে এই তথ্যগুলো দিয়ে গেছে। অসীম দত্ত তাঁকে রাত্তির সাড়ে ন'টা দশটা নাগাদ অফিসে আসতে বললেন। ততক্ষণে নিশ্চয় অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবে। আরও বললেন, প্রদীপ চক্রবর্তী যেন পেছনের দরজা দিয়ে আসেন। তা হলে তাঁকে কেউ দেখতে পাবে না। ইচ্ছে করেই একজন সিকিউরিটিকে ব্যাঙ্কোয়েট হলে রেখে দেওয়া হল, যাতে পেছন দিকের দরজা অরক্ষিত থাকে। প্রদীপ চক্রবর্তী সেরকমই শর্ত দিয়েছিলেন। তাছাড়া অসীম দত্তর মাথায় ঘুরছিল তাঁর নিকট আত্মীয়দের মধ্যেই কেউ তাঁকে খুন করতে চায়, তাই প্রদীপ চক্রবর্তীকে তিনি সন্দেহ করেননি।

'প্রদীপ চক্রবর্তী পেছনের দরজা দিয়ে এসে নক করলেন, অসীম দত্ত দরজা খুলে দিলেন, প্রদীপ চক্রবর্তী তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করলেন। সমুদ্রের গর্জনে গুলির শব্দ ঢাকা পড়ে গেল। প্রদীপ চক্রবর্তী এবার ঘরের ভিতরে ঢুকে অসীম দত্তর মোবাইলটা খুঁজতে লাগলেন। বেশি খুঁজতে হল না। মোবাইলটা টেবিলের ওপরেই ছিল।মেসেজগুলো পুলিশের হাতে গেলে চলবে না। পুলিশকে বিশ্বাস করাতে হবে পরিবারের কেউ খুনটা করেছে। মেসেজগুলো মুছে দেবার মতো সময় প্রদীপ চক্রবর্তীর হাতে ছিল না। তাই তিনি মোবাইলটা সঙ্গে নিয়ে সেটাকে সুইচ অফ করে রাখলেন।

'রিসর্টে দ্বিতীয় খুনটা প্রদীপ চক্রবর্তী করতে চাননি। কিন্তু যখন তিনি অসীম দত্তকে খুন করার পর অফিসের পেছনের দরজা দিয়ে বেরোচ্ছেন তখন অনির্বাণ তাঁকে দেখতে পায়। দীপশিখা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পরেও কিছুক্ষণ সে ওই কোণের ঘরটায় বসেছিল। কোণের ঘরটা থেকে অসীম দত্তর অফিসের পেছনের দরজাটার পরিষ্কার ভিউ পাওয়া যায়। সেই সময় অনির্বাণ জিনিসটা আমল দেয়নি। পরে যখন সে জানল ঠিক ওই সময়েই তার বাবা খুন হয়েছেন, তখন সে ব্যাপারটার গুরুত্বটা বুঝতে পারল। পরের দিন ডাইনিং হলে সে প্রদীপ চক্রবর্তীকে দেখতে পেল। একটা চিরকুটে নিজের ফোন নম্বরটা লিখে চুপিচুপি প্রদীপ চক্রবর্তীর হাতে দিয়ে বলল, কাল রাত্তিরে আমি আপনাকে অসীম দত্তর অফিস থেকে বেরোতে দেখেছি। ব্যাপারটা পুলিশকে জানানোর আগে আমি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

'অন্য কেউ হলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে ব্যাপারটা জানাত। কিন্তু অনির্বাণ দত্ত এমন একটা লোক যে মানুষকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পায়। অনির্বাণ ভাবল, পুলিশকে জানানোর আগে লোকটাকে একটু রগড়াতে পারলে মন্দ হয় না।

'প্রদীপ চক্রবর্তীকে রগড়াতে গিয়ে অনির্বাণ নিজেই খুন হয়ে গেল। অনির্বাণকে খুন করার পর একই কারণে তার মোবাইলটা প্রদীপ চক্রবর্তীর দরকার হয়ে পড়ল। মোবাইলের মেসেজগুলো মুছে দিতে হবে। কিন্তু অনির্বাণের সঙ্গে তার মোবাইলটা ছিল না। ফলে অনির্বাণকে খুন করার পর তার পকেট থেকে স্মার্টকার্ড নিয়ে তার ঘরের দরজা খুলে আলো জ্বালিয়ে মোবাইলটা খুঁজে নিতে হল। মোবাইল নিয়ে প্রদীপ চক্রবর্তী দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিয়ে এলেন। কিন্তু তাড়াতাড়িতে স্মার্টকার্ড সকেটে রয়ে গিয়ে আলো জ্বলতে লাগল।

'একটা সমস্যা হল। অনির্বাণের মোবাইলটা প্রচন্ড সফিস্টিকেটেড, সেটাতে ডবল পাস ওয়ার্ড ছাড়া ঢোকাই যায় না। ফলে সাইলেন্ট করে রাখা গেলেও মোবাইলটা সঙ্গে সঙ্গে সুইচ অফ করা গেল না। পরে ছুরির চাড়

দিয়ে মোবাইলটা খুলে ফেলে সেটার ব্যাটারিটা বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। এই কারণে পরের দিন সকালেও মোবাইলটাতে ফোন এসেছিল।

'পরের দিন চিলকা বেড়াতে গিয়ে প্রদীপ চক্রবর্তী লেকের মাঝখানে তাঁর ব্যাগটা ফেলে দিলেন। ভান করলেন যেন অসাবধানতাবশত পড়ে গেছে। ব্যাগের মধ্যে বই এবং চাদর ছাড়াও ছিল তিনটি মোবাইল। একটা তাঁর নিজের মোবাইল যেটা থেকে তিনি অসীম দত্ত এবং অনির্বাণ দত্তকে ফোন করেছিলেন। এটা তাঁর একটা বাড়তি মোবাইল। আজকাল ফেক আইডেন্টিটি দিয়ে সিম কার্ড কেনা শক্ত নয়। যাতে তাড়াহুড়ো না করতে হয় প্রদীপ চক্রবর্তী একটা সস্তার মোবাইল কিনে নিয়ে তাতে দুনম্বরি সিমটা ভরে রেখেছিলেন। নেহাত দরকার না হলে ফোনটা অন করতেন না। বিসর্জন দেওয়া অন্য দুটো মোবাইলের একটা অসীম দত্তর, অন্যটা অনির্বাণ দত্তর। এছাড়াও ছিল মার্ডার ওয়েপন সেই মান্ধাতার আমলের স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন। মনে রাখতে হবে, চিলকা বেড়াতে যাবার প্রস্তাবটা তিনিই দিয়েছিলেন। এবং ব্যাগে ভারী বই রাখার একটাই কারণ, ব্যাগটা যাতে কোনও ভাবে ভেসে না ওঠে। আমাদের দুর্ভাগ্য মার্ডার ওয়েপনটা আর পাওয়া যাবে না।

'তো এই হল প্রদীপ চক্রবর্তীর উপাখ্যান।' আদিত্য থামল। অভাসবশত পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করেও আবার ঢুকিয়ে রাখল।

সৈকত চৌধুরির সাইকোলজিটা কিন্তু এখনও আমি ভাল করে বুঝতে পারছি না। নিজেই পয়সা দিয়ে নিজেকে খুন করাল? এরকম হয় নাকি?' কৃষ্ণ পধির গলায় অবিশ্বাস।

'আপনি ব্যাপারটা এইভাবে ভাবুন। অনেকেই তো আত্মহত্যা করে। এবং নিজের হাতে বউ-বাচ্চাকে খুন করে তারপর আত্মহত্যা করে। কেন বউ-বাচ্চাকে খুন করে? কারণ তাদের ধারণা তারা মারা গেলে বউ বাচ্চাকে কেউ দেখার থাকবে না। সৈকত আত্মহত্যাই করেছিল। সে জানত তার মৃত্যুর পর অনিতার খুবই টাকা-পয়সার অসুবিধে হবে। কিন্তু সেই কারণে অনিতাকে খুন করার বদলে সে অনিতার জন্যে টাকার ব্যবস্থা করল। মোটা টাকার ইনশিয়োরেন্স কিনল, এবং এমনভাবে নিজেকে মারল যাতে তার মৃত্যুটাকে কেউ আত্মহত্যা না বলতে পারে।'

'আচ্ছা, সৈকত কি বুঝতে পারেনি সে খুন হয়ে গেলে পুলিশ তার বউকেই সন্দেহ করবে?' গৌতম জিজ্ঞেস করল।

'ঠিক এই প্রশ্নটাই প্রদীপ চক্রবর্তী সৈকতকে করেছিলেন। সৈকত একটা অদ্ভুত উত্তর দিয়েছিল। সে বলেছিল, সে বিশ্বাস করে অনিতা যেহেতু নির্দোষ তার কখনই কোনও ক্ষতি হবে না। এই অন্ধ বিশ্বাসের ওপর আর কোনও কথা চলে না।'

'কিন্তু সব প্রশ্নের তো মীমাংসা হল না। তোর ওপর গুলি চালালো কে? প্রদীপ চক্রবর্তী নিশ্চয় নয়।' গৌতম আবার জিজ্ঞেস করল।

'ও হ্যাঁ, ওটা তো বলতেই ভুলে গেছি। আমার ওপর গুলি চালিয়েছে একজন ভাড়াটে গুন্ডা। প্রশ্ন হচ্ছে, আমাকে মারার জন্যে কে তাকে ভাড়া করেছিল? সৌভাগ্যবশত, লোকটা গাড়িতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল, ফলে ধরা পড়েছে। লোকটা বলল, যে তাকে ভাড়া করেছিল তার দাড়ি আছে, চোখে কালো চশমা। ইন্সপেক্টার মাজি আমার নির্দেশে বিপ্লব সমাদ্দারের একটা ছবি জোগাড় করে তাতে দাড়ি-গোঁফ এঁকে, কালো চশমা পরিয়ে গুন্ডাটাকে দেখিয়েছিল। গুন্ডাটা ছবিটা সনাক্ত করেছে। অর্থাৎ বিপ্লব সমাদ্দার আমাকে মারতে চেয়েছিল।

'বিপ্লব সমাদ্দার তোকে কেন মারতে চাইবে?'

'কারণ আমি তার বাড়া ভাতে ছাই দিচ্ছিলাম। আমি প্রমাণ করে ফেলছিলাম অনিতা তার স্বামীকে খুন করেনি। এটা প্রমাণিত হলে বিপ্লব সমাদ্দারের কোম্পানিকে টাকাটা দিতে হবে। সেক্ষেত্রে যে মোটা

কমিশনটা বিপ্লব সমাদ্দার পেত সেটা সে আর পাবে না। এখানে আমার মনে হয় ইন্সপেক্টার অচিন্ত্য সাহারও কিছু হাত আছে। বিপ্লবকে সে-ই আমার তদন্তের খবরাখবর দিত। ব্যাপারটা নিয়ে আরও তদন্ত দরকার। বিপ্লব তো বোঝাই যাচ্ছে একেবারে আনস্ক্রুপুলাস, কিন্তু অচিন্ত্য সাহাও কতটা ক্লিন আমাদের জানা দরকার।'

'কিন্তু তুইই তো বললি তোকে সিবিআই-এর খবরটা অচিন্ত্যই প্রথম দিয়েছিল? এটা দিয়ে তার কী লাভ হল? এটার ফলে তো সন্দেহটা অনিতার ওপর থেকে ঘুরে গেল।'

'না, ঠিক তা নয়। সৈকত কেন ইনশিয়োরেন্স কিনল তার একটা কারণ অচিন্ত্যকে খাড়া করতে হত। প্রদীপ চক্রবর্তী তাকে বলেছিলেন সৈকতকে কারা যেন মারার চেষ্টা করেছে। কথাটা মিথ্যে। কিন্তু এটার সঙ্গে সিবিআই তদন্তের ব্যাপারটা জুড়ে দিয়ে অচিন্ত্য একটা কারণ খাড়া করেছিল। সে বলার চেষ্টা করছিল সিবিআই-এর কাছে যাতে সৈকত তার সহযোগীদের নাম ফাঁস না করে দেয় সেইজন্যে তারা সৈকতকে মারার চেষ্টা করছিল। আর মরার ভয় ছিল বলেই সৈকত ইনশিয়োরেন্সটা কিনেছিল। সিবিআই না আনলে গল্পটা দাঁড়াত না।'

'তুই নিশ্চিন্ত থাক অচিন্ত্যকে নিয়ে তদন্ত হবে। তবে আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে। তুই এবার একটা ফায়ার আর্মস-এর লাইসেন্স নিয়ে নে। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। ওটা তোর সঙ্গে রাখা দরকার।'

'নিয়ে কী করব? আমি তো ওটা কারোর ওপর চালাতে পারব না। জানিস না আমি গান্ধিবাবার চেলা?'

'তোকে চালাতে হবে না। ওটা দিয়ে শুধু ভয় দেখাবি। তাতেই কাজ হবে। ঠাকুর কী বলেছিলেন? মাঝে মাঝে ফোঁস করবি, কিন্তু কামড়াবি না।'

আবার চা এসেছে।

'এবার শেষ প্রশ্নের উত্তর। কারা অনিতার বয়ফ্রেন্ড সমীর প্যাটেলকে ঠেঙিয়ে হাসপাতালে পাঠাল? কেন ঠেঙাল?' আদিত্য চায়ের কাপে একটা চুমুক দিল।

আদিত্যর ফোনটা বাজছে। বিমল। খুব উত্তেজিত গলা।

'স্যার, আমি এতক্ষণ বসে বসে প্রদীপ চক্রবর্তীর বাড়ির একতলায় সিকিউরিটি ছেলেটার সঙ্গে গল্প করছিলাম আর আপনার কথা মতো নজর রাখছিলাম ভদ্রলোক বাড়ি থেকে বেরোন কিনা। উনি একবারও বাড়ি থেকে বেরোননি। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে একটা টায়ার ফাটার মতো শব্দ শোনা গেল। শব্দটা মনে হল প্রদীপ চক্রবর্তীর ফ্ল্যাট থেকেই এল। আমি আর সিকিউরিটি দৌড়ে ওপরে গেলাম। অনেকবার বেল বাজালাম। দরজায় ধাক্কা দিলাম। কেউ দরজা খুলছে না। সারা বাড়িটাতে বলতে গেলে কেউই এখন নেই। শুধু টু বি ফ্ল্যাট থেকে একজন ম্যাডাম বেরিয়ে এসেছেন। আমরা কী করব? দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে দেখব?'

'তোমরা কিচ্ছু করবে না। দরজার সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমি কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশ নিয়ে যাচ্ছি। পুলিশ গিয়ে যা করার করবে।' আদিত্য ফোনটা কেটে দিয়ে পকেটে রাখল।

ঘরের দুজনে উৎসুক দৃষ্টিতে আদিত্যর দিকে তাকিয়ে আছে।

'প্রদীপ চক্রবর্তী আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিল। স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনটা প্রদীপদা চিলকায় ফেলে আসেনি। সঙ্গে রেখে দিয়েছিল।' আদিত্য বিষণ্ণ গলায় বলল।

তারপর একটু সময় নিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'মনে হচ্ছে, প্রদীপ চক্রবর্তী সুইসাইড করেছে।'

আবার সে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ম্লান হেসে বলল, 'এর একটাই ভাল দিক। মার্ডার ওয়েপনটা এবার পুলিশ পেয়ে যাবে।'

আজকাল রাজারহাট নিউটাউনে কয়েকটা নতুন ক্লাব হয়েছে। কৌলিন্যে তারা নিশ্চয় কলকাতার বনেদি ক্লাবগুলোর থেকে পিছিয়ে, কিন্তু সুযোগ-সুবিধের দিক থেকে তারা যে খানিকটা এগিয়ে সেটা আজকাল কেউ কেউ স্বীকার করে নিচ্ছে।আদিত্যর বন্ধু সুনন্দ সরকার এই রকম একটা ক্লাবের মূল পৃষ্ঠপোষক এবং বলাই বাহুল্য, পরিচালন সমিতির একজন মাতব্বর। আদিত্য আর কেয়াকে খাওয়াবে বলে সে এখানে আজ সন্ধেবেলা একটা বিলাসবহুল প্রাইভেট ডাইনিং রুম ঠিক করেছে। আদিত্যদের সঙ্গে সঙ্গে গৌতম আর মালিনীরও নেমন্তন্ন।

সুনন্দ আদিত্যর ইস্কুলের বন্ধু। গৌতম কলেজের। কোনও এক সময় আদিত্যই ওদের আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। তারপর ওদের মধ্যে পরিচিতি আরও গভীর হয়েছে। এর পনেরো আনা কৃতিত্বই অবশ্য সুনন্দ সরকারের। সে-ই উদ্যোগ নিয়ে ধীরে ধীরে গৌতমের সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরি করে ফেলেছে। ক্রিমিন্যাল লইয়ারদের পুলিশের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে হয়।

গৌতম বলেই দিয়েছিল আসতে দেরি হবে, মালিনীর কী যেন একটা কাজ আছে। আদিত্যরা অবশ্য সোয়া সাতটার মধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে। একদিক থেকে ভালই হল। সৈকত চৌধুরি, প্রদীপ চক্রবর্তীর উপাখ্যানটা সুনন্দ আর তার বউ সাগরিকা শুনতে চেয়েছিল। গৌতম উপস্থিত থাকলে তাকে দু'বার একই গল্প শুনতে হত। কেয়া অবশ্য খুব ভাল করে গল্পটা আগে শোনেনি বা শুনতে চায়নি। প্রদীপ চক্রবর্তীর ব্যাপারটাতে সে দুতিনদিন ভীষণ ডিপ্রেশড হয়ে ছিল। সে প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারছিল না প্রদীপ চক্রবর্তী খুন করতে পারে। তার আত্মহত্যাটাও মেনে নিতে পারছিল না। এখন কেয়া খানিকটা সামলে নিয়েছে।

গৌতমরা এল আটটা পঁচিশে। এর মধ্যে সুনন্দর তিনটে স্কচ হয়ে গেছে। আদিত্য অবশ্য একটাই জিন অ্যান্ড টনিক নিয়ে বসেছিল। গৌতমও স্কচ খাবে বলল। মালিনী সাগরিকার মতো রেড ওয়াইন খাচ্ছে। কেয়া ভার্জিন মেরি।

'তোরা ঠিক সময় এসেছিস। প্রদীপ চক্রবর্তীর গল্পটা এইমাত্র শেষ হল। তোকে আর দুবার শুনতে হল না।'

'কোথায় শেষ হল? সেদিন তো জানাই হল না তুই কী করে প্রদীপ চক্রবর্তীকে সন্দেহ করলি?'

'হ্যাঁ, এটা সেদিন বলা হয়নি। প্রথম প্রথম প্রদীপ চক্রবর্তীকে সন্দেহ করার কোনও কারণই ছিল না। কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে ওঁর কথা মাথায় এল। প্রথমত ভেবে দেখলাম, প্রদীপদাই একমাত্র লোক যিনি দুটো খুনের জায়গাতেই উপস্থিত ছিলেন। আর উপস্থিত ছিলেন রাখি চক্রবর্তী। কিন্তু অসুস্থতার কারণে তাঁকে বাদ দেওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, যে মান্ধাতার আমলের অস্ত্রটা ব্যবহার করা হচ্ছিল, আমার মন বলছিল, এটা বয়স্ক কেউ ব্যবহার করছে। মানে, অস্ত্রের বয়েসের সঙ্গে খুনির বয়েসের কোথাও একটা যোগ আছে। এটা অবশ্য নিছক একটা ধারণা, কোনও প্রমাণ নয়। কিন্তু এইভাবে ভাবলে প্রদীপ চক্রবর্তীর কথা সবার আগে মনে পড়ে। বিশেষত যেহেতু, পুলিশ রেকর্ড বলছে, তিনি এক সময় আগ্নেয়াস্ত্র চালিয়েছেন।

'প্রদীপ চক্রবর্তী আমাকে বলেছিলেন সৈকত তাঁকে রিসর্টে থাকার জন্যে ডিসকাউন্টের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এটা ছাড়া তিনি রিসর্টে থাকার অন্য কোনও কারণ দেখাতে পারছিলেন না। আমি খবর নিয়ে দেখলাম, প্রদীপ চক্রবর্তী গোল্ডেন রিসর্টে ঘর বুক করেছেন সৈকত খুন হবার পরে। এবং তিনি কোনও ডিস্কাউন্টই পাননি। এতে আমার সন্দেহ অনেকটা বেড়ে গেল। কিন্তু সন্দেহ হলেও খুনের কোনও মোটিভ আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তারপর একদিন জানতে পারলাম অনেক টাকা দিয়ে প্রদীপ চক্রবর্তী তাঁর স্ত্রীর অপরেশন করাচ্ছেন। এত টাকা তিনি পেলেন কোথায়? মনে প্রশ্ন জাগল, তিনি কি তা হলে টাকা নিয়ে খুনগুলো করছেন? কেয়া যখন বলল, প্রদীপদার ব্যাগটা চিলকায় পড়ে গেছে, আমি নিশ্চিত হলাম ওই ব্যাগেই মোবাইলগুলো ছিল। আগ্নেয়াস্ত্রটাও যে ছিল সেটা মিথ্যে করে প্রদীপদাই আমাকে বলেছিলেন। আমি সেটা অর্ধেক বিশ্বাস করেছিলাম, অর্ধেক করিনি।

'সে যাই হোক, কিছুদিন পরে জানতে পারলাম সৈকত অল্প দিনের ব্যবধানে তিরিশ লক্ষ টাকা নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ক্যাশে তুলে নিয়েছে। এদিকে হাসপাতালে খবর নিয়ে জানা গেল প্রদীপ চক্রবর্তী তাঁর স্ত্রীর অপরেশনের জন্যে ক্যাশ তিরিশ লাখ টাকা জমা দিয়েছেন। সন্দেহ হল, এটা কি তা হলে সৈকতেরই টাকা?

'কিন্তু সৈকতের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তিনি সৈকতকেই খুন করবেন কেন? এই ধাঁধার উত্তর খুঁজতে গিয়ে তিনটে জিনিস মাথায় এল। এক, সৈকত একটা ইনশিয়োরেন্স করেছিল যার শর্ত হল, সৈকতের মৃত্যু আত্মহত্যা বাদে অন্য কোনও ভাবে হলে তার স্ত্রী বীমার পুরো টাকাটা পেয়ে যাবে। দুই, কিছুদিন আগে সৈকতদের বানানো একটা ব্রিজ ভেঙে পড়ে এগার জনের মৃত্যু হয়েছে। তিন, সৈকত কোনও অন্যায়কে কখনও ক্ষমা করত না। নিজে অন্যায় করলে কি সে নিজেকে ক্ষমা করবে? এই তিনটে উপাদান থেকে আমি একটা গল্প খাড়া করে প্রদীপ চক্রবর্তীকে বললাম। দেখা গেল বাস্তবটা আমার গল্পের খুব কাছাকাছি।

'আর একটা প্রশ্নের উত্তর সেদিন দিতে শুরু করেছিলাম কিন্তু দেওয়া হয়নি। অনিতার বন্ধু সমীরকে কারা মারধোর করল? কেন করল? এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আর একটু পেছনে তাকাতে হবে। সৈকতের সঙ্গে অনিতার বিয়েটা অনিতার বাড়ি থেকে মেনে নেয়নি যেহেতু অনিতার বাপের বাড়ির মতো সৈকতরা ব্রাহ্মণ ছিল না। বিশেষ করে অনিতার দাদা সঞ্জয় শর্মা এই বিয়েটাকে তাদের পরিবারের অপমান হিসেবে নিয়েছিল। সে মাঝে মাঝেই অনিতাকে এবং কখনও কখনও সৈকতকে ফোন করে ভয় দেখাত। তারপর একদিন সে একটা গুণ্ডাকে সঙ্গে নিয়ে ফাঁকা রাস্তায় সৈকতকে আক্রমণ করল। সে হয়তো ভেবেছিল সৈকতকে মেরে আধমরা করে হাসপাতালে পাঠাতে পারলে তার গায়ের জ্বালা কিছুটা মিটবে। সৈকতের শারীরিক শক্তি সম্বন্ধে তার কোনও ধারণাই ছিল না। সৈকত একাই দুজনকে মেরে পাট করে দিল, সৈকতের হাতে মার খেয়ে তারা দুজনেই আধমরা হয়ে কোনও রকমে চম্পট দিল।

'মার খেয়ে, বলাই বাহুল্য, সৈকতের ওপর সঞ্জয় শর্মার রাগ আরও বেড়ে গেল। সে এবার একটা অন্য রাস্তা ধরল। সমীর প্যাটেল বলে অনিতার এক পুরোনো সহপাঠিকে সে খুঁজে বার করল। সমীর প্রায় কিছুই করে না। মাঝে মাঝে বাবার দোকানে বসে একটা সামান্য মাসোহারা পায়। তাতে তার চলে না। সমীরকে সঞ্জয় বলল সমীর যদি অনিতাকে প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে অনিতার বিয়েটা ভাঙতে পারে তা হলে সে অনেক টাকা পাবে। আন্দাজ করা যায়, বেশ কিছু টাকা সমীরকে সঞ্জয় অ্যাডভান্স দিয়েছিল।

'এটা এমন একটা সময় যখন সৈকত তার ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে এতটাই মনমরা হয়ে থাকছে যে অনিতার সঙ্গে তার সম্পর্কটা ক্রমশ দূরের হয়ে যাচ্ছে। এই সংকটের মুহূর্তে অনিতার একজন বন্ধুর খুব দরকার হয়ে পড়েছিল। এবং সেই ভূমিকায় সমীর ভালই মানিয়ে গিয়েছিল। সমস্যা হলো, বন্ধুর ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে সমীর প্যাটেল আকণ্ঠ অনিতার প্রেমে পড়ে গেল।

সৈকতের অনুপস্থিতিতে সমীর যে ঘনঘন অনিতার কাছে আসে এটা পড়শিদের নজর এড়াল না। কথাটা ধীরে ধীরে সৈকতের কানেও উঠল। ততদিনে সৈকত ঠিক করে ফেলেছে মণিময় আর অসীম দত্তকে মেরে সে নিজেকেও শেষ করে দেবে। তার অবর্তমানে লাইফ ইনশিয়োরেন্সের টাকায় অনিতার ভালই চলে যাবে। কিন্তু টাকাটাই তো সব নয়। সৈকত ভাবল, সে চলে গেলে অনিতাকে দেখাশোনার করার জন্য একজন বন্ধু দরকার। তাই সমীরের সঙ্গে অনিতার মেলামেশায় আপত্তি করার বদলে সে খানিকটা উৎসাহই দিচ্ছিল।

সৈকত খুন হবার পর অনিতার বাড়িতে সমীরের যাতায়াত আরও বেড়ে গেল। এবং সমীর আরও আরও অনিতার প্রেমে ডুবে যেতে লাগল। এদিকে সঞ্জয় চাপ দিচ্ছে সমীরকে এমন একটা কিছু করে বেরিয়ে আসতে হবে যাতে অনিতার নামটা সারা জীবনের মতো কালিমালিপ্ত হয়ে যায়। সে যাতে আর ভদ্র সমাজে মুখ দেখাতে না পারে। সমীর একদিন সঞ্জয় শর্মাকে বলল, এই কাজটা তার দ্বারা হবে না। সঞ্জয় শর্মা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলল, তাহলে আমার টাকা ফেরত দে। সমীর বলল, টাকা খরচ হয়ে গেছে। এর পরে যা

ঘটার তাই ঘটল। দুটো গুণ্ডাকে দিয়ে সঞ্জয় সমীরকে অসম্ভব পেটাল। তবে সে নিজে মারামারির মধ্যে ছিল না। সৈকতকে মারতে গিয়ে তার যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গিয়েছিল। এই হলো সমীর প্যাটেলের কাহিনি। দেরিতে হলেও, সমীর সঞ্জয় শর্মার নামে এফ আই আর করেছে। সে এফ আই আর-এর ভিত্তিতে ইন্সপেক্টর মাজি সঞ্জয়কে তুলে এনে একটু থার্ড ডিগ্রি দিতেই সে সব স্বীকার করে নিয়েছে। যারা মনে করে গায়ের জোর ফলিয়ে সব সমস্যার সমাধান করা যায়, থার্ড ডিগ্রিই তাদের ঠিক ওষুধ।'

আদিত্য থামল। তার গেলাসে একটা চুমুক লাগাল। সুনন্দ বলল, 'শুনলাম দীপশিখাকে উড়িষ্যা পুলিশ ছেড়ে দিচ্ছে। অনিকেত দত্ত এবং শ্বেতা মল্লিক নাকি তাদের স্টেটমেন্ট উইথড্র করেছে। জজকে বলেছে পুলিশ তাদের চাপ দিয়ে ভুল সাক্ষী দেওয়াচ্ছিল।'

'এটার পেছনে আমার খানিকটা হাত আছে। আমি অনিকেতকে ফোন করে বললাম আমার কাছে বেশ কিছু ডকুমেন্ট আছে যা দিয়ে তোমাকে জেলে পাঠানো যায়। তুমি এবং তোমার বোন যদি তোমাদের মিথ্যে সাক্ষী উইথড্র না কর তা হলে ডকুমেন্টগুলো পুলিশের হাতে আমি তুলে দেব।'

'এ তো ব্ল্যাকমেল! তুই লোকটাকে ব্ল্যাকমেল করলি?' গৌতম ব্যাপারটা ঠিক মেনে নিতে পারছে না।

'শুধু ব্ল্যাকমেল? ব্লাফও তো বটে। আমার কাছে মোটেই ওইরকম কোনও ডকুমেন্ট নেই। অনিকেত দত্তটা একই সঙ্গে বোকা এবং ভিতু। আমার কথায় ভয় পেয়ে গেল।'

'তা নয় হল। কিন্তু তাও বলব ব্ল্যাকমেল করাটা ঠিক নয়। তুইই তো বলিস এন্ড দিয়ে মিনস জাস্টিফাই করা যায় না। তুই না গান্ধিবাবার চেলা?'

'অবশ্যই আমি গান্ধিবাবার চেলা। ব্ল্যাকমেল জিনিসটা তো তাঁর কাছেই শেখা। নন-ভায়োলেন্স ব্যাপারটা ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল নয়? তুইই বল?' আদিত্য চওড়া করে হাসল।

'একটা লিগাল ব্যাপার কিন্তু এখনও সেটলড হয়নি। সৈকতের মৃত্যুটা খুন না আত্মহত্যা? এটা নিয়ে ইনশিয়োরেন্স কোম্পানি কিন্তু ফাইট করবে।' সুনন্দ বলল।

'সে করলে করবে। আমি আমার কাজ করে দিয়েছি। অসীম দত্তর খুনিকে ধরে দিয়েছি। তাই অসীম দত্তর কাছ থেকে ফিজ নিতে আমার কোনও বিবেকের দংশন নেই।' আদিত্য উঠে দাঁড়াল। সে বাইরে গিয়ে একটা সিগারেট খেয়ে আসবে ভাবছিল।

ক্লাবের ম্যানেজার দরজায় নক করে ভিতরে এসেছে। জিজ্ঞেস করছে, ডিনার কী এখন সার্ভ করা হবে? আদিত্য আবার বসে পড়েছে।

কেয়া আর আদিত্য বাড়ি ফিরে আসছিল। রাত্তির এগারোটা বেজে গেছে। রাজারহাটের মেন রাস্তাটায় গাড়ি প্রায় নেই। পেছনের সিটে কেয়া আদিত্যর হাত দুটো শক্ত করে ধরে, আদিত্যর শরীরে শরীর লাগিয়ে, তার কাঁধে মাথা রেখে, চোখ বুজে রয়েছে। গাড়ি ইকো পার্ক ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আদিত্য একবার ভাবল যেখানে তার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল সেই জায়গাটা কেয়াকে দেখাবে। তারপর ভাবল কী দরকার মনে করিয়ে দিয়ে। আদিত্যর অ্যাক্সিডেন্ট থেকে শুরু করে এত দ্রুত ঘটনাগুলো ঘটে গেল! কেয়া আর নিতে পারছে না। ওর কিছুদিন মনের বিশ্রাম প্রয়োজন।

আদিত্য ভেবেছিল কেয়া ঘুমিয়ে পড়েছে।

'সৈকত কিন্তু অনিতাকে ভালবাসত না। মোটেই ভালবাসত না। ভালবাসলে সে প্রথমেই অনিতাকে সব কথা বলে দিত।' কেয়া চোখ বন্ধ রেখে হঠাৎ বলে উঠল।

আদিত্য চুপ করে আছে।

'আমার কষ্ট হলে আমি কাকে বলব? তোমাকেই তো?' কেয়ার চোখ বন্ধই রয়েছে।

আদিত্য এখনও চুপ করে আছে।

'আমাকে তুমি কখনও কোনও কথা লুকিও না গো। তোমার কিছু হয়ে গেলে আমি কী করব? কোথায় যাব?' কেয়া আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বলল।

আদিত্য টের পেল কেয়া কাঁদছে।

সমাপ্ত